KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 200	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher নীহার রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৬৪/২ ৬৪/৪	Year of Publication শ্রাবণ-পৌষ ১৪১১ // Jan 2005 শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২ // Sep 2005
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor আবদুর রাউফ	Remarks :

I. D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৪ সংখ্যা ১ কার্তিক-পৌষ ১৪১১

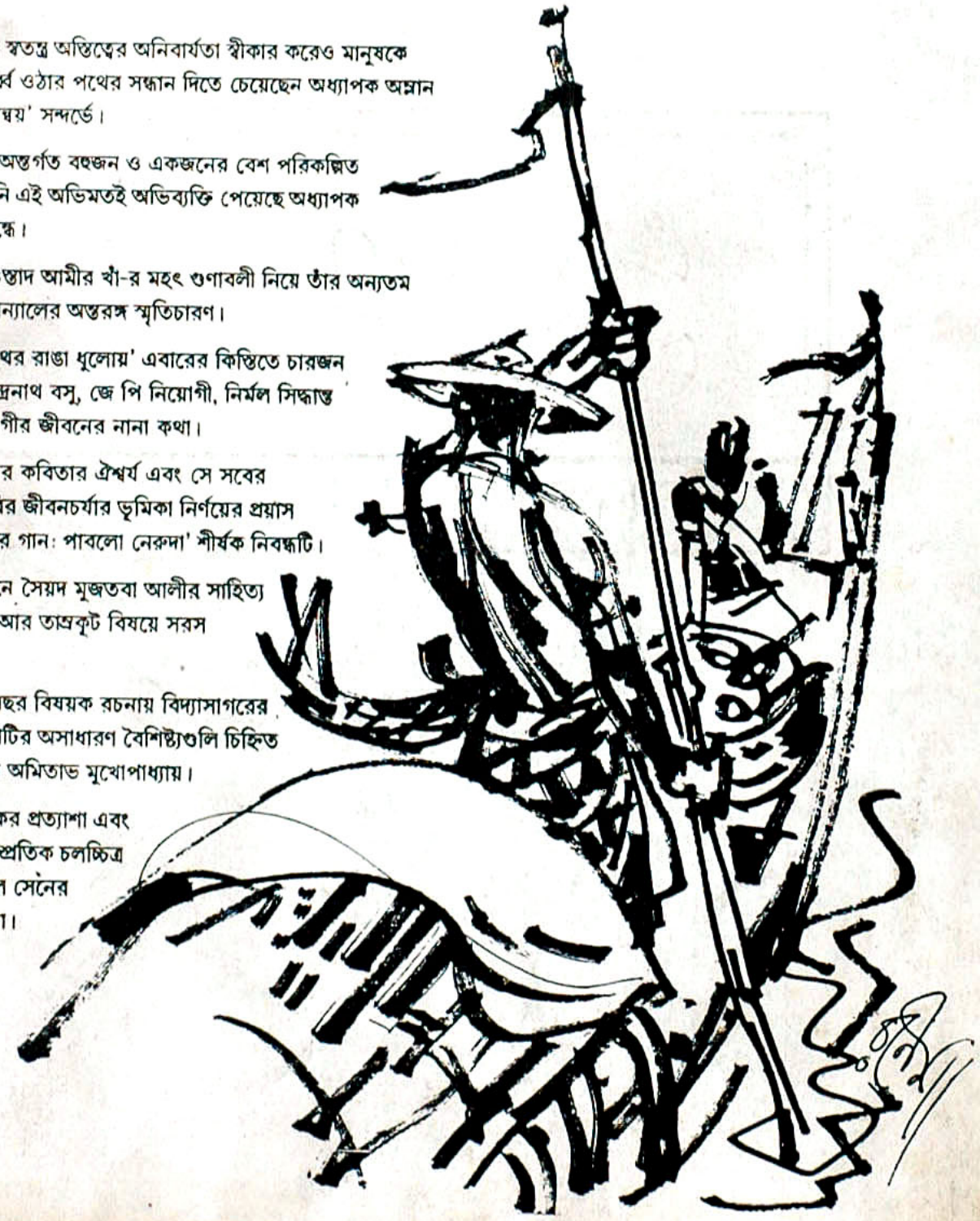

ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অনিবার্যতা স্বীকার করেও মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ওঠার পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত তাঁর 'দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়' সন্দর্ভে।

লোকসংস্কৃতি গোষ্ঠী-অন্তর্গত বহুজন ও একজনের বেশ পরিকল্পিত সংলাপ— অনেকখানি এই অভিমতই অভিব্যক্তি পেয়েছে অধ্যাপক সৌমেন সেনের নিবন্ধে।

ব্যক্তিমানুষ হিসাবে ওস্তাদ আমীর খাঁ-র মহৎ গুণাবলী নিয়ে তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য মানিক সান্যালের অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ।

ধারাবাহিক 'ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয়' এবারের কিস্তিতে চারজন বরেণ্য বাঙালি সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জে পি নিয়োগী, নির্মল সিদ্ধান্ত এবং সতীশচন্দ্র নিয়োগীর জীবনের নানা কথা।

শতবর্ষ স্মরণে নেরুদার কবিতার ঐশ্বর্য এবং সে সবের জনপ্রিয়তার মূলে কবির জীবনচর্যার ভূমিকা নির্ণয়ের প্রয়াস 'অন্ধকার আর আলোর গান: পাবলো নেরুদা' শীর্ষক নিবন্ধটি।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর চয়নে সৈয়দ মুজতবা আলীর সাহিত্য থেকে আহার, আসব আর তান্ত্রকূট বিষয়ে সরস আলোচনা।

বর্ণপরিচয়ের দেড়শ বছর বিষয়ক রচনায় বিদ্যাসাগরের এই যুগান্তকারী পুস্তিকাটির অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন অমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্রের কাছে দর্শকের প্রত্যাশা এবং বিদেশের কয়েকটি সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা। মৃণাল সেনের আত্মজীবনী পর্যালোচনা।

A Resurgent Industrial Scenario :

- Investment showing a robust growth with more than Rs. 14,000 Crore in projects completed between 2000 and 2003
- Strong growth in manufacturing sector, especially in iron & steel, petrochemicals and edible oil.
- Country's largest investment in petrochemical sector in 2003 - South Asian Petrochemicals starts commercial production.
- A strong agrarian base - agriculture has consistently grown at more than 4%, creating a platform for value-added agri-business.
- Growth in IT sector was amongst the highest in the country in 2002.
- An investor-friendly and politically stable government.

WEST BENGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
Making things happen

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৬৪ সংখ্যা ১
কার্তিক-পৌষ ১৪১১

প্রবন্ধ

■ দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় — অম্লান দত্ত ৯
■ আমার খাঁ (আমীর খাঁ) সাহেব ও আমরা — কৃশানু মিত্র ১৩

কবিতা ২২-২৯

■ শঙ্খ ঘোষ ■ পিনাকী ঠাকুর ■ রাহুল পুরকায়স্থ ■ জয়া মিত্র
■ মৃণাল বণিক ■ গোবিন্দ গোস্বামী ■ শিবাশিস মুখোপাধ্যায় ■ শ্রীজাত

প্রবন্ধ

■ একজন-বহুজন : লোকসংস্কৃতির সংলাপ — সৌমেন সেন ৩০
■ চলচ্চিত্রের কাছে দর্শক যা চায় — সুনীত সেনগুপ্ত ৩৯

ধারাবাহিক

■ ভাঙা পথের রাঙা ধুলায় — সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত ৪৪
■ ভ্রমণ বিভ্রম — চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল ৫৬

জন্মশতবর্ষ শ্রদ্ধার্ঘ্য

■ অন্ধকার আর আলোর গান—পাবলো নেরুদা — অভীক মজুমদার ৬৪
■ সৈয়দ মুজতবা আলী : আহার, আসব ও তাম্রকূট — অর্ধেন্দু চক্রবর্তী ৬৮

ছোটগল্প

■ কাঁটা — নন্দ চৌধুরী ৭৩

সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি

■ বর্ণপরিচয়ের দেড়শো বছর — অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ৮০
■ আতাউর রহমান সম্বন্ধে স্বল্পজ্ঞাত কিছু তথ্য ও তাঁকে লেখা সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত পত্র ৮৪

গ্রন্থসমালোচনা ৮৬

■ অধৃষ্য কুমার ■ শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ■ বুলবুল আহমেদ
■ তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় ■ প্রণব সেন

চলচ্চিত্র সমালোচনা

■ দশম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব : কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি — মেঘ মুখোপাধ্যায় ৯৯

সম্পাদক : আবদুর রাউফ
শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত
সম্পাদনা সহকারী : মেঘ মুখোপাধ্যায়

উপদেষ্টামণ্ডলী
শঙ্খ ঘোষ
দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
রণেন আয়ন দত্ত
তুষার তালুকদার

মূল্য : ১৫
ডাকে : ২০

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯
থেকে মুদ্রিত এবং ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত
অক্ষর বিন্যাসে ক্যাটস আই ● ৪৪ ধীরেন ধর সরণি, কলকাতা১২

দূরভাষ ২২১৫-০৯৭০

With best compliments from :

COOKME SPICE POWDER

KRISHNA CHANDRA DUTTA (SPICE) PVT. LTD.

235, Maharshi Debendra Road

Kolkata - 700 007

TEL - 2259-8432

দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়

অম্লান দত্ত

কয়েকটি কথা 'ধর্মসমন্বয়' বিষয়ে কিছুদিন আগে লিখেছিলাম। প্রবন্ধটির মূলে ছিল একটা প্রশ্ন: বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের ভিতর কোথাও মিল আছে কি না, কতটা মিল, কোথায় মিল? আচারে বিচারে ওই সব ধর্মের ভিতর অনেক অমিল আছে, এ কথাটা স্পষ্ট করে বলে নেবার পরই মিলের অনুসন্ধান করা হয়েছিল। লেখাটি সকলের ভাল লাগেনি। এটা অস্বাভাবিক নয়। যাঁরা গভীরভাবে ধর্মে বিশ্বাসী তাঁরা অমিলের কথা শুনতে ভালবাসেন না। যাঁরা অবিশ্বাসী তাঁরা প্রধান প্রধান ধর্মের ভিতর সদর্থে কোনও মিলের খোঁজটাকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তা ছাড়া অনেকেই কাহিনি শুনতে ভালবাসেন। তাত্ত্বিক আলোচনায় ক্লান্ত বোধ করেন, যদিও কারও মনই তত্ত্বকথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

প্রবন্ধের মূলে যে জিজ্ঞাসা আছে তাতে যাঁদের আগ্রহ নেই, তাঁদের কাছে প্রবন্ধপাঠের পরিশ্রমই মনে হবে পণ্ডশ্রম, এটাই স্বাভাবিক। কাজেই প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন ওঠে: ওই মিলের অনুসন্ধানটা কি আদৌ জরুরি? আমার কাছে ওটা জরুরি ও গভীর আগ্রহের বিষয়, কিছুটা বিশুদ্ধ বুদ্ধিগত কারণে, কিছুটা একুশ শতকের গোড়ায় বাস্তব প্রয়োজনের দৃষ্টিতে। বুদ্ধিগত আগ্রহের বিশদ ব্যাখ্যা এখানে দেব না। সংক্ষেপে এটুকু বলব যে ওই মিলের জায়গায় দাঁড়িয়ে বুঝবার খানিকটা চেষ্টা করা যায় যে গৌতম বুদ্ধ বা যিশুখ্রিস্টের মতো মানুষেরা কোন প্রেরণায়, কিসের সন্ধানে যাত্রা শুরু করেছিলেন, কী কথা বলে যেতে চেয়েছিলেন, তারপর মানুষ তাঁদের নিয়ে কী করেছে সেটা ভিন্ন কথা। মানুষের অবচেতনায় অবস্থিত অন্ধকারময় এক আদিম ভয়কে যাঁরা ধর্মের মূল বস্তু বলে ভাবতে অভ্যস্ত তাঁরা কি বুদ্ধের ধর্মবোধকে যথার্থভাবে বোঝেন? মনে হয় না। এই আলোচনাটা স্থগিত রেখে ধর্মসমন্বয় চিন্তার বাস্তব প্রয়োজনের ব্যাপারটা এরপর অল্প কথায় বলা যাক।

হজরত মোহম্মদের মৃত্যুর পর অল্পকালের ভিতর ইসলাম এত দ্রুত পূর্ব পশ্চিমে বিস্ময়করভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে পয়গম্বরের অনুগামীদের মনে ধর্মের নামে বিশ্ববিজয়ের কল্পনা উদিত হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। এতখানি নাটকীয়ভাবে না হলেও অনুরূপ চিন্তা বিভিন্ন সময়ে ইতিহাসের দিগন্তে উদ্ভাসিত হয়েছে অন্য কোনও কোনও ধর্মকে আশ্রয় করে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের ভাষণ থেকে মনে হয় যে এইরকম বিশ্বাস থেকে খ্রিস্টধর্ম আজও সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। আবার কোনও কোনও নিরীশ্বরবাদী বিশ্বাস করেন যে আগামী কালে বিশ্বজয় করবে

নিরীশ্বরবাদ। এই সবই কিন্তু অবাস্তব চিন্তা। নিরীশ্বরবাদসহ পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান ধর্ম অনির্দিষ্ট কাল অবধি পাশাপাশি বাস করবে, বিশ্বসংসারের এই চিত্রটিই বাস্তবদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য। কয়েকটি প্রধান ধর্মের সহাবস্থান অনিবার্য। বিদ্বেষযুক্ত সহাবস্থানের সঙ্গে আমরা পরিচিত, আজও সেটা ভয়াবহ রূপেই উপস্থিত। ভারতীয় উপমহাদেশসহ সারা বিশ্বময় এর প্রকোপ। রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার মিশ্রণে তৈরি হয়েছে এক ভয়াবহ শক্তি যাকে শুধু সামরিক উপায়ে রোখা যাবে না। কিছু ভেদাভেদ, কিছু ঘর্ষণ, একটা মাত্রার ভিতর সহনীয়। মাত্রার বাইরে এটা অসহনীয়, সমাজ সভ্যতার পক্ষে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ। এর বাইরে কি অন্য পথ নেই? আমাদের কিছু করবার নেই? যে সহাবস্থান অনিবার্য তাকে বিদ্বেষমুক্ত ও সভ্যতার অনুকূল করে তুলবার প্রয়োজন কি স্বীকার্য নয়? আলোচনার এটাই পটভূমিকা, বাস্তব দৃষ্টিতে প্রশ্নটাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। তবে আপত্তি কেন? কোনও এক বন্ধুর আপত্তি এই রকম । এই বন্ধুটি বলছেন, "হতাশ হয়েছি। শ্রীদত্ত যেন ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের কাছে কার্যত নতিস্বীকার করেছেন। তিনি ধর্মীয় সমন্বয়ের পথ সহজ নয় বলেও সমন্বয়ের চিন্তা জাগ্রত রাখার মধ্য দিয়েই মুক্তির পথ খুঁজেছেন।" এইখানে চিন্তার বিভ্রম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কঠোরভাবে ঘোষণা করতেই ব্যস্ত; যাঁরা সমন্বয় খোঁজেন তাঁরা উগ্রপন্থী নন। সমন্বয়ের পথ সহজ নয়, তবু সেটাই পথ । সমন্বয়ের সন্ধান আর "নতিস্বীকার" এক কথা নয়। ধর্মীয় আচার বিচারে আছে নানা রকমের কুসংস্কার, যার বিরুদ্ধে স্পষ্ট সমালোচনা এমনকী বিদ্রোহ প্রয়োজন। তবু মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র কুসংস্কারের জোরেই কোনও প্রধান ধর্ম টিকে থাকে না, শ্রদ্ধার যোগ্য কিছু বস্তুও তাতে থাকে। সেই বস্তুটিকে খুঁজে নিতে হয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধা রক্ষার ভিত্তি হিসাবে, সমন্বয়ের স্বার্থে। যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তার কাছেই আবার খুঁজে পাওয়া যায় মান্য করবার মতো কিছু সত্য। সেই সত্যকে স্বীকার করে নেবার মতো ঔদার্য থাকা চাই। এটাই অগ্রগতির শ্রেয় পথ। এই কথাটা শুধু ধর্ম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়। তার বাইরেও এর প্রয়োগ আছে। বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়, অগ্রগতির পথে অযথা ক্ষতি ঘটে, এই কথাটা অগ্রাহ্য করলে।

একটা ঐতিহাসিক উদাহরণ তুলে ধরা যাক। সাম্যবাদীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন বুর্জোয়া সভ্যতা ও অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বাজার ব্যবস্থার বহু ত্রুটি অবশ্যস্বীকার্য। তবু তার ভিতরও ছিল সমাজবিবর্তনে গ্রহণযোগ্য কিছু সঞ্চয়। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা নিয়ে সাম্যবাদীরা গড়ে তুলেছিলেন যে শাসনব্যবস্থা সেটা হয়ে উঠল এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। এ কথাও মানতে হল, বাজারের কাছ থেকে কিছু শিখবার আছে। বুর্জোয়া সভ্যতার অবদান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সুস্থ সাম্যবাদ গড়ে তোলা যায় না। সমন্বয়ের পথ সহজ নয়, তবু সেটাই পথ।

ধর্ম ও সমাজ নিয়ে আলোচনায় এরপর আবারও ফিরে আসা যাক। ধর্মের এক স্তরে আছে মূল্যবোধকে আশ্রয় করে কিছু শাশ্বত বাণী আর তারই সঙ্গে যুক্ত গভীর ও চিরকালের প্রশ্ন। এই রকমই এক বাণী হৃদয়ের শুদ্ধতা নিয়ে: ক্ষমা চিত্তকে নির্মল করে। ক্ষমাহীন সংসারে বিদ্বেষের বিষ জমেই চলে, নিষ্ক্রমণহীন এক দূষিত পরিবেশের মতো। ক্ষমার কথা বলা হয়েছে সব ধর্মেই। এরই সঙ্গে আবার যুক্ত হয়ে আছে এক চিরকালের প্রশ্ন। সমাজে তো দণ্ডনীতিরও স্থান আছে; ক্ষমার সঙ্গে ন্যায়বিচারকে মেলানো যাবে কীভাবে? অন্য স্তরে ধর্মশাস্ত্রেই আছে বহু প্রাচীন বর্জনযোগ্য বিধান ও বিবিধ কুসংস্কার। কিছু অন্যায় বিধান স্পষ্টতই সুবিধাভোগী উচ্চবর্গের স্বার্থের সহায়ক। তারই পাশে আছে অন্ধ এমনকী নির্দয় কুসংস্কার যার উৎপত্তি অজ্ঞতায়। কুসংস্কার থেকে উৎপন্ন হয় তীব্র ভেদাভেদ, কখনও বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে, কখনও আবার একই সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে। এই সবের বিরুদ্ধে আবশ্যক তীক্ষ্ণ ও পরিচ্ছন্ন সমালোচনা এবং সেই সমালোচনার সমর্থনে সংগঠিত আন্দোলন। ধর্মের উচ্চস্তরের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষা করার জন্যই প্রয়োজন হয় নিম্নস্তরের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ।

এ বিষয়ে এরপর আরও কয়েকটি মন্তব্য প্রাসঙ্গিক হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যদিও স্বাভাবিকভাবেই আবেগের একটা স্থান থাকে তবু মূল সমালোচনার ধারা যুক্তিনির্ভর হওয়া দরকার। মানুষ হৃদয় দিয়ে যা বোঝে পদে পদে তার পরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। আবেগে আছে তাৎক্ষণিক আঘাত, যুক্তিতে আসে স্থায়িত্ব। অন্যায় বিধান ও অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিসিদ্ধ সমালোচনা প্রথমে স্মরণীয়ভাবে উচ্চারিত হবে সমাজের তলার দিকের মানুষদের ভেতর থেকেই এমন কিন্তু নয়। বরং উচ্চবর্গের ভিতর থেকেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু মুক্ত চিন্তক ও দূরদর্শী সমালোচক প্রথমে দেখা দিয়েছেন সমাজ ও ইতিহাসের বৃহত্তর মঞ্চে। তবে তলার মানুষের সক্রিয় ভূমিকা না থাকলে আন্দোলন কিছু দূর গিয়ে গতি হারিয়ে ফেলে। এইখানেই আবার সাবধানতার প্রয়োজন আছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের তুলনা চলে প্রাচীনকালের ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে। ন্যায়ের সপক্ষে সংগ্রামে বিদ্বেষের স্পর্শ যত কম থাকে, ততই ভাল, কারণ বিদ্বেষ নতুনভাবে অন্যায়ের জন্ম দেয়। অন্যায়ের পরিচ্ছন্ন সমালোচনাতেই যথাসম্ভব পরিস্ফুট থাকা দরকার এক বিকল্প ব্যবস্থার কথা, আদর্শের কথা, যার প্রতি আনুগত্যেই এই সংগ্রামের মূল্য। ধর্মসমন্বয়চিন্তা ও সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

দুয়েরই একই দ্বান্দ্বিক লক্ষ্য: সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও অনিবার্যতা স্বীকার করেও মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠবার পথে সাহায্য করা।

কুসংস্কারে আশ্রিত অসাম্যের আছে একাধিক রূপ। সামাজিক বৈষম্যের পিছনে কোথাও পাওয়া যাবে শাস্ত্রীয় সমর্থন, কোথাও আবার ধর্মের সঙ্গে এর সম্পর্ক দুর্বল। বর্ণভেদ ও বর্ণবিদ্বেষ একই বস্তু নয়। হিন্দু সমাজে প্রচলিত জাতিভেদের সমর্থন পাওয়া যাবে মনুস্মৃতিতে। পশ্চিমী দেশে আছে ব্যাপক বর্ণবিদ্বেষ, সেটাও নিন্দনীয় কুসংস্কার; তবে এই অন্ধ বিদ্বেষ কোনও পরিচ্ছন্ন ধর্মীয় সমর্থনের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। বর্ণভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মহাত্মা ফুলে থেকে বাবাসাহেব আম্বেডকর পর্যন্ত সবাই হিন্দুশাস্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন। মার্টিন লুথার কিং তাঁর বর্ণবিদ্বেষী আন্দোলনে শাস্ত্রবিরোধিতার পথে হাঁটেননি। পশ্চিমবঙ্গে জাতিভেদ বিরোধী আন্দোলন এখন অবধি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। মার্কসবাদী তত্ত্বে শ্রেণিভেদই মূল কথা। আমাদের কমিউনিস্ট নেতারা জাতিভেদকে গুরুত্ব দিতে তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত নন। বাঙালি সমাজেও কিন্তু অনুসূচিত জাতি উপজাতিসহ নিম্নবর্ণের মানুষের চেতনায় একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে স্পষ্টভাবেই। তাঁরা অনুভব করছেন যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করে আছেন ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থসহ সেই একই গোষ্ঠী বাঙালি সমাজে উচ্চবর্গীয় বলে যাঁদের পরিচিতি। দলিত মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ এ রাজ্যে উপরতলার অধিকাংশ মানুষই মানতে রাজি নন। তবু নিম্নবর্গের মানুষের ভিতর যাঁরা সরব তাঁদের মনে কিন্তু এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে দলিতদের অভাব অভিযোগের ব্যাপারে সরকারি প্রশাসন বিশেষভাবেই বধির ও নিষ্ক্রিয় কারণ কর্মকর্তারা জাতে উঁচু। পশ্চিমবঙ্গে মহারাষ্ট্রের তুলনায় অন্ত্যজ মানুষ অধিক উন্নত অবস্থায় পৌঁছে গেছেন এমন নয়। বরং মহারাষ্ট্রে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয় মানুষ যত বিশিষ্ট স্থানে পৌঁছেছেন পশ্চিমবঙ্গে তত নয়, বাঙালি দলিত আন্দোলনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'চতুর্থ দুনিয়া' এইরকম একটা অনুভবেরই স্বাক্ষর বহন করছে। ভারতের এই প্রান্তেও নিম্নবর্গীয় চিন্তায় আজ লক্ষ করা যাচ্ছে এই ঝোঁক: এখানেও প্রয়োজন সংঘবদ্ধ দলিত সংগ্রাম, জাতিভেদের বিরুদ্ধে পরিচ্ছন্ন তাত্ত্বিক অবস্থান, শাস্ত্রীয় কুসংস্কারের বিপরীতে "সত্যশোধক" আন্দোলন। আম্বেডকর অবশ্য ধর্মের বিরোধী ছিলেন না, বৌদ্ধধর্মে তাঁর আস্থা ছিল। কিন্তু ধর্মের সেই অংশই গ্রহণযোগ্য, সামাজিক সাম্যের আদর্শের সঙ্গে যার সামঞ্জস্য প্রশ্নাতীত। এই রকমের একটা প্রত্যয়ই নিম্নবর্গীয় সংগ্রামী দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার যোগ্য। বাঙালির মোহমুক্ত দলিত আন্দোলন কি নির্বাধায় এই পথে অগ্রসর হতে পারবে? শুভেচ্ছাসম্পন্ন মানুষের কাছে আজ গভীরভাবে চিন্তনীয় এই প্রশ্ন। এ জন্য চাই কিছু দূরদৃষ্টি, কিছু আত্মসমালোচনা, অন্য এক মানবিক বোধ। শ্রেণিদ্বন্দ্বের তত্ত্ব মূল্যবান। তবু সেটা যথেষ্ট নয়। বর্ণভেদের মূলে আছে যেসব চিন্তাভাবনা ও গভীর কুসংস্কার তার স্বতন্ত্র ও মনোযোগী সমালোচনা আবশ্যক।

গুণের ভিত্তিতে কর্মের বিভাগের কথা বলা হয়েছে চাতুর্বর্ণ্যের ব্যাখ্যায়। সনাতন সমাজব্যবস্থার সমর্থকদের বক্তব্য আমরা অনেকেই জানি: বর্ণভেদের আদি লক্ষ্য ছিল গুণের বর্ধন, অসাম্যের রক্ষণ নয়। বিরোধীদের প্রচলিত বক্তব্যও আমাদের কাছে পরিচিত। আদি লক্ষ্য যাই হোক না কেন, হাজার বছর ধরে বর্ণভেদ অসাম্যকেই ধারণ করে আছে। গুণ ও কর্মের স্তরভেদ আছে, বিভিন্ন গুণ ও তৎসংলগ্ন কর্ম সমাজে সমান মর্যাদা পায় না। গুণের পরীক্ষা দিয়ে ব্যক্তির বর্ণ নির্ধারণ করা হয় না, জন্ম ও বংশের সূত্রে বর্ণ নির্ধারিত হয়। বংশের ধারাকে শুদ্ধ রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা হয় বিবাহসংক্রান্ত সঙ্কীর্ণ অনুশাসনের সাহায্যে। উচ্চবর্ণের দৃষ্টিতে শূদ্র আজও অশুচি। শুচিতা অশুচিতা নিয়ে অন্ধ কুসংস্কার জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অমানবিক ভেদ সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ণভেদের পরিণাম স্বরূপ আমরা পেয়েছি বংশভিত্তিক শাস্ত্রসমর্থিত অসাম্য।

এ সবই পরিচিত তর্ক। তবে এর বাইরেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। কঠোর কর্মবিভাগ কি সাংগঠনিক যুক্তির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য? কথাটা ভিন্নভাবে বলা যাক। কায়িক শ্রম এবং বিদ্যাচর্চার ভিতর কঠিন বিভাজন রেখা রক্ষা করা কি সমাজের পক্ষে হিতকর? অথবা, বিশেষ বর্ণের কিছু মানুষ সামরিক কৌশল অর্জনে নিযুক্ত থাকবেন, অন্যান্য মানুষের অস্ত্রচালনার সুযোগ থাকবে না। এটাই কি আজও দেশরক্ষার দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ব্যবস্থা? এটাই কি বাঞ্ছনীয় নয় যে প্রতিটি ব্যক্তির ভিতরই থাকবে একাধিক শিক্ষিত গুণের সমাবেশ, যদিও একটি গুণ ও কর্ম হয়ত প্রাধান্য পাবে তাঁর জীবনে? কিছুটা কায়িক শ্রমের অভ্যাস ভাল সকলের পক্ষেই, কিছুটা বৌদ্ধিক চর্চার সুযোগ থাকা উচিত সুস্থ সকল মানুষরে জন্য। দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে এটাই প্রয়োজন, এর অভাবে সাম্যভাবের অনুকূল সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না সমাজে, প্রাধান্য পায় এক অহঙ্কারী পরজীবী শাসকবর্গ। সমালোচনার এই ধারাতে নিহিত আছে এক নতুন সভ্যতার ভাবনা, "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির", যার অভাবে প্রভু ও দাস, উভয়েরই চেতনা থেকে যায় সঙ্কীর্ণ অতএব মুক্তির আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট। আগামী দিনে এই নতুন সভ্যতার অগ্রদূত হিসাবেই জাতিভেদবিরোধী আন্দোলন লাভ করতে পারে যুগান্তকারী সার্থকতা।

একটি আশঙ্কা মনে রেখেই এই কথাগুলি বলা হল। আজকের অভিজাতশ্রেণির অভ্যস্ত দুর্নীতি ও বিলাসের দ্বারাই যদি আকৃষ্ট হন দলিত আন্দোলনের নেতারা, তার চেয়ে উচ্চতর কোনও আদর্শ যদি তাঁরা সযত্নে গ্রহণ করতে অক্ষম হন, তবে তাঁরা হয়ে উঠবেন না মুক্তসমাজের সাধক অথবা প্রকৃত অর্থে "সত্যশোধক"। কিছু নিম্নবর্গের মানুষ স্থান পাবেন উচ্চবর্গে, কিন্তু তাতে ঘটবে না সমাজের কোনও সার্থক রূপান্তর।

মুক্তিসন্ধানী সব আন্দোলন সম্বন্ধেই এই সতর্কবাণী মান্য। উদাহরণত বলা যায় নারীমুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ আন্দোলনের কথা। আজ অবধি উচ্চবর্গের পুরুষেরা যেসব বিশেষ সুবিধা ভোগ করে এসেছে, যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছে, সেইসব আয়ত্ত করা অথবা তারই অনুকরণ করা যদি হয়ে ওঠে প্রগতিবাদী নারী আন্দোলনের অভীষ্ট, তবে সেটাই হবে আদর্শের দুঃখজনক পরাজয়। পুরনো লেখা থেকে কিছু কথা উদ্ধৃত করছি: "নারীমুক্তির প্রবক্তারা পুরুষের সঙ্গে সাম্য দাবি করছেন। এটা স্বাভাবিক, একে অগ্রাহ্য করা যাবে না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক। পুরুষ তার নিজের স্বার্থে, স্বাধীনতার নামে, যে সমাজ গড়েছে তাতে সে সুখ অথবা স্বস্তি পায়নি। অসুখের সাম্যে কোনও মহত্ত্ব নেই।... নারী ও পুরুষ উভয়কেই এগিয়ে যেতে হবে সহযোগী হয়ে অন্য এক সার্থক লক্ষ্যের দিকে।" আজকের অগ্রগামী আন্দোলনকে হতে হবে একই সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক ও সমন্বয়ী। অতীতের সব কিছুই বর্জনীয় নয়। ইতিহাসে যে নারীকে আমরা পেয়েছি সে শুধুই অবলা নয়; ঐতিহ্যের সূত্রে নারী লাভ করেছে কিছু উৎকর্ষ, সভ্যতার বিকাশে যার বিশেষ প্রয়োজন আছে। নারীকে আজ আয়ত্ত করতে হবে পুরুষের কিছু গুণ, পুরুষকে নারীর গুণ। এটাই প্রকৃত সাম্যের দাবি। এরই ভিতর দিয়ে নারী ও পুরুষ উভয়ে হয়ে উঠবে পূর্ণতর মানুষ।

এই সমন্বয়সাধিকা চিন্তা দলিত আন্দোলনেও প্রয়োজন, যদি এই আন্দোলন হতে চায় আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সার্থক নবযুগের স্রষ্টা। উনিশ শতকী নবজাগরণের অসম্পূর্ণতা নিশ্চয়ই স্বীকার্য। তবু সেখানেও পাওয়া যায় রক্ষা করবার যোগ্য উপাদান। ঈশ্বরচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বংশপরিচয়ে ছিলেন উচ্চবর্ণের মানুষ। তাঁদের দান তবু শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণযোগ্য। শূদ্রকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর অবদানও মান্য। এই উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করলে বঞ্চিত হবে সেই নবপ্রজন্ম, বর্ণের সীমা অতিক্রম করে যাকে অর্জন করতে হবে পূর্ণ মনুষ্যত্ব।

স্মৃতিচারণ

আমার খাঁ (আমীর খাঁ) সাহেব ও আমরা

কৃশানু মিত্র

আমি অতিশয় নগণ্য এক ব্যক্তি, চিৎ হতে চাওয়া কুঁজো, অন্ধকূপের কীট, ভাগ্য আমাকে সেই মানুষের সংস্পর্শে ঠেলে দিল যিনি আজ দুনিয়ার প্রভাবমুক্ত প্রচারবিমুখ এক ব্যক্তিত্ব, যিনি সদাই নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন, যাঁর সঙ্গীতজীবন কেটেছে হিমালয়প্রতিম সঙ্গীতশিল্পী আমীর খাঁ সাহেবের সঙ্গে। যিনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৭৪ সাল— এই দীর্ঘ ১৬ বছর ছিলেন খাঁ সাহেবের ছায়া-সঙ্গী, অবশ্যই নাড়া বাঁধা ছাত্র, নাম মানিক সান্যাল। ওনার অভিজ্ঞতা সঙ্গীত জীবনের সাল তামামি বর্ণনার মাধ্যমে যদি আকাশ ছুঁতে চাই তা হলে পঙ্গুর প্রচেষ্টা হবে হয়ত কিন্তু এ অধম লাচার। গিরির সন্নিকটে যাওয়া চাই লঙ্ঘন হোক বা না হোক। শ্রীসান্যালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল এই— পিতা ছিলেন পঞ্চানন সান্যাল রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর (জ্ঞান গোস্বামীর জ্যাঠামশায়) শিষ্য। আদি নিবাস— পোড়ামাতলা, নবদ্বীপ, নদীয়া। মানিক সান্যাল মহাশয় চার ভাই ও এক দিদির সংসারে ছোট। বড়দা নিতাই সান্যাল সঙ্গীতশিল্পী। মেজদা গোপাল সান্যাল ভারতবিখ্যাত চিত্রশিল্পী। দিদি গৌরী সান্যাল সাহা কণ্ঠশিল্পী। সেজদা অদ্বৈত সান্যাল তবলাবাদক, শিল্পী কেরামত উল্লা খাঁ সাহেবের শিষ্য। মানিক সান্যাল মহাশয় ১৯৩৯ সালে কটকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান নিবাস বেলুড় (হাওড়া জেলা)। উনি ১৯৫৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি আমীর খাঁ সাহেবের কাছে নাড়া বাঁধেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ওনার ছায়াসঙ্গী ছিলেন। খাঁ সাহেব কলকাতায় কালযাপনের অধিকাংশ সময়ই ওনাদের বেলুড় ও দিদির সদর স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন। তাঁর স্মৃতিচারণ অবলম্বনে আমি এক মহান সঙ্গীতপ্রতিভার জীবনের কিছু কাহিনি কথনের চেষ্টা করছি।

সালটা ১৯৫১, মানুষটা মহাজাতি সদনে না দূর হিমালয়ের কালচে নীল আকাশের তলে টান টান হয়ে সগর রাজের ষাট হাজারি বাহিনীর আত্মার সন্ধানে গঙ্গা আনয়নে নিমগ্ন ধ্যানী ভগীরথ ধন্দে পড়তে হয়। পুরাণের গল্প পেরিয়ে গঙ্গার কূল ছাপানো পলি সহস্র বছরে সংস্কৃতি, সভ্যতা, কৃষি, শিল্পের যে বিকাশ ঘটিয়েছিল তার ছিটেফোঁটা এ বঙ্গের ভাগ্যেও জুটেছিল কিন্তু মহাজাতিসদনের সেই রাতে লক্ষ কোটি বঙ্গবাসীর সৌভাগ্য হয়নি উপস্থিত হওয়ার, আবার যাদের সৌভাগ্য হয়েছিল তারাও কতজন আঁধার পেরিয়ে আলোকিত হতে পেরেছিলেন তা বিবেচনা সাপেক্ষ। যে-নদী স্রোত হারায়নি সৃষ্টিই তার নেশা। তার কল্লোলিনী চলনে বেঁচে ওঠে মন সৃষ্টি হয় মননের। সেকালের সেই ভগীরথ শ্বেতশুভ্র বসনে আঁধার আলো করে যেদিন আসীন হলেন স্টেজে সেদিন হিমালয় হারিয়ে যায় মহাজাতিসদনে। তার নিমীলিত আবিষ্ট আঁখিপল্লবে মৃদু প্রভাতসূর্যের কোমলতা। ঋষিপ্রতিম ধ্যানমগ্ন মৌন তাপস আকাশ জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে ওঠেন ধীরে। সময় তিন প্রহর, দীর্ঘ দিনের আর্তি প্রাণ ভেঙে বেরিয়ে আসে। গ্রীষ্ম শেষের শুকনো মাটি বাঁধনহারা বর্ষণের গন্ধে মম করে ওঠে, চলনে অনিয়ম নিয়ম, আকাশে কবুতরের চরকি পাক। মন্দ্র মধ্যম থেকে তার পঞ্চমে অবাধ বিরাজ। ভোগীর লালসাহীন আভোগী স রগ ধস, মরুদ্যানে সুরস্রোত, পেলবতায় আবিল। কৌশানি গান্ধি আশ্রমে টৌবে ম্যানেজারের সঙ্গে ধ্যানগৃহে প্রার্থনার সময় উপস্থিত থাকতেন বেশ কিছু পর্যটক। বলা বাহুল্য তার অধিকাংশই বাঙালি অতএব প্রার্থনার ভাষা বাংলা আর অবলম্বন ছিল রবীন্দ্রনাথ। আজি যত তারা তব আকাশের ব্যাপ্তি অবাঙালি টৌবেজি হিন্দি ভাষায় বর্ণনা করতেন অবাঙালিদের কাছে। কোনও একদিন এমনই সন্ধ্যায় পায়ে পায়ে এগিয়ে আসা আশ্রমের উন্মুক্ত দরজায়, চেয়ে থাকা সেইদিকে যেখানে মানববন্ধন রচনা করে আছে আদিগন্ত হিমালয়। ঘোর তমসায় যেখানে অগুনতি চিক্ চিক্ তারা জোনাকি হয়ে জ্বলে, আকাশকে বুকে ধরে রাখে দূর বাগেশ্বর শহরের আলোকমালা, মনে হয় জলে প্রতিবিম্ব হয়ে আকাশ খেলছে। টৌবেজি বলে চলেন..., আমি ডুবে যাই। হঠাৎই আকাশে তারা খসার মতো সোমের একমাত্রা আগে ধরে ফেলা একবার বারবার হস্তদন্ত ওস্তাদ তবলিয়ার মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সঙ্গত বেহাল, ধ্যানগম্ভীর নিমীলিত চক্ষে তবলিয়ার ভাষা অনুধাবন করে ছোট্ট ইঙ্গিত তারপর সব ঠিক। মহাকাশে কত ঘটনাই ঘটে চলে, বিজ্ঞানী ব্যতিরেকে দূরের মানুষ সবই স্থির ভাবে। মহাজাতি সদনের এই মহাপ্রলয়ের উপলব্ধি বিস্তৃতি লাভ করেনি। প্রলয় জীবনবে লন্ডভণ্ড করে কিন্তু এই এলোমেলো জীবন গুছিয়ে নেওয়া উপস্থিত

এক কিশোরের অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সে কোন বনের হরিণ মনে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল যার চলন বোধগম্য না হয়েও রোমাঞ্চ জাগে। অতঃকিম? ছুটে চলা দিশাহীন ছুটে চলা। দিনে দশ ঘণ্টা গলা ছুটতে থাকে কিন্তু মুক্ত নদীর গতি আসে না। একলব্যের তীরন্দাজি চলতে থাকে, মনে মনে খাঁ সাহেবের মূর্তি গড়ে বিমূর্ত সঙ্গীতসাধনা। যে সঙ্গীত বয়ে যায় যা স্ট্রাকচারড নয় যা স্বরলিপির বাঁধনে রুদ্ধ নয় যা অশেষ তার অসীমতার কূলকিনারা সন্ধান। 'কপালকুণ্ডলা' কাহিনির সেই বৃদ্ধের উপদেশের মতো, না কেনারায় পড়া গেল না। ছুটে চলল সেই কিশোর লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত বিশারদ হতে— মরিস কলেজ, প্রিন্সিপাল রতন ইয়ংকার, ভাইস প্রিন্সিপাল এম. এস. নাট্টু, এক পা দু পা করে অবোধের বোধের সন্ধানযাত্রা। নিজেকে তৈরি করে নেওয়া ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়ার আশায়। ফলত ১৯৫৭-র ডিসেম্বরে মিলল সঙ্গীত বিশারদ। খেয়ালের বেখেয়ালেই কেটে গেল ছয় ছটি বছর। এখন আর দেরি নয়। ডিসেম্বরের শেষাশেষিই দাদা অদ্বৈত সান্যালের গুরু সঙ্গতের কিংবদন্তি কেরামত উল্লা খাঁ সাহেবের গোড় লাগা। হয় ভগবানের দর্শন করাও না হলে ঠাঁই দাও আমি তব চরণে শরণাগত। ছেড়েই দেব গলা সাধা গুরু না মিললে। বরফ গলল। কেরামত সাহেব বললেন, বেটা উতলা হয়ো না আমি তোমাকে মন্দিরে নিয়ে যাব দর্শনে। তারপর সবই তেনার হাতে।

এসে গেল দিন। খাঁ সাহেব কলকাতায় কনফারেন্সে গাইতে এলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারি বুধবার সন ১৯৫৮। দুরু দুরু বক্ষে কেরামত সাহেবের সঙ্গে, ডরোমাত বেটা। কিন্তু সাহস কই? মাথায় হাজারো চিন্তা জট পাকায়, যদি না হয় তা হলে তো বেঁচে গেলাম। গানটান শিকেয় তুলে ঘুম। যদি বলেন, বেটা শুনাও তা হলে তো গেছি। ১৯৫১ সনের সেই দিনটির পর এ ভাবনাই কুরে কুরে খায় যে এ গান সে গান নয়। 'ঝড় এসেছে ওরে ওরে ঝড় এসেছে' মনের ঝড়ে প্রাণ একেই উড়ে যায় তার উপর চলনে ঝড়, কেরামত খাঁ সাহেবের রণমুখী চলনে এ অবোধ শিশুকে অন্ধকার পার করানোর ইঙ্গিত। অপু দুর্গার রেলগাড়ি দেখার উৎসাহ উত্তেজনার সঙ্গে এর মিল আছে। এখানে এক কিশোরকে নিয়ে অসীমের সাক্ষাতে গমন। প্লাস ইফিনিটি আর মাইনাস ইনফিনিটি, মাঝে শূন্য। গারস্টিন প্লেস রেডিও স্টেশন থেকে কেরামত সাহেবের সঙ্গ পাওয়ার আগে পর্যন্ত মন শূন্যতায় পরিপূর্ণ ছিল। আশানিরাশার দোলাচল। কিন্তু খাঁ সাহেবের দৃপ্ত পজিটিভ ভঙ্গিমাতেই সৃষ্ট হয়েছিল মনে অনুরণন। পেয়ে যাওয়ার এই আকাঙ্ক্ষায় পৌঁছে গেলাম ১/১/১, হাজরা রোডের রবীন্দ্র গুহ মজুমদারের বাড়িতে। চৌকিতে আসীন ভগবান, শুরু হয়ে যায় সওয়াল জবাব, তবলার জাদুকর আমাকে আর দাদাকে চৌকাঠে খাড়া করিয়ে দিয়ে রণে মন দেন। দীর্ঘ গম্ভীর কথোপকথনে উভয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। আমি শুধু ব্যগ্র চোখে ভগবান সান্নিধ্য পাবার আশায় উন্মুখ, কোনও চঞ্চলতা আমায় স্পর্শ করে না। হঠাৎই কিঞ্চিত চটে গিয়ে আমীর খাঁ সাহেব বলে ওঠেন, 'আরে কিঁউ বাচ্চে কা জীবন বরবাত করোগে, কলকাত্তা পে তুম যিসকো পাস যাওগে ওহি উসকো শিখলায়গা। হামসে নেহি হোগা।' কেরামত সাহেব বললেন, 'উসকো গান্ডা বাঁধনা হ্যায়, হাম জুম্মা কো আতে হ্যাঁয়। চল বেটা', এক নিমেষে জমাট নিরেট অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোর হয়ে গেল কিন্তু আলো জ্বলল না। মন নিজেকে একরাশ প্রশ্ন শুধায় উত্তর পায় না। ওস্তাদ বলেন, 'কা বেটা কুছ?' হ্যাঁ সাহেব 'হামে তো কুছ মালুম নেহি গান্ডা ক্যা চিজ ক্যায়সে বাঁন্ধা যাতা? 'উত্তর আসে', শুকনো ছোলা ভাজা আখের গুড় লাল সুতো ধূপ মোমবাতি সন্দেশ সঙ্গে নেবে আর ক্ষমতা অনুসারে যা ওস্তাদকে দেবে। তবে ওস্তাদ কেমব্রিকের সূক্ষ্ম নরম পায়জামা আর সিল্ক সিল্ক ওয়েস্ট পাঞ্জাবি পরতে ভালবাসেন।'

বুধবার সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। মাঝে একটি দিন বৃহস্পতি, এ কিশোর পারবে কি সিল্ক সিল্ক ওয়েস্ট জোগাড় করতে? সিল্ক ওয়েস্টের নাম অনেকে শুনে থাকলেও ওই নাম কেউ জানেন না। এমনকী কেরামত সাহেব কাপড়ের নাম জানলেও কোথায় পাওয়া যায় তার সন্ধান দিতে পারেন না। অতএব দুই ভাই মিলে খোঁজ, বড়বাজার, চিৎপুর, হাতিবাগান, গড়িয়াহাটের সব দোকান। নামই শোনেননি অর্ধেক দোকানি, গছিয়ে দেবার ধান্দা সিল্ক ওয়েস্ট। এ কি পরীক্ষায় ফেললেন কেরামত সাহেব! এই সামান্য উপহারও যদি গুরুজিকে দেওয়া না যায়। শেষমেশ ধর্মতলা খাদিভবনে আসা, নবীন বিক্রেতাদের তাচ্ছিল্য দৃষ্টি ভীষণ আঘাত করে, এক পিতৃতুল্য বয়োজ্যেষ্ঠ কান খাড়া করে শুনতে থাকেন সিল্ক সিল্ক ওয়েস্ট। আমি যখন ফেরায় উদ্যোগী, উনি শুধোলেন, 'ও ভাই'। অবসন্ন হতাশ মন চাতক নয়নে চাইল। কি করবেন? 'নাম শুনলেন কোথায়?' আশা পেয়ে গল্প শুরু থেকে শেষ করলাম, ওনার চোখ চকচক করে উঠল। পুত্রস্নেহে বললেন, আমারও জীবনে বড় সাধ ছিল। বুঝলাম না সিল্ক সিল্ক ওয়েস্ট পাঞ্জাবি পরার না খাঁ সাহেবের কাছে গান শেখার। 'কে. সি. দাস-এর ধর্মতলা স্ট্রিটের দোকান চেনো? তার পাশে পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্প সমবায় মহাসঙ্ঘ। ওখানে ঠিক পেয়ে যাবে।' সসম্ভ্রমে সেলাম ঠুকে বললাম, আসি। আবার এক প্রস্থ বর্ণনা, কে, কোথায় কেন? উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে দেখালেন নরম কুয়াশার মতো কাপড়। হিসাব তখন গজে হত, ৬ ফিট ২ ইঞ্চি খাঁ সাহেবের জন্য লাগল সাড়ে তিন গজ কাপড়। দাম ১৯৫৮ সালে গজ প্রতি সত্তর টাকা। বুক থেকে পাষাণভার লাঘব হল, কলকাতা চষে বীরবিক্রমে দু'মুঠো কেমব্রিক আর সিল্ক সিল্ক ওয়েস্ট নিয়ে হাজির। কেরামত সাহেব বললেন, 'আমি কাল

রেডিও স্টেশনে থাকব। যাওয়ার আগে আমায় তুলে নিয়ে যেও।' ১৪ ফেব্রুয়ারি কেরামত সাহেবকে নিয়ে রবিদার বাড়ি আমার মক্কায় উপস্থিত হলাম। ঘরের মধ্যে না খোলা হোল্ডঅল, দেশি এক রমণী এক বিদেশিনির সঙ্গে মশগুল গল্পে। ভাব আদানপ্রদানে কোনও বাধা নেই, কারণ আমরা কেরামত সাহেব নই। পরে জেনেছিলাম দ্বিতীয়জন কানাডানিবাসী। উনি মিউজিকে ডক্টরেট, ভারতে আসার কারণ খাঁ সাহেব। সম্ভবত উনিই গবেষণার বিষয়। অবগুণ্ঠিতা ধীরে আমার আসার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন ও ততোধিক ধীরে আমার পাশে উপবেশন করে পিঠে হাত বোলাতে শুরু করেন। স্নেহমাখা আদরে আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। প্রশ্ন ভেসে আসে, 'বেটা তেরা নাম কা হ্যায় রে?' আমি সমস্ত ভয় ঝেড়ে ফেলে বলে উঠি, মানিক সান্যাল। জানি না পিঠে হাত কীভাবে মনের জোর বাড়িয়ে দেয়। তক্তপোষের ওপর থেকে নেমে আসেন খাঁ সাহেব। নীচে গালিচা পাতা। স্নেহবিহ্বল আমি ঘোর ভেঙে সবাইকে প্রণাম করলাম, রবিবাবুও নীচে বসলেন। জ্বালানো হল মোমবাতি। সৌরভে ঘর ভরে উঠল। মেমসাহেব অবাক দৃষ্টিতে জমে গেলেন আনুষ্ঠানিকতায়। নামাজ পড়তে শুরু করলেন খাঁ সাহেব, আমি তখন শ্রেফ সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছি। হাতে যে কখন লাল সুতো বাঁধা হয়ে গেল, মুখে ছোলা গুড় পড়ল হুশ নেই। হঠাৎই কেরামত সাহেবের ধাক্কায় চেতনা আসে, উনি বললেন গুরুকেও খাওয়াতে হয়। দু-তিনটি আখের গুড় মাখানো ছোলা ভগবানের মুখে গুঁজে দিয়ে গান্ডা বাঁধা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আজ থেকে আমি দেবপুত্র।

'কাল তুমহারা ঘর জায়েঙ্গে।' হাতে পূর্ণিমার চাঁদ এসে পড়ল। মনে জোয়ার। তাড়াতাড়ি গারস্টিন প্লেসে গাড়ি হাঁকিয়ে আর এক সাহেবকে নামিয়ে বাড়ি ছোটা। এক এক মুহূর্ত বড় বেশি মনে হতে থাকে। বাবা, দিদিকে জানাতে বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। যা হোক সবাই জানালেন বাড়িতে উৎসবের ছোঁয়া লাগল। উনি এলেন, সঙ্গে সেই অবগুণ্ঠিতা যিনি এই স্বল্প সময়েই আমার মাতাজি হয়ে গেছেন। খাঁ সাহেব বাবাকে বললেন, 'হাম কাল মানিক কো লেকর বোম্বাই যায়েঙ্গে। আপ ইজাজত দিজিয়ে তো?' বাবা বললেন, 'দেখ খান ও এখন তোমার বেটা। তুমি মারো কাটো আমার বলার কিছু নেই।' স্নেহশীলা মাতাজি যেমন আমার পিঠে হাত দিয়েই মায়ের আসন অর্জন করে নিলেন সেইরকম দিদির অ্যালসিসিয়ানের সদ্য হওয়া বাচ্চাকে বিশাল বাড়িতে ঘুর ঘুর করতে দেখেই মজে গেলেন। অতঃ কিম? আবার অধিগ্রহণ। ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমি পিতাজি ও মাতাজির সঙ্গে ট্রেনে উঠে বসলাম। মাতাজি বিপুলা, লাগেজ ভ্যানে জায়গা না পাওয়ায় কুকুরের বাচ্চা মাতাজির শরীরের মধ্যে চালান হল, চেকার এলে সাবধানে থাকা আর কি। এসে গেল খান্ডোয়া স্টেশন, পিতাজি চললেন ভূপালে গাইতে, আমি মাতাজিকে নিয়ে বোম্বাই। গাড়ি ঢুকে পড়ে স্টেশনে, মাতাজির বর্ণনা মতো 'তেরা য্যায়সা' এক অচেনা যুবককে আনচান করতে দেখে চেঁচিয়ে উঠি, 'একরাম ভাইয়া!' সে ছুটতে থাকে, ট্রেন থামলে একত্রিত ও পরিচিত হওয়া, বন্ধুত্ব হতে সময় লাগল না। মাতাজি চেকারদের গন্ডি পেরিয়েই কুকুরের বাচ্চা কোল থেকে ছেড়ে দিলেন। আমি পেছনে থাকায় চেকারদের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম। সিট্রন গাড়ি বড় মনপসন্দ ছিল পিতাজির, চালিয়ে সোজা পেডার রোডের বাড়িতে নিয়ে গেলেন একরাম ভাইয়া। দিনচারেক মন্দিরে দেবতা ছিল না আমারও ভাব ছিল গা ছাড়া, তার অনুপস্থিতি আমাকে মাতাজির অনেক কাছে এনে দিল। একদিন শোফায় ঘুমিয়ে শীতে কাঁপছি কখন যে কম্বল স্নেহের আঁচ হয়ে শরীরে আবেশ এনে দিল জানতে পারিনি। একরাম ভাইয়া গানে আগ্রহী নয়। আমার খাঁ সাহেব কখনও ভাবেননি ছেলেকে গান শেখানোর কথা। অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম তার কারণ। যেহেতু মুনাব্বর বাবা বড়ে গোলামের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার এক অক্ষম চেষ্টা করেছিলেন, বেসুরো মুনাব্বরের প্রতিপ্রবাদ প্রতিম বাবার ধৃতরাষ্ট্রসুলভ অন্ধ প্রশ্রয়ে খাঁ সাহেবের অবিশ্বাস ছিল। উনি বলতেন, আউর এক মুনাব্বর কভি নেহি যদিও হরি ওমের হরি বড়ে গোলামকে খাঁ সাহেব হাতের কড়ি ১৫ আর ১৬ কড়ি আল্লার মাঝে ঠাঁই দিতেন। আল্লাতালা— বড়ে গোলাম, পরে অন্য কেউ। এই ভাবনাতে জারিত ছিল তৎকালীন সঙ্গীতজগৎ। শ্রদ্ধা, পরস্পরের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।

বোম্বেতে পিতাজি দিন চারেক হল এসেছেন, আমি তানপুরার দিকও মাড়াচ্ছি না। হঠাৎই একদিন মাতাজি শুধালেন, 'মানিক তু কিস লিয়ে বোম্বাই আয়া হ্যায় রে?' গানা শিখনেকে লিয়ে মাতাজি, সলজ্জ জবাব। 'তব্ গাতে কিউ নেহি? আরে আগর তেরা সবকুছ সহি র‍্যাতা তু থোড়ি আতা, এ তেরে কো ভি মালুম হ্যায় তেরে পিতাজি কো ভি।' মনে একটু জোর পাওয়া গেল। সেই প্রথম আমার খাঁ সাহেবের ছ তারের তানপুরায় সুর বাঁধা যে তানপুরা আজও সরস্বতীর বীণার মতো পূজিত হয়। আজও আমার ছাত্রদের বুকে তার অনুরণনে ইতিহাস ধরা যায়। কাঁপতে কাঁপতে প্রথমদিন সা, রে গা, ম প ধ, নি সা, সা নি ধা, প ম গ, রে সা। কেউ আসেন না, সাহস বাড়তে থাকে। চতুর্থ দিন চোখ বুজে গেয়ে যাচ্ছি। জলদগম্ভীর স্বরে 'ওয়সে নেহি' শুনে তাকিয়ে দেখি পেছনের কোচে বসে আছেন। তানপুরা থেকে সরে গিয়ে জায়গা দিলাম, টুং টাং তার নাড়িয়ে দেখেনিলেন সুরের বাঁধুনি, প্রথম পরীক্ষায় পাস। চলল পাঠ। দিনের পর দিন শুধুই টোড়ি। একদিন বললেন, লিখ লে। হন্তদন্ত হাতে খাতা পেনসিল বার করে 'গবওা যে সঙ্গ লাগে রে'। সুরের পাঠ ছিল অন্যরকম। আমার মতো করে উনি গেয়ে যাচ্ছিলেন, শুনে মনে রাখার চেষ্টায় ছিলাম। আগে সুরের পাঠ

নেওয়া না থাকলে হজম করা মুশকিল। টোড়ির শান্ত গাম্ভীর্য ওনার স্বভাবের সঙ্গে মিলত খুব। সমাহিত সেই রূপ সুরে মিশে আমার মনে ছবি হয়েছিল। তাই অন্য কারও বিস্তার শুনলে সেই ছবিটা খুঁজে পেতাম না, মনে হত অন্য গান। মাতাজি মুন্নাবাঈ-এর কথা পদে পদে মনে পড়ে কারণ তাঁর পুত্রস্নেহ শুধু নয়, তাঁর একটা বিশ্লেষক মন ছিল, তিনি প্রতি মুহূর্তে দূর কলকাতা থেকে আসা এই শীর্ণ কিশোরের চাওয়াপাওয়ায় ফাঁক না থাকার হিসাব করতেন। আমার চর্চা কোনও কারণে একবার ভীষণ ধসে গিয়েছিল, উনি একদিন বললেন, 'কাল সে খানাপিনা বন্ধ্।' জীবনে দ্বিতীয় বার এই কথা শোনা। প্রথমবার বাবার কাছে, ভীষণ রাগ হয়েছিল। দ্বিতীয়বার আনন্দে পাগল হয়েছিলাম। সুদূর বোম্বাই-য়ে ঘরের বাইরে ঘর পেয়ে উৎসাহ শতগুণ বেড়েছিল। উনি লক্ষ রাখতেন আমি ঠিকমতো পাঠ নিতে পারছি কি না। যখনই সময় পেতেন, অবশ্যই খাঁ সাহেবের অবর্তমানে, বলতেন, 'তানপুরা লা। শিখলে ঠিকসে' বলেই C সার্প খাঁ সাহেবের স্কেলে ধরতেন আমার পাঠের জন্য নির্দিষ্ট রাগ। জানি না এতটা পথ পেরিয়ে এসে এখন মনে হয় ফিরিয়ে দেওয়া প্রেম ছিল তাঁর কাছে গান। আমাকে শেখানোর অছিলা ছিল মাঝে মাঝে পুরনো প্রেমকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবার এক অক্ষম প্রয়াস, যদিও শেখানোরও কোনও খামতি ছিল না।

পরের রাগ ছিল আভোগী— 'ইহ চরণ ঘর আয়ে', দিন পনেরো চলল। ছাড় নেই। সেই যে টোড়ির পথ ধরে কোচে এসে বসা, তারপর তানপুরা বার করলেই উনি বসে পড়তেন। ছয় তারের তানপুরা ওনার সৃষ্টি, ধূপ ধুনো দিলে যে রকম এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, ছয় তারের গমগমে বাজনা আবহে এক বিশেষ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হত। তার বাঁধার পরীক্ষায় পাস করার পর থেকেই ওনার রেওয়াজের সুরও আমাকে বেঁধে দিতে হত। এমনকী কনফারেন্সেও আমার হাতেই সুর বাঁধা পড়ত, উনি বসার আগে তার টেনে দেখে নিতেন। এতে অনেকে রেগেও যেতেন, বিশেষ করে সুনীল ব্যানার্জি, উষাদারা। দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকার কারণে আমি পুত্রসম বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলাম। ইমন ছিল ওনার একটি মনপসন্দ রাগ। যেদিন আমায় প্রথম শেখাতে শুরু করলেন, বলতে দ্বিধা নেই, খুব একটা নতুন কিছু মনে হয়নি। দীর্ঘ সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে বহুগুণীজনের সান্নিধ্যে বা কনফারেন্স শুনে ইমনের একটি নির্দিষ্ট ধারণা মনে ছিলই, এ তার থেকে খুব ভিন্ন ছিল না। একটু হতাশ হয়েছিলাম বই কি। ওঁর ইমনের অনেক গল্প ছিল তাই আশাও ছিল পাহাড়প্রমাণ। যা হোক দিন চার পাঁচ কাটতেই বুঝলাম গান পরিবর্তন হচ্ছে, 'এয়সো সুঘর সুন্দরওয়া বালম' মাতাজির লেখা আর শুধু সুন্দর নেই আমার বোধকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। প্রত্যেক নতুন দিন আমার কাছে নতুন স্বরগম শোনা, আজ-কালে ফাঁক, জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া যায়। ধারণক্ষমতা ও সময় এই দুইয়েরই প্রয়োজন, তাই পুরোপুরি আত্তিকরণ হয় না। কিন্তু নবরূপে নব কলেবরে এই গানকে দেখা ও শোনার অনির্বচনীয় আনন্দ যিনি পেয়েছেন তিনি প্রকৃতই ভাগ্যবান। ইমন খেয়ালে ওনার খরজ পালটে যে গায়কি তা অনবদ্য, প্রথমে খটকা লাগে স্বরগ্রাম যা গায় তা বলে না। পুরো গানটাই উনি সা কে গা বলে সপ্তক পরিবর্তন করে গেয়ে দিলেন, ইমনের ক্ষেত্রে যা এক অসম্ভব ব্যাপার। তীব্র মধ্যম হয়ে গেল কোমল নিষাদ, স্বর ও সুরের যৌথ আক্রমণে সব হিসাব তালগোল পাকিয়ে গেল। এরপর উ পর্যুপরি আবির্ভাব কখন যে ভূপালী আরোহণে ইমন অবরোহণ? মনে রয়ে গেল শুধু বাটালি দিয়ে কাটা নিখুঁত ভাস্কর্য যা চিরকালীন। কিশোর আমি যা তখন বুঝে উঠতে পারিনি তা হল খেয়ালের ইতিহাস, প্রয়োগের বিজ্ঞান ও সঙ্গীতের বিবর্তনশীলতা।

১২৫৪ সালে যখন খেয়াল গান জন্ম লাভ করেনি তখন ইমনস্রষ্টা আমীর খসরুর পৃথিবীতে আসা। তাঁর পার্সিয়ান রুবাই চলে আসে খাঁ সাহেবের ইমন বন্দিশে। খাঁ সাহেব প্রকৃতই বিপ্লবী মানুষ ছিলেন। তিনি দক্ষতার শীর্ষে অবস্থান করতেন আবার গানের চলমানতার ইতিহাসে দীক্ষিত এক দার্শনিক ছিলেন। সঙ্গীত সৃষ্টির অনেক পর যখন পৃথিবীতে সম্পত্তির ভাবনা বাসা বাঁধে শ্রেণি সঙ্গীতের সৃষ্টি তখনই। এই সঙ্গীত লালিত হয়ে বেড়ে ওঠে শাসকের হাতে শাসনের হাতিয়ার হিসাবে যা পৃষ্ঠপোষকতায় আর্ট ফর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয়। অন্য ফর্ম যা মানুষের জীবনধারণের সঙ্গে যুক্ত তা রুদ্ধ হতে থাকে। আর্ট ফর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয়েও ভাবনার বা বিপ্লবী চিন্তার অভাবে রুদ্ধ ও স্থির থাকে শোষকের সঙ্গীত। চার্চের পৃষ্ঠপোষকতায় যে গান পশ্চাত্যে বেড়ে উঠেছিল, তা নিয়মের শিকলে বাঁধা ছিল এদেশের ধ্রুপদী গানের মতো। মার্গসঙ্গীত ভাবনায় ছিল ঔপনিষদিক শুদ্ধতা। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব সাগর পারে যে হিল্লোল তুলেছিল তার ছোঁয়ায় পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি শিল্পে বহু আগেই রঙ ধরেছিল। আমাদের দেশে সেই ঢেউ গানে এসে লাগতে অনেক সময় নিয়েছিল। বুর্জোয়া বিপ্লবের ফলে গান হয়ে গেল ব্যবসা, মুক্ত হতে পেরেছিল রুদ্ধ সঙ্গীত, জন্ম নিয়েছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র। খাঁ সাহেবের সুর ধরেই এ বিপ্লব আছড়ে পড়ে এ দেশে। পৃষ্ঠপোষকতার গান কখনওই দরবারী ভাবনার বাইরে যেতে পারেনি, না গান ছিল মুক্ত না গায়ক। সামান্য জীবনধারণের মূল্যে কেনা ওস্তাদদের চেয়ে শ্রেণি অবস্থানে উচ্চাসীন ভড়ংবাজ শ্রোতাদের মূল্য বেশি ছিল। সামন্ততন্ত্রের অবসানে খাঁ সাহেবের হাতে ধরেই সঙ্গীত এসে পড়ে গণতান্ত্রিক মুক্তির পথে। তৈরি হয় শ্রেণিবিভেদ মুছে নতুন শ্রোতা যারা ভালবাসতে থাকে অতীতের রুদ্ধ সঙ্গীতকে। তাই পঞ্চাশের দশকে খাঁ সাহেব ও

বড়ে গোলাম আলীর অনুষ্ঠানে দেখা যেতে থাকে মার্জিত, শিক্ষিত গুণী একদল শ্রোতা। মহাজাতিসদনের দরজা একবার বড়ে গোলাম আলী সাহেব খুলে দিতে বাধ্য করেছিলেন হল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে কারণ ছিল অসংখ্য গানপ্রেমী ওইসব নবীন শ্রোতা। সেই যুগেই দেখা গিয়েছিল গায়ক-শ্রোতার এক সূক্ষ্ম ইনটারঅ্যাকশন যা কিনা পরে এক ধরনের গিমিকে পরিণত হয়। চটকদারিত্ব এসে পড়ে গানে, শ্রোতাকে নিয়ে দেখনদার এই খেলা গানের ব্যবসা হওয়ার এক পরোক্ষ ফল। সঙ্গতের সঙ্গে এক অকারণ অভিনয়ে গায়ক দর্শক পালস্ বুঝে নিয়ে হাততালি পেতে চান ফলে চাহিদা বাড়ে, সঙ্গে ব্যবসাও বাড়ে রেকর্ড কোম্পানির। খাঁ সাহেব এই বাজারিয়ানায় সাথ দেননি সারা জীবনেও, তিনি চির অচঞ্চল বিশ্বাস রাখতেন শ্রোতার প্রজ্ঞায়। তাই বহু সংস্কৃতিবান শ্রোতার সঙ্গে স্টেজের বাইরেও তাঁর সখ্যতা গড়ে উঠেছিল যা ছিল প্রকৃতই প্রাণের। ৩৫-৪০ দিন ইমন শিক্ষার পর একদিন দীর্ঘসময় ধরে উনি নিজে গাইতে থাকলেন, সেদিনই ছিল ইমনের শেষ দিন। উনি চোখ বুজে গেয়ে চলেছেন, আমিও নকল করে শুনে যাচ্ছি। দুজনে মুখোমুখি গভীর অনির্বচনীয় সুখে সুখী। উনি কখন গান ছেড়ে চলে গেছেন আমি বুঝতে পারিনি, নিমীলিত চক্ষে আমি গুন গুন করে ভেঁজে যাচ্ছি। প্রয়োজন নেই তানপুরাযন্ত্রের কারণ আমি মনে তার (ইমনের) ছবি এঁকে ফেলেছি যা ভুলবার নয়। মাতাজির বকুনিতে বুঝতে পারি সময় অনেক বয়ে গেছে। আমি সঙ্গীতরূপে বুঁদ হয়েছিলাম।

সেই বছরই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে প্রথম সদারঙ্গের অনুষ্ঠান কলকাতায়। আমরা উঠলাম হোটেল এ্যামবাসিতে। খুব জাঁকজমক সহকারে প্রথম কনফারেন্স। আমিও জীবনে প্রথম স্টেজে তানপুরা ছাড়ার কাজ পেয়েছি প্রবাদপ্রতিম এই শিল্পীর সঙ্গে। গাইবার সময় চোখবুজে খাঁ সাহেবকে নকল করলেও এক ধরনের উৎসাহ থেকে অডিটোরিয়ামে শ্রোতাদের দিকে নজর রাখতাম তানপুরা ছাড়ার সময়। হলভর্তি শ্রোতার সামনে উঠলেন খাঁ সাহেব রাত্রি ১২.৩০-য়ে। শুধু আলাপে ভোর করে দিয়ে গেলেন। শুনেছিলাম ললিতে পাখি ডাকে কিন্তু ভোর কই? এ তো ভাবনায় ভোর। আবার সেই অভিজ্ঞতা হল, খাঁ সাহেব ও তার বাজিয়েরা চলে গেলেও শ্রোতাদের এমন যাদু করেছিলেন যে ঘোর কাটতে সময় নিল, আমার উৎসুক চোখ আবিষ্ট শ্রোতাদের অনুসরণ করতে লাগল। আমি গ্রিনরুম পেরিয়ে অডিটোরিয়ামে চোখ চালিয়ে দেখি পরের শিল্পীর অপেক্ষায় না থেকে প্রায় সবাই হল ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। এইভাবে গান শেখা আর কনফারেন্সে তানপুরা ছাড়ায় দিন যায়, প্রত্যেকটা দিন একটা নতুন ভোর নতুন জেগে ওঠা, নতুন করে ওনাকে ওনার সঙ্গীতকে পাওয়া। উনি প্রথম দিকে ছয় মাস কলকাতায়, ছয় মাস বোম্বাইয়ে থাকতেন। ধীরে কলকাতায় কালযাপন বাড়তে থাকল, আমারও বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি বাড়তে লাগল। গান্ডা বেঁধে বিনে পয়সায় ওস্তাদের কাছে শেখা আর থাকার ঋণ যা অশেষ যা ফেরতযোগ্য নয় তা ফেরানোর তাগিদে খাঁ সাহেবকে বেলুড়ে বরাবরের জন্য তোলার ভাবনা মনে আনচান করতে লাগল। কলকাতায় এলে উনি মূলত কঙ্কনা ব্যানার্জি, পূরবী দত্ত বা উষাদার বাড়িতে অথবা এ্যামবাসি হোটেলে উঠতেন। আমার জামাইবাবু শিব সাহা ব্যবসায়ী ও শিল্পরসিক মানুষ। তার বেলুড়ের বাড়িতে জায়গাও অনেক, খাঁ সাহেবের না পসন্দ হল না। শুধু অসুবিধা কলকাতার দূরত্ব ও যানবাহনের অপ্রতুলতা। কিন্তু পরিবারের আর ক'জনের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে খাঁ সাহেব গানের মতোই মজে গেলেন বেলুড়ে। আসতে শুরু করলেন অসংখ্য গুণমুগ্ধ— আয়ান রসিদ থেকে পণ্ডিত ভীমসেন যোশি পণ্ডিত যশরাজ। এত গুণীজনের সমারোহে বেলুড়ের এই বাড়ি সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে পূণ্যতীর্থ হয়ে গেল। সকালবেলায় খাঁ সাহেব উঠে গুনগুন করছেন, হয়ত কোনও একটি ছুটির দিনের সকালে, এসে হাজির আয়ান রসিদ, দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে গান শুনছেন। মালকোষের জলদগম্ভীর গায়কিতে রসিদ সাহেব স্টাচু, গান ভাঙলে লঘু অথচ গম্ভীর স্বরে 'কবসে?' শুধু এই প্রশ্ন, জমে যেত আড্ডা।

এ সবের মধ্যেই ১৯৬২ সালে আমার বিয়ে হয়ে গেল। আমার অসুস্থ বাবা যিনি বার্ধ্যক্যের কারণে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি তাঁর অভাবে কেউ অভাবী হননি কারণ খাঁ সাহেবের উপস্থিতি। নিজের ছেলের বিয়ের মতোই বরকর্তা হলেন। প্রতিটি নিমন্ত্রিত মানুষকে আপ্যায়ন করা থেকে শুরু করে খাবার টেবিলে গিয়ে তদারকি সে এক আশ্চর্য ঘটনা। যাঁরা ওঁকে চিনতেন তাঁরা ওঁর সাবলীলতায় স্তম্ভিত, যাঁদের কাছে উনি অচেনা ওই হার্দিক আপ্যায়নে তাঁরা মুগ্ধ। আগের রাত্রি ওঁরা জাগরণে স্বামী-স্ত্রী মিলে না গানে আর আড্ডায় বিয়ে বাড়ি জমিয়ে দিয়েছিলেন। এরই মধ্যে মাতাজির মনে সুপ্ত আশা রঙ ধরিয়েছিল একরামের বিয়েও এইভাবে দিতে হবে, একরাম তখন কানাডায় ইঞ্জিনিয়ার এবং থিতু। বছর বছর আসতেন, বাড়ির টান প্রবলই ছিল। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে মেলামেশা তাকে অন্য দিকে নিয়ে গেল। একবার খাঁ সাহেব বেলুড়ে, মাতাজি পেডার রোডে। একটা ছবি খামে ভেসে এল, দিদিকে লেখা 'হামারা পসন্দ অব আপলোগোকে লিয়ে।' আমাদের বাড়ির সম্মতি পেলেও ভাগ্যের বিড়ম্বনায় মাতাজির ইচ্ছাপূরণ হল না। একরাম মেম বিয়ে করে ফেললেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের ইচ্ছেগুলি এমনভাবে লালিত যে হঠাৎ হঠাৎ পাশে কাউকে দেখে শিকলের আনাড়ি নাড়ীগুলি চনমন করে ওঠে। কৃষ্ণা দাশগুপ্ত নাড়া বেঁধেছিলেন খাঁ সাহেবের কাছে সদর স্ট্রিটে দিদির বাড়িতে, সম্ভবত ৬৪-৬৫ সালে এই

অনুষ্ঠানে আসন আলো করেছিলেন কাননসাহেব ও মালবিকাদি। আমার স্ত্রীর এলিয়ে থাকা ঘন কুন্তল ছিল মালবিকা কাননের আগ্রহস্থল। স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এইসব রমণীগণ সময় ভেদে অত্যন্ত সাধারণ। আবার কখন যে কে অনন্যা হয়ে ওঠেন তা সঠিক করে বলাও যায় না।

খাঁ সাহেবের পূর্বপুরুষরা ইন্দোর মহারাজের দরবারে মিউজিসিয়ান ছিলেন তাই ওনার শরীরে মনে ছিল সুর। বাবা শাহমির খান ওস্তাদ সারেঙ্গিবাদক ও বীণকার ছিলেন। উনিও দরবারে ওস্তাদের মর্যাদা পেতেন। গাইয়েদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল ছিল যে সারেঙ্গিতে সুরের চলাচল অধরা থাকলে ওস্তাদ হওয়া যায় না। কিরানা ঘরানার করিম সাহেব ও বড়ে গোলাম সাহেব সারেঙ্গিতে সুর লাগানোয় সাবলীল ছিলেন। প্রথা মেনেই শাহমির খাঁ পুত্রের হাতে যন্ত্র ধরিয়েছিলেন, কিন্তু আগেই বলেছিলাম বাঁধনহারা বাজনায় ওনার মতি নেই। ভালবাসতেন আবদুল করিমের গান। মিশুকে মজলিসি বাবার বিখ্যাত সমকালীন সব ওস্তাদ বন্ধু যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সারেঙ্গি বাদক তাঁরা সবসময় ঘর আলো করে থাকতেন। এ ছাড়াও ওস্তাদ ওয়াহিদ খান, রেজব আলি খান ও আমন আলি খান ছিলেন কিশোর আমীর খানের স্বপ্নের গায়ক। এসব তাবড় শিল্পীদের সঙ্গে খাঁ সাহেবকে নিয়ে অনেক চালু গল্প আছে। যেমন ওয়াহিদ শাহমির পুত্রের ভাবগতিকে সন্তুষ্ট ছিলেন না ফলে স্পষ্টতই উনি ওই কিশোরকে গান শেখাতে চাননি। রুষ্ট হওয়ার কারণ সম্ভবত ওনার গানকে ওনার গায়কিতে পরিবেশন না করা। একলব্যের দ্রোণের প্রয়োজন হয় না। এ কিশোরেরও তাই সরাসরি শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি। উনি লুকিয়ে শুনেও হুবহু আত্মস্থ করেছিলেন এবং ওই ধীর গায়কি আরও বর্ণময় করে অতি বিলম্বিত গানে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ওয়াহিদ খান স্বীকার করেছিলেন আমার গান আমীরের কণ্ঠেই বাঁচবে। রেজব আলি খানকে নিয়ে প্রচলিত গল্প আরও মজার— সরাসরি শেখাতে নিমরাজি ছিলেন উনি কারণ ওনার ছাত্ররা সবই রাজারাজড়াদের কেউকেটা সন্তান, তাই অভাব সময়ের, শাহমির খানের অনুরোধ তাই তিনি রাখেননি। আমীর খান লুকিয়ে দরবারে বা অন্য কোথা থেকে ওনার গান সংগ্রহ করেছিলেন। মৃত্যুশয্যায় রেজব আলি খান শাহমিরের অনুরোধ ফেলতে পারেননি, রাজি হন শাহমির পুত্রের গান শুনতে। উনি নিজের গান কিশোরকণ্ঠে শুনে আপ্লুত হন এবং স্বীকার করেন এই ভুল ক্ষমাহীন। রেজব খানের দেওয়স ঘরানার তান গায়ন ছিল আমীরের আরাধনা। এর সঙ্গে ছিল আমন আলি খানের অঙ্গ, স্বরগম বিন্যাসের বিভিন্নতা যা অন্য ঘরানায় বিরল। রবীন্দ্র গানে 'সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় যায় না তারে বাঁধা', সে রকমই অধরা ছিল স্বরগমের জ্যামিতি। এই তিন ধারার ওস্তাদি এবং তাদের গায়নপদ্ধতি ভেঙে সুষম মিশেলের ফলেই জন্ম নিল নতুন ঘরানা ইন্দোর। যেখানে পৃথকভাবে ভিন্ডিবাজারি স্বরগম বা দেওয়েস কিরানা ঘরানা প্রকট নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর সারঙ্গদেবের মীড়খণ্ড স্বরগম মাত্রা পেয়ে গেল খাঁ সাহেবের উল্কাতানসহ খেয়ালে। হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের বেশিরভাগ গায়ক একটি বিষয়ে এক। যে-কোনও শৈলী যদি তাদের গানে স্বতঃস্ফূর্ত আসে তাকে বৈধতা দিতে প্রাচীন সোর্স কী, তার কাল্পনিক গল্প ফাঁদতে হয়। এর কারণ এর ঔপনিষদিক বা বৈদিক শুদ্ধতার মিথ। এই সঙ্গীতের গায়কি অনেকটা বেদের মতো শুনে মনে রাখতে হয়, যাকে শ্রুতি বলে। নতুন স্টাইল আমদানি হলে যদি শ্রোতামহারাজ বা পারিষদকুলের কাছে অপাঙতেয় ভগবৎবিরোধী হতে হয়। তাই কাল্পনিকতায় ডুব। খাঁ সাহেব এসব গ্রাহ্য করতেন না, নিজের গানকে স্বীকৃতি দিতে ডরাতেন না।

মনে পড়ে কোনও এক নমাজের দিনে উনি ঘরে বসে ধ্যানমগ্ন, মনে গান খেলে চলেছে, মাতাজি বললেন, 'ক্যা খান নমাজ কা টাইম বরবাদ মাত্ করো।' উনি অনড়অচল। বারবার মাতাজির ধাক্কায় উনি বললেন, 'চল বেটা'। আমি, একরাম, উনি আর সিট্রন একে একে বোম্বাই-এর সব মসজিদ চষে ফেললাম, সময় অতিক্রান্ত, নমাজ হল না। উনি বললেন, 'সব ব্যাকোয়াস হ্যায়', খাবার কিনে পেডার রোডের বাড়িতে ফেরা। মাতাজি হাঁকলেন, 'নমাজ নেহি হুয়া না'। খাঁ সাহেব ঘরে নিজের মতো নমাজ পড়ে নিলেন। নিয়মের নিগড় ওনার সহ্য হয় না। আমি দিদির বাড়িতে ওনাকে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ পড়তে দেখেছি। ধর্ম তাঁকে কোনও নিগড় কখনও পাতে পাররানে। উনি মানসিকতায় স্যুফি ছিলেন। তাই গানেও মুক্তবিহঙ্গ, নিজের গান নিজের বলতে দ্বিধা ছিল না, ভরসা রাখতে হত না বেদ উপনিষদে। নিঃসঙ্কোচে কোঠার মেয়েদের শেখাতে যেতেন। তাঁর সঙ্গ ও শিক্ষা পেয়ে সেই সব কোঠার শিল্পী পূজিত হত সাধারণ্যে। এমনকী এইসব কোঠায় উনি থাকতেন দিনের পর দিন। এইভাবেই মুন্নাবাঈ, আমার মাতাজি এসেছিলেন তাঁর জীবনে। সাদির আগে মাতাজি বিখ্যাত গানওয়ালি ছিলেন। ওনার গলার তুবড়ি ওনাকে প্রচুর অর্থের যোগান দিয়েছিল। উনি স্বামীর ক্ষমতা ঐশ্বরিক বুঝে বাজাররূপ কনফারেন্সে তড়িঘড়ি গাইতে দেননি। দীর্ঘ ১৫-২০ বছরের সাধনা মাতাজি ওনাকে ঘরে বসে করিয়েছিলেন। মাতাজি তাঁর সর্বস্ব বাজি রেখেছিলেন খানের গানে, বাড়ি বসে উনি রেওয়াজ করতেন আর মাতাজি শুনতেন। সেই প্রভাবে মাতাজির গায়কি মিলেমিশে একাকার। আমি কখনও তা আলাদা করতে পারিনি। নিজের সুবিশাল সম্ভাবনাময় সঙ্গীতজীবন এইভাবে হাঁড়িকাঠে চড়িয়েছিলেন আমার অনন্যা মা। কনফারেন্সে গাইতে শুরু করেই উনি জয় করেছিলেন শ্রোতাদের হৃদয়। দু'ভাবে ওনার গান ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এক, ছাত্রদের দ্বারা, দুই,

কনফারেন্স গায়ন। তানপুরা ছাড়তে ছাড়তে লক্ষ রাখতাম সবই, কিছুই চোখ এড়াত না। সেতারী নিখিলবাবু আসতেন। শুধুই খাঁ সাহেবকে শুনে চলে যেতেন। একবার নয় বারবার বিভিন্ন কনফারেন্সে। খুবই আশ্চর্য লাগত। পরে যখন ওনার বাদনশৈলী লক্ষ করতে থাকলাম বুঝলাম, বিস্তর ফারাক। কণ্ঠের গান উনি সেতারে ঠাঁই দিলেন, ট্রাডিসনাল বাজনা হারিয়ে গেল বিলম্বিত স্রোতে। এই অর্থে উনি শুধু কণ্ঠসঙ্গীতে নয় বাদনরীতিতেও বিপ্লব এনেছিলেন। এইভাবেই আমার আবিষ্কার নিমীলিত আঁখির রহস্য। বিলায়েত খাঁ সাহেবের বোনকে উনি তালাক দিয়েছিলেন! উনি ছিলেন খাঁ সাহেবের প্রথমা স্ত্রী। কলকাতার সব কনফারেন্সেই উনি হাজির হতেন প্রথম সারিতে দুই আমীর ঔরসজাত কন্যা নিয়ে। তালাক দেওয়া স্ত্রীকে কোনওদিনই না দেখার ছল ছিল সম্ভবত চোখ মুদে গান। যদিও অনেক কলমলেখকের মতে ওস্তাদের এই ভঙ্গিমা রাগের সঠিক ভাব প্রকাশ ও গানের বাণী ব্যাখ্যার অকৃত্রিম প্রয়াস। চিরদিন, আজও গানই একমাত্র দোসর হওয়ায় খাতা কলম বাধ্যতামূলকভাবে কৈশোরে এলেও বুকে স্থান পায়নি। কিঞ্চিত কলমচালনার অভ্যাস থাকলে কতশত ইতিহাস স্মৃতির সরণি ছেড়ে চলে যেত না। তাই এখন হাতড়াতে হচ্ছে খুব, সময় ওলটপালট সামান্য হতে পারে কিন্তু ঘটনার ঘনঘটা হয়ত সে ফাঁক বোজাতে সক্ষম হবে।

৬৪-৬৫ সালে বেলুড়ের অনেকেই পেডার রোডে আমাদের বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বোম্বাই স্টেশনে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে খাঁ সাহেবের বাড়ি যাব বলায় সে উত্তর দিল আমি চিনি লেকিন আপলোগ ওঁহা কিসকে পাস যায়েঙ্গে? দিদি বললেন, আমীর সাহেব কা পাস। দেখকে মালুম হোতা আপলোগ বাঙালি হ্যায়। দিদি বললেন, তো ক্যা? নেহি ঠিক হ্যায়, অবিশ্বাস নিয়ে বললেন মনে মনে হয়ত লালন করতে লাগলেন ঝুটা কাঁহিকা। গাড়ি ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াল। খবর গেল ওপরে। খাঁ সাহেব ও আমি নীচে নামলাম। ট্যাক্সি থেকে মালপত্তর নামানো হল। ট্যাক্সি ড্রাইভার হাঁ করে দেখতে থাকল। ওর বিশ্বাস হচ্ছে না সুদূর কলকাতার একদল ভেতো কি করে খাঁ সাহেবের বন্ধুতা অর্জন করতে পারেন। চক্ষু চড়ক গাছ হওয়ার সময় তখনও যায়নি। ট্যাক্সিকে টাকা মিটিয়ে দেওয়া হল, ড্রাইভার তখনও দাঁড়িয়ে রইল, আমরা ভাবলাম আরও টাকা চাই। দিদি শুধোতে লাগলেন। আমরা যেটা লক্ষ করিনি সেটা ওর চোখ, ওর নিষ্পলক দুটি চোখ অনুসরণ করে পেলাম ওর নিশানা। যেখানে খাঁ সাহেব ঠিক কুলির মতো মালকোচা গুঁজে সুটকেস মাথায় সিঁড়িতে ঢুকে পড়লেন। আমি এক ছুটে হাজির হলাম কিন্তু নির্বাক ফেরত এলাম। ওনার হিমালয় ব্যক্তিত্ব অতিক্রম করার কোনও সাহস হয়নি তাই প্রশ্নও করতে পারিনি। শুধু কর্মের মাঝেই ওনাকে জেনেছি এবং গ্রহণ করে এগিয়েছি। নিমেষে মাল মাথায় তুলতে আর জীবনে লজ্জাবোধ করিনি। খুব মজা হত যখন ওনাকে নিয়ে রাস্তায় বেরতাম, আজানুলম্বিত বাহু সবসময় আমার কাঁধ ছুঁয়ে থাকত। প্রশ্নহীন আমি চলেছি ওনার সঙ্গে। উনি হয়ত নিজেকে হারিয়েছেন, সামনে গাড়ি বা রাস্তার মোড়। কাঁধে ছোট্ট চাপ যাতে বাঁ বা ডাইনে যাবার ইঙ্গিত। আবার হাঁটা চলবে যতক্ষণ উনি ফিরে না আসেন নিজের মধ্যে। মহাদানী কর্ণ গুরুকে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করে শাস্তি পেয়েছিলেন। আমার ক্ষেত্রে জুটেছিল বদলে আদর। আমি হয়ত ওনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি উনি গানের ভাবনায় নিশ্চুপ। ভাবনা ভঙ্গ হতে দেখা গেল তিন ঘণ্টা অতিক্রান্ত। উনি আদর করে বলতেন, 'ব্যেটা তু কুছ বোলা নেহি?' উনি যখন বেলুড়ে নিজের কাজে বেরোতেন। ওনার বিশেষ কাজের মধ্যে পড়ত জামাকাপড় ইস্ত্রি করানো আর পানের যোগাড়। কোন দিন কোন কনফারেন্সে কী পরিধেয় তা আমিই ঠিক করতাম। ইস্ত্রির দোকানে কোনওরকমে ব্যাগ ছুঁড়ে পাড়ার এক আধবুড়ো সমবয়সি ছোড়দার দোকানের চাতালে বসে পানের অর্ডার, 'ছোড়দা পান লাগাইয়ে।' জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ দুজন, সামাজিক পরিচয়ে ফারাক যাদের আসমান জমিন তাদের এই বন্ধনের কারণ পাওয়া সত্যই ভার। পানের অর্ডারি নিয়ে ছোড়দা চুপ করে বসে আছেন আমীর সাহেব গুন গুন করছেন। কখনও ছোড়দা শৈশব হাতড়ে তার লাঙল দেওয়া হাত দিয়ে তবলা শেখার আকুতির কথা বলতেন। দারিদ্র যেখানে অতিক্রম করে গেছে তার আকুতিকে সেখানে খানসাহেবের শৈশব মেলে না এই গরিব দিনমজুরের সঙ্গে। বৃষ্টি যখন আমার চোখের জলে অন্য কারও দুঃখের কথা বলে হয়ত সেইখানে ছোড়দার ব্যর্থ সাধ ওনাকে স্পর্শ করত। মাঝেমধ্যেই আড্ডার সময় দীর্ঘ হত। খোঁজ নিতে গেলে দেখা যেত সুরহীন তালছাড়া সঙ্গতে মজে আছেন দুজন। জীবনের শেষপ্রান্তে এই সঙ্গতের রেশই ছিল ছোড়দার বেঁচে থাকার রসদ। পরবর্তী প্রজন্মের তাচ্ছিল্য অনায়াসেই হজম করতেন ওই স্মৃতিরসে ডুবে থেকে।

কবিদের সঙ্গে ওনার মেলামেশা ছিল খুব। শক্তি সুনীল ছিলেন গুণমুগ্ধদের অন্যতম। মূলত উনি স্বভাবকবি ছিলেন, বহু ভাষা উনি জানতেন তার মধ্যে প্রধান ছিল হিন্দি, উর্দু, পারসি ও সংস্কৃত। কবিসঙ্গ ওনার নির্দিষ্ট ভাবনারই ফল। উনি খেয়াল গায়কিতে কবিত্ব ও কথার ভাব প্রকাশকে খুবই গুরুত্ব দিতেন, আর পাঁচজন গাইয়ের মতো লিরিককে অবজ্ঞা করেননি। বহু গানের লিরিক তিনি নিজে রচনা করেছেন। উনি বিশেষ অপছন্দ করতেন খেয়াল গানে সারেঙ্গি বাদন। গানের পেছু হারমোনিয়াম ধাওয়াও তিনি পছন্দ করতেন না, তানপুরার ভরাট আবহে গান ছিল তাঁর অতিপ্রিয়। একবার বেলুড়ের বাড়িতে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ মশায় এসেছেন, এ রকম ছোট বড় মজলিস বাড়িতে লেগেই থাকত। জ্ঞানবাবু হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছেন। ওনার

মতো মহাগুণী যাঁর হাত বিদ্যুৎসম সুরে ভাসত তিনি হঠাৎই অপারগ হয়ে থেমে গেলেন। রসিক খাঁ সাহেব বললেন, 'ক্যা জ্ঞানবাবু বাজাইয়ে বাজাইয়ে'। জ্ঞানবাবুর দৃপ্ত অথচ সলজ্জ উত্তর ছিল, 'আপকা কন্ডিশেনশন হামারা দিমাগ মে নেহি আতা।' হারমোনিয়াম সঙ্গত সত্তবত এই কারণেই ওনার পছন্দ ছিল না। উনি জানতেন নিজের অসীম অনন্ত ক্ষমতার কথা, অন্য কারও পক্ষে তার নাগাল পাওয়ার চিন্তা ছিল অলীক। জীবনে একবার এক মুহূর্তের জন্য আমি ওনাকে শালীনতার গণ্ডি পার হতে দেখেছি যা ছিল ব্যাখ্যাতীত এবং আকস্মিক। তার সপ্তক থেকে মন্দ্র সপ্তকে যেভাবে বৃষ্টির মতো নেমে আসেন, শালীনতার প্রলেপে উনি সেই আঘাত মুছে দিয়েছিলেন চকিতে। ঘটনাটি ঘটেছিল তপন সিংহ মহাশয়ের ক্ষুধিত পাষাণ ছবির রেকর্ডিঙে। ওস্তাদ আলি আকবর খানের সুর ক্যায়সে কাটে রজনী বিনা সজনী। তানপুরায় আমি আর সুনীল ব্যানার্জি, গাইবেন বিখ্যাত শিল্পী প্রতিমা ব্যানার্জি আর খাঁ সাহেব। বাগেশ্রীর বন্দিশ খাঁ সাহেব ছাড়লেই দিদি ধরবেন। সাত সাতবার আকবর সাহেব কাট বললেন। নিমেষের অসহিষ্ণুতায় আমার পিতাজি বলে উঠলেন, 'ক্যা কুড় কে হামারা সাথ বৈঠায়া।' শব্দহীন অবকাশ বাড়তে দিলেন না শ্রদ্ধেয়া দিদি। উনি সটান খাঁ সাহেবের চরণে ঠাঁই নিয়ে বললেন, 'দীন আমি, আময় শক্তি দিন।' চকিতে মহারাজ নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ঘাবড়াও মত, সব ঠিক হো যায়েগা, ব্যাস সব ঠিক।' এই অসহিষ্ণুতাই একমাত্র বেসুরো সঙ্গীত ওঁর জীবনগানে।

একবার উনি আমায় বড়ে গোলাম সাহেবের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি আর এক ওস্তাদ যাঁকে উনি সম্মান করতেন তাঁর কাছে যেতে পেরে আহ্লাদিতপ্রাণ। নিখুঁত সাজানো ড্রইংরুম মন কেড়ে নেয়। বড়ে গোলাম সাহেব আমার সাহেবের মতো হিম্যান নন, উনি সোজা বসতে পারতেন না। পা ছড়িয়ে এমন বসতেন যাতে বৃহৎ উদর খেলতে পারে। সাজানো শোকেস দৃষ্টি কেড়ে নেয়—রাজারাজড়ার উপহারের সমারোহে ঠাসা। আমাকে নিবিষ্টচিত্তে পর্যবেক্ষণ করতে দেখে ইন্দোর ঘরানার জনক বললেন, 'আরে বাইরের সৌন্দর্যেই তুমি মগ্ন হয়ে গেলে' অন্দরমহল দেখলে তো তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে।' আমার আগ্রহ বাড়ল। বড়ে গোলাম সাহেব বললেন, 'কাঁহে বাচ্চা কা সামনে...', কথা ফুরাবার আগেই খাঁ সাহেব হাত ধরে আমায় অন্দরমহলে হাজির করলেন। বাড়িতে ডাকাত পড়লে যেরকম ঘর লন্ডভন্ড হয় সেরকমই অগোছাল। টেবিলে একটা প্লেটে তাগাড় করা মাংসের হাড় যার কারণে বাইরে দেখলাম খেলানো বিশাল উদর। আমার সাহেব বললেন, 'দেখা না'? 'গোলাম সাহেব লাজুক মুখে বসে রইলেন। এতই স্বচ্ছন্দ সাবলীল ছিল ওনাদের সম্পর্ক। তাই হরি ওম সাহেব বলতে দ্বিধা করেননি, খাঁ সাহেব য্যায়সা গাওয়াইয়া না কভি থা না কভি আয়েগা।

টাকা পয়সার হিসাবেও খাঁ সাহেব উদাসীন ছিলেন। ৬০-এর দশকে কনফারেন্স গাইতে উনি ২৫০০০ টাকা নিতেন অথচ জামাইবাবু শিব সাহার ব্যবস্থাপনায় উনি ফি বিছর বেলুড়ে বিনে পয়সায় গাইতেন। একবার পণ্ডিত রবিশঙ্করও এসেছিলেন। বেলুড়বাসীর সঙ্গে মার্গসঙ্গীতের আর পণ্ডিত রবিশঙ্করের কথায় যিনি আমীর খানের মারোয়া শোনেননি তিনি মারোয়াই শোনেনি সেই মারোয়া সম্রাটের বন্ধন ছিল অটুট। আজকের জেনারেশন যার খোঁজ জানে না। আমার কাজ ছিল ওনার অ্যাকাউনটেন্টের, সব টাকা বুঝে ওনার ব্যাঙ্কে চালান এবং শেষমেশ বোম্বে পাঠানো। যেহেতু উনি হিসাবে সময় দিতেন না তাই হিসাবি কিছু লোক ওনার গান সংগ্রহ করে ভবিষ্যতের হিসাব কষেছিলেন। এদের মধ্যে কুমারপ্রসাদবাবু অন্যতম। বেলুড়ে রেকর্ড করা গ্রুনডিগ ফোর ট্রাক মেশিনের চার স্পুল গান শুনব বলে নিয়ে আর ফিরলেন না। আমি যেহেতু হিসাবরক্ষক তাই কোল ইন্ডিয়ার মহারাজের বাড়ি অনেকবার গেছি। শেষমেশ উনি বলেছেন, আমি নিইনি। বেহিসাবি খাঁ সাহেব কখনও বেশি পয়সার টানে বিদেশে ঠাঁই নিতে চাননি কারণ দেশের সঙ্গীত দেশবাসীর কাছে না পৌঁছে ডিনেদেশি টাকার আদরে সর্বত্রগামী হবে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল না।

মধ্যগগনে বিরাজমান খাঁ সাহেব ৬০-এর দশকের শেষ প্রান্তে নিজের জীবনকে অস্থির করে তুললেন। সে দায় প্রচ্ছন্ন হলেও তাঁরই। মধ্য সূর্যের দীপ্তি পোড়াতে বাধ্য করে বেশ কিছু রঙিন পতঙ্গদের, খাঁ সাহেব কতটা নিজেকে পুড়িয়েছিলেন তার সন্ধান পাইনি। কিন্তু আগুনের চারপাশে মরণ আশায় উড়ান দেখে মাতাজি অস্থির। তিনি বোঝেন বা ভুল বোঝেন সম্রাটের জীবনে মুন্নাবাঈ-এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অভিমানী মাতাজির জীবনের অস্থিরতা দিন দিন বাড়তে থাকে। জীবনের বিনিময়ে যে বাজি খেলেছিলেন ফানুস হয়ে তা আকাশে ভাসমান নিজের ইচ্ছায়, নাগল যার অসত্তব। স্বপ্ন ছিল ভালবাসার। ফেরত পাবার আশা ছিল না। আজ যখন প্রেম পলায়মান তখন খুঁটিনাটি হিসেবনিকেশ। জীবনে গান থাকলে আশ্বাস থাকত, ভুলে যাওয়ার ছল হিসেবে গান মহতী অবলম্বন। মাতাজি সবহারা, তাঁর প্রেম গেছে ভেসে, তাঁর গান তাঁকে ছাড়েনি। তিনিই প্রেমের বিনিময়ে তাকে যেতে দিয়েছেন। মাঝেমধ্যেই ঝগড়া লেগে থাকত, দ্বন্দ্বের মূল ছিলেন পূরবী, কঙ্কনা। শ্রীকান্ত বাখড়ে মাতাজি-পিতাজিকে নিয়ে তাঁর চারু মার্কেটের বাড়িতে কিছুদিনের জন্য

তুললেন। আমি সক্কালে গিয়ে পৌঁছাতাম আর রাতে বাড়ি ফিরে আসতাম। চলত গানবাজনা। কিন্তু কোথায় যেন সুরছন্দহীন এই যাত্রা, প্রাণের অভাব। যাট ছুঁইছুঁই খাঁ সাহেব বড়ই নির্লিপ্ত, তাঁর এই ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত উদাসীনতায় মাতাজির জ্বলন বাড়ত বই কমত না। একদিন সকালে আমি হাজির। খাঁ সাহেব বললেন, 'মানিক, কাল সে তেরা মাতাজি কুছ নেহি খাতি'। বুঝলাম উত্তেজনা চরমে। মাতাজি বললেন, 'মানিক, ইসকে পয়সা কা খানা ছুয়েঙ্গি ভি নেহি, আগর তুম...।' ইশারাই যথেষ্ট ছিল সন্তানের কাছে। একছুটে দোকান, কুড়িয়ে বাড়িয়ে পকেট খুঁজে ডিমটোস্ট কেনা, মাতাজির খিদে মিটল। যা মিটল না তা চাওয়া পাওয়ার হিসাব। পরের সকাল জানান দিল মাতাজি নেই, ঘর ছেড়েছেন। আমার মা, অনন্যা মা যাঁর স্নেহে লালিত আমি বোম্বের দূর জীবনে গানে বুঁদ হয়েছিলাম তিনি স্বেচ্ছানির্বাসিতা। একরাম এলেন কানাডা থেকে। সে অর মানি টো টো ভারত ঘুরে বেসাহারা। তাঁর অতীতেও তিনি ফিরে যাননি।

সে অসহ শোকচিহ্ন কোথায়। সত্তরের শুরু অথবা ষাটের শেষ ঠিক মনে নেই পিতাজি ইন্দোরের এক মহিলা যিনি পুলিস অফিসারের স্ত্রী ছিলেন তাঁকে বিয়ে করলেন, শাহবাজ খান ছিলেন ওই ভদ্রমহিলার পুত্র। বেলুড় সত্তর দশকের শুরুতেই উত্তাল নকশাল আন্দোলনে, তাই খাঁ সাহেবের বেলুড়ের পাট চুকল বরাবরের জন্য। উনি দিদির সদর স্ট্রিটের বাড়িতে উঠলেন। সেখানে ছিলেন আমৃত্যু।

একদিন বাড়িতে বসে সকালে ধিন ধিন ধাগে তেটে থুন না কত তে ধাগে তেটে ধিন না ছন্দে ভাঙলেন একতালকে। সারাদিন চলল অনুশীলন। রাত্রে কেরামত সহযোগে পরিবেশন যিনকি রাম বিরাজে। বিলম্বিত মালকোষ পরে দ্রুত, গানের জোয়ারে আপ্লুত শ্রোতা, মনে হঠাৎই বেসুরো খটকা। জীবনে প্রথম খাঁ সাহেব ভুল গাইলেন। কোমল নি হারিয়েছে। খোঁজ খোঁজ, নিষাদ বর্তমান অথচ নি-খোঁজ। দীর্ঘ গান যখন দিগন্তে ডুব দিয়ে হারিয়ে গেল তখন শ্রোতাদের বোধোদয়— এ তো মালকোষ নয় চন্দ্রকোষ। কঙ্কনার আত্মীয় চাটার্জির বাড়িতে উনি মাঝে মাঝে অবসরযাপন করতেন। একদিন চ্যাটার্জির এক পাইলট বন্ধু এসে হাজির। নিমন্ত্রণ ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ আলিপুরের বাড়িতে। আমার পক্ষে অত রাতে বেলুড়ে ফেরার সুবিধা হবে না ভেবে অনুমতি নিলাম। নিমন্ত্রণ শেষে ফেরার পথে এল সেই মুহূর্ত, গাড়িতে পূরবীদি, মাতাজির ধর্মভাই একবাল আর উনি।

গাড়ি আলিপুর ছাড়ার মুখে মৃত্যুদূতের মতো কালো আর এক গাড়ি। গাড়ি চালানোয় সিদ্ধহস্ত হওয়ায় সহজাত অনুভূতি থেকে গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। গাড়ি থেকে বেরলেন কিন্তু বিপদ থেকে নয়। সামনেই যমদণ্ড লাইট পোস্ট লাগল মাথায় চলে পড়লেন অক্ষত অবস্থায় চন্দ্রকোষের দেশে যেখানে 'ন' স্বর শুদ্ধ ও রুদ্ধ, গম্ভীররস পূর্ণ মালকোষ কখন চন্দ্রকোষ হয় তা সত্যিই দুর্বোধ্য। আমীর খসরু সাহেবের সেই সুর লহরি যাতে দির তুন তান কি কোন খোল যা সিসেম না শুধুই (টাং টুইস্টার) জড় জিহ্বা সাবলীল করার কৌশল জানা গেল না। দরবারী তারানায় কখনও আস্থায় কখনও অন্তরায় এখনও মনে বেজে চলে 'ইয়ারে মন বিয়া বিয়া।' যে ফারসি শব্দগুচ্ছ আমার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয় 'খোল খোল দ্বার' এই ছন্দে। আমি কান পেতে রই। আসুন সেই ভগীরথ যিনি আগামীর রন্ডে সময় উপযোগী করে মার্গ সঙ্গীত পরিবেশন ও তারানাকে আবিষ্কার করবেন।

এই সূত্রে একটি আবেদন জানিয়ে রাখি— উনি বারোটি হীরের ফিরোজা পাথরসহ হায়দরাবাদে নিজামের একটি আংটি ও A. KHAN লেখা আর একটি আংটি যা এ অধমের দেওয়া রেখে গেছেন পূরবী মুখোপাধ্যায়ের কাছে। যদি কোনও সংস্থা যাদুঘরে স্থান দিয়ে তা সুরক্ষিত করতে পারেন তাঁদের কাছে পূরবীদি ও আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ইঁদুরকাণ্ড

শঙ্খ ঘোষ

ধেড়ে ইঁদুরগুলি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ঘরের আনাচেকানাচে
অশান্তির শেষ নেই
ওদের ধরব বলে ফন্দি করছি কল পাতছি
কিন্তু ধরা পড়ছে না কেউ
ওঃ, সে এক কাণ্ড।
সবাই সবাইকে বলছি, কই, একটা কিছু করো
ভিতরে ভিতরে সবকিছু যে কুরে ফেলল।
আমরা হামাগুড়ি দিয়ে দেখছি, একটা কিছু করছি।
মাঝে মাঝে প্লাস্টিকের ঠোঙায়
ধরা পড়ছে একটা-দুটো ছানা
নাকের সামনে প্লাস্টিক দোলাতে দোলাতে খুশির তোড়ে ভাবছি
বাঃ, একটা কিছু তো হল!
এদিকে, ধেড়েগুলি দাপিয়েই বেড়াচ্ছে আনাচেকানাচে
ছানাপোনারাও জন্মেই যাচ্ছে, জন্মেই যাচ্ছে।

সাদা পাতায় সাদা পাতায়

পিনাকী ঠাকুর

অন্ধকার। ডিপ্রেসন। ঘুমের ওষুধ। এ-ই জীবন?
সারাটা রাত মালগাড়ির সান্টিংয়ের খটাৎ ঠং।
ডিপ্রেসন। চিঠির খাম। সাইরেন আর ঠাণ্ডা ছাদ।

আবারও এক অন্ধকার আবার এক পরের দিন।

মায়ের ওষুধ। ইলেকট্রিক। দোকানে ধার। রোদজ্বলা
দিনের শেষ। ডিপ্রেসন। অন্ধকার। জলের গ্লাস।

সাদা পাতায় রং মেরে ফোটানো সব কাব্য তাই
ব্যর্থ আজ। ডিপ্রেসন। মারো আব্বার। কাটাছেঁড়ায়
একটা দিন। আর একটা। লেখার মুখ দেখতে দাও।

এই ভাষার নতুন সব কবিকিশোর চাকরি পাক।

কুহক

রাহুল পুরকায়স্থ

একটি রুমাল ওড়ে, ঘ্রাণবাতাসের
পথে পথে ওড়ে তার বন্ধুগোপনতা
তুমিও কেঁপেছো আজ, এ কম্পনে
জন্ম নিল জনশ্রুতি, অক্ষরস্তব্ধতা

উধাও দিগন্ত আর বনের মর্মর
জেগে ওঠে উন্মাদনা সৈকতশহরে
নিশা অস্থি, ঢেউচিহ্ন, মিলনপ্রদাহ
বিলিয়ে দিয়েছে জ্যোতি অন্ধপ্রেমিকেরে

একটি রুমাল ওড়ে, ওড়ে ঘ্রাণ, মগ্নচেতনায়
একটি শরীর আজও নিরুপায়, আমাকে পোড়ায়

কুরুক্ষেত্রের পর

জয়া মিত্র

এই যে গড়ানো রক্ত চারদিক থেকে
ক্রমে ক্রমে উঠে বসে
নীরন্ধ্র জমাট রক্ত চেপে ধরে শ্বাসের বাতাস
আমারই কণ্ঠনালী পথে পথে ফুটে আছে
দাঁতে জিভে মৃত ধাতু স্বাদ
অথচ মুঠির থেকে ছুটে যায় প্রত্যক্ষ হনন
আকণ্ঠ তৃষ্ণায় বসুমতী
তোমার দু'চোখ খুঁজে অন্ধ ভিক্ষুনতজানু হই
আমার দহনে জল দাও
অঞ্জলি না থাকে যদি
অন্তত দুই ফোঁটা লোনা জল
রক্ত নয়, তৃষ্ণার তরল দাও
বসুমতী, ছিন্ন অঙ্গুলি তুলে ধরো
দগ্ধ ঠোঁটে স্নিগ্ধ জলধার স্বপ্ন
অন্ধ চোখে দৃষ্টি বুনে দাও
মৃত্যুকর্দম ভেঙে এসো
বসুমতী, জল দাও আমাকে

এসো, সুসময়

মৃণাল বণিক

বাইরে থমকে রোদ এই শেষবেলায় ভাঙা রাঙা।
উঠোনে ছায়াদের খুনসুটি হাওয়ার সঙ্গে খেলা
এই অবেলায় এমন বেলায়
কার্নিশে কার্নিশে উড়ন্ত ছেঁড়া ছেঁড়া আলো
জোর করে এই পাণ্ডুলিপি পাঠ
অক্ষরে অক্ষরে বাজে নগ্ন হাহাকার।

যে যাই বলুক কারো কথাই ধরিনে আর
বীজের আধারে দৃষ্টি রাখি দেখি জলধারা
বারান্দার সমস্ত টব তৃষ্ণা মিটিয়ে ফেলেছে
এরকম এক নিস্তব্ধ নীরব বিকেলে
থেকে যাই ঢেকে যাই অনন্তে অসীমে।

এই মেঘছেঁড়া মন্দ বাতাস লঘু প্রজাপতি
ছোট্ট বারান্দার এক কোণে
সবুজ পাতার বাহার। থাক, সব থেকে যাক।

ঘর

গোবিন্দ গোস্বামী

কুলগাছের ফাঁক দিয়ে
টুনটুনির উড়ে যাওয়ার মতো
ফুড়ুত করে পালিয়ে গেল সাতসকালের শুকতারা
চাঁদের কপালে মায়ের টিপ দেয়া কালো রঙ
কখন যেন ধুয়ে গেল বর্ষার পদ্মপাতায়
বঁইচি ফলের মালা গাঁথা হাত
ভুঁইচাঁপা খুঁজতে হারিয়ে যায় শিশির ভেজা ঘাসে
শুকনো দিঘির ধারে গজানো কলমিদামের পাশ কাটিয়ে
খাঁ খাঁ দুপুরের আমবাগানে
কাঠবেড়ালির পিঠের ছায়ায়
ছুটে বেড়ায় একটু ডাগর উষ্ণ আলো

সবটা মুড়ে গেলে নটে গাছের কান্না ভেসে আসে
ভেজা চোখের আয়ানায় মাঘমণ্ডলের ব্রত
আকাশদীপের আলো নেমে আসে নক্ষত্রের দরজা ভেঙে
রূপকথার আঁচল থেকে
স্বপ্ন চুঁইয়ে পড়া জ্যোৎস্নার ঝরনায় ভিজে
রাতের হাত ধরে ভাঁজ করে রাখা অগ্নিপাটের শাড়ি
সময়ের কুলুঙ্গিতে খুঁজে বেড়ানো দুঃখের পদাবলি
শূন্য করতলে বঁইচি, কুলের গন্ধ
টুনটুনি বার বার ফিরে আসে খড়কুটো নিয়ে

ফেরা

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

এসেছি তোমার কাছে, দুর্নিবার, এসেছি কাতর,
তোমার পায়ের কাছে, যেখানে চূড়ান্ত শুরু হয়,
যেখানে অবাক শান্তি, যেখানে প্রসন্ন ঘনঘোর
এসেছি সেখানে, ওগো রুদ্ধবাক, আমার বাঙ্ময়।

এসেছি শিকারখেলা শেষ হ'লে, এসেছি হরিণ,
কপালে মৃত্যুর চিহ্ন, আনন্দে-ডেটলে-রক্তে মাখা,
জঙ্গলে জঙ্গলে ছুটে যে হাওয়া সঙ্গিনী এতদিন
এনেছি তোমার জন্যে সে হাওয়ায় ওড়ানো পতাকা।

এসেছি তোমার কাছে, প্রাণবায়ু, এসেছি চরম,
নিঃশ্বাস রেখেছি পায়ে, হৃৎপিণ্ডে রেখেছি আদর
আমি আর তাকাব না। শূন্য হাতে ফিরে যাক যম
আমার নতুন জন্মে কোনও অধিকার নেই ওর।

অসুখের পর

শ্রীজাত

ঝকঝকে নীল আকাশ। মেঘ সাদা
আজ বোধহয় আরাম হবে চানে

সময় নিজে বিকলাঙ্গ, তবু
নানারকম হাতের কাজ জানে

শেষ বর্ষা, একটু শরৎব্যাপার
দৌড়চ্ছে হালকা লোভী হাওয়া

বুকের ভেতর দাগ কেটে যাচ্ছে
রিক্সা, অটোর আওয়াজ

ঘুমজীবিকা ভাঙছে। ঘরে ব'সে
আমারও কাজ অপেক্ষা যেহেতু,

জানলা দিয়ে দেখছি, কত দূরে
মিলিয়ে গেছে আজ
শয়তানের দীর্ঘতম সেতু...

প্রবন্ধ

একজন-বহুজন : লোকসংস্কৃতির সংলাপ

সৌমেন সেন

আমাদের একটা ধারণা আছে যে লোকসংস্কৃতি স্বতঃস্ফূর্ত, সর্বজনীন সামাজিককৃতি। তাতে কোনও পরিকল্পনা নেই, মননশীলতা নেই, ব্যক্তির কোনও ভূমিকা কিংবা হস্তক্ষেপ নেই। ধারণাটি খুব স্বচ্ছ নয়। লোক সংস্কৃতি বস্তুত পরিকল্পিত—বহুজন ও একজনের গোষ্ঠী-অন্তর্গত সংলাপ। সেই সংলাপটি বোঝা ও লোকসংস্কৃতিতে ব্যক্তির ভূমিকা নির্ণয় করার চেষ্টা থাকবে এই প্রবন্ধে।

কিন্তু তার আগে কিছু অভ্যস্ত ধারণার পুনর্বিচার বোধহয় জরুরি। তাই কিছু পুরনো কথা দিয়েই শুরু করি।

এক

খুব বেশি দিনের কথা নয়, ১৯৩১ সালে সমাজবিজ্ঞানের একটি বিশ্বকোষে লোকসংস্কৃতি বা ফোকলোর সম্পর্কে রুথ বেনেডিক্ট লেখেন যে আধুনিক 'সভ্য' বিশ্বে ফোকলোর আর জীবন্ত কোনও প্রলক্ষণ (trait) নয়। অর্থাৎ, লোকসংস্কৃতির সবটাই প্রাক-আধুনিক যুগের। ততদিনে লোকসংস্কৃতি চর্চার বয়স পেরিয়েছে একশো, গ্রিম ভাইদের বই-এর প্রকাশকাল ধরলে। আরও পেছলে প্রায় দেড়শো, যদি ১৭৭৯ সালে প্রকাশিত জার্মান লোকসঙ্গীতের একটি সঙ্কলনকে গ্রাহ্য করা যায়। এমনকী পশ্চিমে লোকসাহিত্য চর্চার সংঘবদ্ধ উদ্যম শুরু হয়ে যায় বেনেডিক্টের উক্তির একশো বছর আগে, যখন ১৮৩১ সালে ফিনল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় ফিনিশ লিটারেচার সোসাইটি। আর ১৯৩১ সালে ফোকলোর শব্দটি ও তার ধারণার বয়স পঁচাশি। এই দীর্ঘ সময়ে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে যে সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে তা হল এই যে এই সংস্কৃতি ঐতিহ্যাশ্রয়ী, মৃত কিংবা মৃতপ্রায় অথবা স্থবির (বেনেডিক্টের ভাষায় 'ডেড') একটি প্রক্রিয়া যার খোঁজ নিতে হবে সমাজের পশ্চাদপদ অংশে যেখানে তা এখনও টিকে আছে। কে যেন একে তাই 'লিভিং ফসিল'-ও বলেছিলেন। আসলে, গোটা উনিশ শতক জুড়েই, এমনকী বিশ শতকের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত, ইতিভিত্তি কিছু সংশয়ের কথা শোনা গেলেও, বেনেডিক্টের উক্তির প্রতিধ্বনিই শোনা গিয়েছে লোকসংস্কৃতি চর্চায়। তাঁর উক্তির প্রায় ছেচল্লিশ বছর আগে অ্যান্ড্রু ল্যাং যা খুব স্পষ্ট করে বলেছিলেন, প্রায় সে রকমই একটি ধারণা প্রচল ছিল দীর্ঘকাল। ল্যাং ফোকলোর-চর্চার তুলনা করেন আর্কিওলজির সঙ্গে। বলেন যে পুরাতাত্ত্বিকরা যেমন খোঁজেন কোদাল গাঁইতি তাঁর বল্লম ইত্যাদি, লোকসংস্কৃতিবিদরা তেমনই সংগ্রহ করেন লোককথা, বিশ্বাস ইত্যাদি যা আমাদের কালে বেঁচে থাকলেও আমাদের কালের নয়।

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে এই যে ধারণা এবং তার চর্চার যে নির্দেশিকা তখন তৈরি হয় এবং যা নিঃসংশয়ে অনুসরণ করা হয় দীর্ঘকাল, তার সূত্রে কয়েকটি সিদ্ধান্ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধান্তের আকার পায়। এক, লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্যাশ্রয়ী; অতীত জীবনচর্যার প্রত্নদর্শন; বর্তমানে যা আছে তা অতীতের উদ্বর্তন। দুই, এই সংস্কৃতির অন্য নাম মৌখিক-পরম্পরা। তিন, এর প্রকাশ ও বিকাশ স্বতঃস্ফূর্ত; যৌথ জীবন ও যাপনের অভিজ্ঞান ও অভিব্যক্তি।

এবং কোথায় পাব তারে? ল্যাং-এর বিচারে অনগ্রসর, অশিক্ষিত, নিম্নবর্গীয় গ্রামীণ কৃষককুলের জীবন ও যাপনে, যেখানে আবার আরও পশ্চাদপদ 'আদিম' মানুষজনের অভ্যাসগুলির প্রত্নদর্শন পাওয়া যাবে। ল্যাং একা নন, তাঁর আগে ও পরে, এবং সমকালীন অনেক লোকসংস্কৃতিবিদ ও কৌতূহলী ব্যক্তিবর্গের ধারণা ছিল একই রকম। ল্যাং যা বলেছিলেন, কিংবা ১৯৩১-এ রুথ বেনেডিক্ট যা বলেছেন, প্রায় তেমনটাই বলেন এখনও অনেকেই। এবং সবারই বক্তব্যে কয়েকটি শব্দ ফিরে ফিরে আসে। শব্দগুলি হল: অতীত, ঐতিহ্য, গ্রামীণ, কৃষিজীবী, স্বতঃস্ফূর্ত, সুসংবদ্ধ, সামাজিককৃতি, সর্বজনীন, মৌখিক, ধারাবাহিক, পরম্পরা, অমর্জিত, স্থূল, ইত্যাদি। শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের গোড়ায় ইউরোপে, সেখানে তখনকার লোকসংস্কৃতিবিদদের চিন্তায় ও প্রকল্পে। এবং যে কারণেই হোক, এই ধারণাগুলি বেশ শক্তপোক্ত জায়গা করে নেয় অন্য অঞ্চলেও এবং দীর্ঘকাল ধরে।

এই ধারাবাহিক শিক্ষাতেই, মাত্র বিশ বছর আগে, ১৯৮৫ সালে, একটি সংজ্ঞা প্রচারিত হয় বাংলায়: 'লোকসংস্কৃতি

লোকায়ত সংহত সমাজের *সমষ্টিগত* প্রয়াসের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার *সামগ্রিক কৃতি*; যা মূলত তথাকথিত আদিম সমাজের *অমার্জিত* সাংস্কৃতিক প্রয়াস ও অগ্রবর্তী সমাজের *সুমার্জিত বিদগ্ধ* সংস্কৃতি অপেক্ষা কমবেশী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র, শিক্ষাগত অতিপ্রযত্ন নিরপেক্ষ প্রধানত *ঐতিহ্যাশ্রয়ী*...।' (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৫:৫২। বঙ্কিম অক্ষর আমার।)[২] অন্য একটি প্রায় সমকালীন (১৯৭৪) রচনায় পাচ্ছি: '*লোকসংস্কৃতি স্থূল, সরল, অমার্জিত, গতানুগতিক ও বৈচিত্র্যহীন*। যথাযথা শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাব এর অন্যতম কারণ। লোকচর্চায় যত্ন ও শ্রম কম। লোকে সহজ প্রবৃত্তির বশে *উত্তরাধিকারসূত্রে* অথবা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে অনায়াসে যা পায় তাই গ্রহণ করে।... অর্থাৎ লোক-সংস্কৃতি প্রধানত ঐতিহ্যনির্ভর। পৈত্রিক সম্পত্তির মতো এগুলি *বিনা দ্বিধায়, বিনা বিচারে* গ্রহণ করে ও পালন করে। গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলন নেই বলে লোকভাবনার দ্বারা *নতুন উদ্ভাবন সম্ভব হয় না*। লোক-সংস্কৃতি স্থূল ও *জটিলতাহীন*।... লোক-সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য দেখা যায় না। লোক-সংস্কৃতি *মননশীল নয়*।... জনসাধারণের অক্ষরজ্ঞান নেই বলে তারা কোনও কিছু গ্রন্থবদ্ধ বা নথিবদ্ধ করে রাখে না।... লোকমুখে তা প্রচারিত হয়, লোকশ্রুতিতে গৃহীত ও লোকস্মৃতিতে রক্ষিত হয়।' (আহমদ, ১৯৭৪:১৩। বঙ্কিম অক্ষর আমার।)[১]

বলতে বাধা নেই, প্রায় সমসময়েই, বিশ শতকের সত্তর দশকের গোড়ায়, আমার লোক-সংস্কৃতি চর্চায় প্রবেশ অনেকটাই এইসব ধারণার শিক্ষায়। বিকল্প চিন্তা যা এতদিনে অনেকটাই সংগঠিত, তখন আমার যথেষ্ট জানা ছিল না। বলাই বাহুল্য, সেই চিন্তা তৈরি হয়েছে পশ্চিমে। আমার কাজে তেমনভাবে পৌঁছয়নি। কিন্তু কাজে নেমে অচিরেই সেই বিকল্প চিন্তার সন্ধানে আমাকে যেতে হয় কয়েকটি কারণে ও কয়েকটি প্রশ্নের সংঘর্ষে। পাঠকরা মার্জনা করবেন, সেই সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি এই প্রবন্ধের প্রয়োজনে। তবে এ কথাও তো ঠিক যে কোনও ধারণার গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতা যাচাই হয় অভিজ্ঞতার সূত্রেই। আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল একটি তথাকথিত আদিবাসী সমাজ আর চেষ্টা ছিল সেখানকার সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণ প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতির সম্পর্কটি বোঝার এবং সেই সম্পর্কের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি জানার। বলা যায় যে শুরুতেই কয়েকটি সংশয় ও সঙ্কট আমাকে তাড়া করে। ক্ষেত্র-অভিজ্ঞতার সূত্রে অন্যান্য প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রথমেই যে দুটি সংশয় জন্মায় তা হল: এক, আমি যে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি নিয়ে কাজ শুরু করলাম তা কি 'লোকসংস্কৃতি'? দুই, আমার নজর কতটা 'সংস্কৃতির' প্রতি, কতটা 'সমাজের' প্রতি? আমি যে সমাজে কাজ করছি সে সমাজের নাম দেওয়া হয়েছে 'ট্রাইব্যাল' বা 'আদিবাসী'। আমাদের অভ্যস্ত ধারণায় সেই সমাজের মানুষজন 'লোক' ('ফোক') নন, তাঁদের সংস্কৃতি 'লোকসংস্কৃতি' ('ফোকলোর') নয়, 'আদিবাসী সংস্কৃতি' বা 'ট্রাইব্যাল লোর'। এই স্বাতন্ত্র্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে সংস্কৃতির ত্রিস্তর ব্যাখ্যায় (আদিবাসী সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি) এবং লোক-সংস্কৃতির অভ্যস্ত সংজ্ঞায় (ঐতিহ্যাশ্রয়ী কৃষি ও কৃষকজীবন সম্পর্কিত গ্রামীণ নিরক্ষর মৌখিক সংস্কৃতি)। দ্বিতীয় সংশয় জন্মাল এই কারণে যে যেহেতু আমি সমাজনির্মাণ প্রক্রিয়া ও রাষ্ট্রনির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক বুঝতে চাইছি, আমার অনুসন্ধান কি সাংস্কৃতিক, না সামাজিক? দুটি প্রশ্নেরই সমাধান কিন্তু সত্বর পেয়ে যাই একটি বিকল্প সংজ্ঞা ও নির্দেশিকায়। বিকল্প সংজ্ঞাটির সূত্রে জানা গেল যে তথাকথিত আদিবাসী সম্প্রদায়ও লোকসংস্কৃতির 'লোক' এবং নির্দেশিকায় জানলাম যে লোকসংস্কৃতি যথার্থ বুঝতে হলে সাংস্কৃতিক উপাদান নয়, 'লোক' বা 'ফোক' হওয়া উচিত প্রাথমিক লক্ষ্য, কারণ সামাজিক প্রসঙ্গ, জাতিতত্ত্ব (এথনোলজি) ইত্যাদি না বুঝলে সংস্কৃতি বোঝার কাজটা অসম্পূর্ণ থাকে, যা ঘটে চলেছিল তখন পর্যন্ত কিছু উনিশ শতকীয় ধারণায় ভিত্তিতে।[৩] বলাই বাহুল্য, আমার ক্ষেত্র-অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত ধারণার বিপরীতে এই বিকল্প চিন্তাগুলিই গ্রহণীয় মনে হয়।

এবং আমার ক্রমিক ক্ষেত্র অভিজ্ঞতা আমাকে যে সব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাল আর বিকল্প চিন্তার সন্ধানে বাধ্য করল (পেয়েও গেলাম অনেকটাই) তাতে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক প্রচলিত ধারণাই (তার একটি ব্যক্তির অবস্থান সম্পর্কিত) পুনর্বিবেচনার তাগিদ জন্মাল। বলব না যে সেই সব ধারণার সবটাই সর্বাংশে ভুল কিন্তু বলব যে তার অনেকগুলিই যখন তৈরি হয়েছিল তখনকার অভিজ্ঞতায় সঠিক মনে হলেও, আজকের অনেক বেশি ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতায় ও বিচারে সর্বদা নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য নয়।

তালিকাটি এই রকম হতে পরে: এক, লোকসংস্কৃতি, এক সময় যেমন বলা হত, 'লিভিং ফসিল', তা ঠিক নয়; বরং বলা যেতে পারে, 'লিভিং ফেনোমেনন'। এ কথা মানা যায় না যে বর্তমানে বা আধুনিক বিশ্বে লোকসংস্কৃতি একটি মৃত প্রলক্ষণ (dead trait) যেমন বললেন রুথ বেনেডিক্ট কিংবা এই সংস্কৃতির সবটাই আজ প্রত্নদর্শন, যা আমাদের সময়ে থাকলেও এই সময়ের নয়, যেমন বলেছিলেন অ্যান্ড্রু ল্যাং। দুই, এইসব ধারণা থেকেই লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের প্রসঙ্গটিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়, বলা হয় যে তা 'প্রধানত ঐতিহ্যাশ্রয়ী' এবং 'গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলন নেই বলে লোকভাবনার দ্বারা নতুন উদ্ভাবন সম্ভব হয় না।'* এই প্রসঙ্গে সরাসরি দুটি কথা বলা যায়। প্রথমত, মানুষের জীবনযাপন, অভ্যাস-অভিব্যক্তি,

অর্থাৎ সংস্কৃতি, সব সময়েই, সব সমাজেই অনেকটাই 'ঐতিহ্যাশ্রয়ী'। লোকসংস্কৃতি ব্যতিক্রম নয়। ঐতিহ্যের চাপ এই সংস্কৃতিতে বেশি তা যেমন মানতে হয়, তেমনই একথাও বলা চলে না যে এর পরিবর্তন ও 'উদ্ভাবন' আদৌ ঘটে না। বলা যায় যে হামেশাই নতুন ঐতিহ্য তৈরি হয়, পুরনোকে অস্বীকার করে।[৪] একটি অতিপরিচিত উদাহরণ নেওয়া যাক। লালন ফকিরের জন্মসাল অনুমান করা হয় ১৭৭৪। আর মৃত্যু, অনুমান নয়, ১৮৯০। তাই বলা যায় যে উনিশ শতকেই লালন নামের এক ব্যক্তি প্রবর্তন করেন একটি ধর্মপন্থা, যে পন্থার জন্ম অনেক প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে। লালন প্রবর্তিত পন্থাকে বলা হয় 'লোকধর্ম' ও তাঁর গানকে 'লোকগীতি'। অর্থাৎ, অ্যান্ড্রু ল্যাং-দের সমসময়ে, উনিশ শতকের প্রথম ও মধ্যপর্বে, এই বাংলায় তৈরি হল এক নতুন 'ঐতিহ্য' যখন ইংল্যান্ডে ল্যাং লোকসংস্কৃতিকে তাঁর সমকালীন বলে মানতে চাইছেন না।[৫] আর সেই সব ধারণার অনুসরণে বিশ শতকের শেষ পর্ব পর্যন্ত আমরা বলছি যে লোকসংস্কৃতির সবটাই 'ঐতিহ্যাশ্রয়ী'। এই সংস্কৃতিতে 'নতুন উদ্ভাবন সম্ভব হয় না'। তা হলে কি লালনপন্থা ও লালনগীতি উনিশ শতকে 'লোকধর্ম' ও 'লোকগীতি' ছিল না? (এখন হলেও হতে পারে)। এই ধারণা কি ঠিক? লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে প্রতিনিয়ত নতুন 'ঐতিহ্য' তৈরি হচ্ছে, 'উদ্ভাবন' ঘটছে, এমনকী আমাদের এই সময়েও, তা কি অস্বীকার করা যাবে? তিন.ল্যাং আরও একটি কথা বলেছিলেন যে লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক তাঁরাই যাঁরা শিক্ষার স্পর্শ তেমন পাননি, সমাজপ্রগতিতে তাঁদের অংশ সামান্যই এবং যাঁরা এখনও আদিম সংস্কৃতি ও অভ্যাস অনেকটাই মেনে চলেন। ইউরোপের কথা জানি না কিন্তু ভারতবর্ষে ও এই বাংলায় এমনতর সংস্কার কি এখনও তথাকথিত উচ্চবর্গীয় শিক্ষিত সমাজকেও ছুঁয়ে যায় না? কামাখ্যায় অম্বুবাচির সময় ভিড় করেন কি শুধুই নিম্নবর্গীয় পশ্চাদপদ বিধবারা? আধুনিক এলিটরাও কি যান না গয়ায় পিন্ডি দিতে? এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্নও ওঠে । হিন্দু ও ইসলাম, ভারতবর্ষের এই দুটি প্রধান ধর্ম তো 'লোকধর্ম' নয় কিন্তু এই দুই ধর্মের বিশ্বাস, সংস্কার, আচার কি তথাকথিত 'লোক'-এরা পালন করেন না? এই দুই ধর্মের পুরাণ, কথা, প্রথা, ইত্যাদি কি সেই 'লোক'-এর কাছে অপরিচিত? তাঁদের বৃহদংশের সংস্কার-বিশ্বাস-আচার নিয়ন্ত্রিত হয়, বেশির ভাগই, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের পরিধিতে। চার.'লোক'-এর উনিশশতকীয় সংজ্ঞা তাই পাল্টাতে হয়, পাল্টানো হয়েছে। 'লোক' বলতে এখন একটি গোষ্ঠী বোঝায়— সে গোষ্ঠী হতে পারে একটি জাতি, হতে পারে কৃষিজীবী কিংবা,শ্রমজীবী বিভিন্ন শ্রমে, পেশাজীবী নানা পেশায়, থাকে নানা ধর্মীয় গোষ্ঠী- হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, কর্তাভজা,সাহেবধনী ইত্যাদি ইত্যাদি। 'লোক'-এর পরিচয় তাই মাত্র একটিই নয়, অনেক। সেই নানা 'লোক'-এর সংস্কৃতি তাই একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। হিন্দু 'লোক' যেমন আছেন, তেমনই আছেন হিন্দু 'ব্রাহ্মণ'; উভয়েই লক্ষ্মী, সত্যনারায়ণের সেবা করেন, উভয়েই যান তারকেশ্বরে। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আতরাফরাই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ আর তাদের বেশিরভাগই তথাকথিত 'লোক', অথচ তাঁদের ধর্ম 'লোকধর্ম' নয়, এমনকী আদতে 'স্বদেশি'ও নয়। কিন্তু সেই 'লোক'-এর বারো আনাই তো ইসলাম শাসিত যদিও সেই শাসনের আওতায় থেকেও একটি স্বতন্ত্র লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। পাঁচ. আঠারো শতক থেকে কলকাতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে একটি নতুন লোকসাংস্কৃতিক ধারাও তৈরি হতে থাকে। জেলেপাড়া, কাঁসারিপাড়ার সঙ, শোভাবাজার-বাগবাজারের খেমটা, কেশোধোপা গোপাল উড়ের যাত্রা, কবিওয়ালাদের কবিগান, দাশুরায়ের পাঁচালি ইত্যাদি যে অ-গ্রামীণ অথচ গণনির্ভর আবার উঠতি মধ্যশ্রেণির প্রসাদপুষ্ট সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল কলকাতায় সেই সময়ে, তাকে লোকসংস্কৃতি হিসাবে মান্যতা দিতেই হয়েছে। সবই কিন্তু সেই সময়ের উদ্ভাবন এবং অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিনির্ভর। এই মান্যতার সূত্রে আমরা খানিকটা নিজেদের অজান্তেই লোক ও লোকসংস্কৃতির অভ্যস্ত ধারণা থেকে সরে এসেছি। ছয়. অন্য আরও কিছু ধারণা, যেমন লোকসংস্কৃতি স্থূল, অমার্জিত, গতানুগতিক, বৈচিত্র্যহীন ইত্যাদিও কিন্তু তৈরি হয়েছে উনিশশতকেই, তখনকার নতুন 'শিক্ষিত' সাংস্কৃতিক রুচি ও নন্দনতত্ত্বের নিশানায়। তখনকার সাংস্কৃতিক রাজনীতির বাতাবরণে তাই ছিল স্বাভাবিক।[৬] 'ভদ্রজনে'রা 'ইতরজনে'র সংস্কৃতি সম্পর্কে এমন অবস্থানই নেন। আঠারো-উনিশশতকে বাংলায় তা ঘটেছিল বেশি মাত্রায় কারণ তখনই বিভেদটা অনেক বেশি তীব্র হয়ে ওঠে, একটি নতুন মধ্যশ্রেণির উন্মেষে। কিন্তু আমরা এখনকার লোকসংস্কৃতিবিদরা, সেই সব উক্তির প্রতিধ্বনি করব কেন? সাত. লোকসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আর একটি উক্তি যে তা মননশীল নয়। এইসব উক্তি আমার বিবেচনায় হাস্যকর, প্রায় ধৃষ্টতা। 'মহাভারতের কথা অমৃতসমান', গীতা, বাইবেল, কোরান, ভাগবৎ, চৈতন্যভাগবৎ, রামকৃষ্ণকথামৃত ইত্যাদি মননশীল আর দেহতত্ত্ব মননশীল নয়। এই তো আমাদের সিদ্ধান্ত। কারণ তা লোকধর্মের তত্ত্ব, আর সেই লোকধর্মের গান 'লোকগীতি'। লোকধর্ম 'অভিজাত' নয় আর আভিজাত্য না থাকলে তো মননশীল হয় না। কিন্তু আভিজাত্য ব্যাপারটা কী? প্রতিপত্তিই তো। আর ধর্মও অভিজাত হয় প্রতিপত্তির সূত্রেই। বলা হয় যে আমদের দেশে বেদ-ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্র অনুশাসিত যে অভিজাত ধর্ম তার সমান্তরালে কিংবা প্রতিবাদে নানা যুগেই নানা *লৌকিক ধর্ম* গড়ে উঠেছে; যেমন *বৌদ্ধ* ও *জৈন ধর্ম* কিন্তু পরে তা আবার অভিজাত ধর্মের আকার ও মান্যতা পেয়েছে' (সুধীর চক্রবর্তী, ১৯৯৫ বঙ্কিম অক্ষর আমার)।[৮] প্রশ্ন তোলা যায় যে লোকসংস্কৃতি মননশীল নয় এই তত্ত্ব মানলে এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম পর্বে 'লৌকিক' ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত হলে, সেই পর্বে তা মননশীল ছিল না? অর্থাৎ সম্রাটদের হস্তক্ষেপের আগে তা ছিল অনভিজাত স্থূল অমার্জিত মননহীন। এই যুক্তিশৃঙ্খলা মানলে আরও বলতে হয় যে স্বয়ং গৌতমবুদ্ধের মননশীলতার অভাব ছিল। কিন্তু ইতিহাস কি তা মানবে? আট, আর একটি সমস্যা হল যে লোকসংস্কৃতিকে শুধুই একটি মৌখিক পরম্পরা হিসাবে চিহ্নিত করা। পরম্পরার কথা যখন বলি তখন মানতেই হয় যে তার বহমানতা অনেকটাই নির্ভর করে স্মৃতি ও শ্রুতির ওপর। লোকসংস্কৃতির অনেকটাই মুখে মুখে ফেরে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সবটাই কি তাই? আজকের লোকসংস্কৃতিতে ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে যাতে দেখা যায় যে অনেক মৌখিক উপাদানেরই আদিরূপটা ছিল লিখিত। যেমন অনেক লিখিত উপাদানের সূত্র মৌখিক ঐতিহ্য। আর একটি সমস্যাও আছে। লোকসংস্কৃতি মৌখিক এই ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিরক্ষরতার প্রসঙ্গটি। অর্থাৎ, সাক্ষরতার সঙ্গেই ফুরিয়ে যায় লোকসংস্কৃতির সৃজনী। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। শোনা যায় লালনের একটি গানের খাতা ছিল, সেটি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে যান।[৯] এ বিষয়ে হয়ত বিতর্ক আছে। সে বিতর্কে এই মুহূর্তে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের কৌতূহল লালনের খাতা সম্পর্কে। সে খাতাটি লালন নিজেই লিখে থাকুন বা তাঁর শিষ্যদের কেউ, তেমন একটি খাতা যে ছিল সে তথ্যটি আমরা নানা সূত্রেই জানতে পারি। তা যদি হয় তা হলে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিরক্ষরতা ও মৌখিকতার সম্পর্কের যে ধারণা, তা তেমন ধোপে টেকে না। নয়. এই সাক্ষরতা ও ব্যক্তিরচিত কিংবা তাঁর সমকালীন অনুগামীদের দ্বারা লিখিত একটি ঐতিহ্যের সংবাদের সূত্রে একটি প্রশ্ন আমাদের ভাবায়। লোকসংস্কৃতি কি শুধুই 'লোকায়ত সংহত সমাজের *সমষ্টিগত* প্রয়াসের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার *সামগ্রিক কৃতি*'?[১০] লোকসংস্কৃতি যে সমাজবদ্ধ আর সামাজিক প্রসঙ্গ বিচার ছাড়া যে তার তাৎপর্য বোঝা যায় না, তাতে কোনও তর্ক নেই। কিন্তু প্রশ্নটা এই যে এই সংস্কৃতির নির্মাণ ও প্রসারে কি ব্যক্তির ভূমিকা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কিংবা নগণ্য? বোধহয় না। এই প্রবন্ধে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা। এবং সেই জন্যই লোকসংস্কৃতিচর্চার কয়েকটি অভ্যস্ত ও অস্বচ্ছ ধারণার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনবোধ করি।

দুই

প্রবাদের একটি ছোট্ট সংজ্ঞা আছে: 'উইট অব ওয়ান, উইজডম অব মেনি'— অনেকের অভিজ্ঞতা, একজনের অভিব্যক্তি। লোকসংস্কৃতির, সম্ভবত, এটিই সারতত্ত্ব। এই

সংস্কৃতির সৃষ্টি ও প্রসার যেহেতু গোষ্ঠীকেন্দ্রিক তাই গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান ও অভিজ্ঞতা স্থির করে দেয় তার অভিব্যক্তি ও অভিজ্ঞান। কিন্তু পঞ্চজন মিলে তার প্রকাশ সব সময় ঘটে না; একজন কেউ, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, থাকেন সেই পঞ্চজনের শীর্ষে। তিনি ভাষা দেন পাঁচজনের অভিজ্ঞতার। পৃথিবীর কোথাও কোনও প্রথা তৈরি হয়নি নেতৃত্ব ছাড়া, কোনও কথা কোনও গান রচিত হয়নি কোনও একজনের কল্পনা ছাড়া, কোনও শিল্প, কোনও প্রযুক্তি গড়ে ওঠেনি প্রশিক্ষণ ছাড়া। আর সব ধর্মের শৃঙ্খলাই তো নির্ভর করে একজন প্রবর্তক, একজন গুরু কিংবা একজন পুরোহিতের ওপর।

যে অভিধাগুলি লোকসংস্কৃতির পরিচয়ে ফিরে ফিরে আসে— মৌখিকতা, ঐতিহ্যনির্ভরতা, সামাজিকতা, গোষ্ঠী-কেন্দ্রিকতা ইত্যাদি— তার সঙ্গে ব্যক্তির ভূমিকা মেলানো যায় না ভেবেই হয়ত লোকসংস্কৃতি চর্চায় বিষয়টি তেমন মনোযোগ পায়নি। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেমন দেখা যায় বাংলার তথাকথিত লোকধর্মে, যে ঐতিহ্যের অস্বীকার ও বিরোধিতাই সেই সব ধর্মের প্রাণ আর সে প্রাণপ্রতিষ্ঠা পায় একজন ব্যক্তির মননের ব্যাপ্তিতে, তাঁর উপলব্ধিতে এবং তার প্রসার ঘটে তাঁরই উদ্যমে। লোকসংস্কৃতির অন্য অনেক উপাদানের ক্ষেত্রেও এমন প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়।

লোকসংস্কৃতির সব চেয়ে বড় যে আশ্রয়, সেই ধর্মকে নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। মানব ইতিহাসের এমন কোনও স্তর নেই যেখানে প্রাকৃত যাপন ও অতিপ্রাকৃতের সম্বন্ধ নির্ণয়ে একজন অতীন্দ্রিয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয়নি। মানুষের ধর্মবোধ ও পন্থা কিংবা আচাররীতির শুরুই তো এই সম্বন্ধে। এই সম্বন্ধ যিনি স্থাপন করেন তাঁকে সাইবেরিয়া অঞ্চলে বলা হত শামান। অনেকটা এ দেশের ওঝা বা গুনিনের মতো। এঁদের কাজ যেমন মানুষের রোগশোক সারানো, তুকতাক করে ভূত প্রেতকে সামলানো, তেমনই তাঁদের থাকে আচার নিয়ন্ত্রণের দায়, বলি-টলি দিয়ে, মন্ত্র উচ্চারণ করে অশুভশক্তির বিনাশ কিংবা প্রতিরোধ, মৃতের 'আত্মা'র সঙ্গে জীবিতের সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি। তা পুরোহিতরাও তো এই সব কাজ সবটা না হলেও, অনেকটাই করে থাকেন। ইংরাজিতে যাকে 'মেডিসিন ম্যান' বলা হয়, সে ভূমিকা হয়ত পুরোহিতের নয় আবার কমটাই বা কীসে? মানুষের জীবনচক্রের— জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুর, সব পরিধিই তো থাকে পুরোহিতের নিয়ন্ত্রণে। শামান অবশ্যই একাধারে 'মেডিসিন ম্যান' বা ওঝা বা গুনিন ও পুরোহিত। এবং তিনি সেই ব্যক্তি যাঁর অলৌকিক ক্ষমতা থাকে— তাঁর গোষ্ঠীর মানুষজন তেমনটাই বিশ্বাস করেন। এবং সেই ক্ষমতা ও পরিচিতি তাঁকে দেয় গোষ্ঠী নেতৃত্বের অধিকার। এই অধিকার তিনি কীভাবে পান? এক,

যখন তাঁর মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতার লক্ষণ দেখা যায়; দুই, এই ক্ষমতা, মনে করা হয় পুরুষানুক্রমিক— অর্থাৎ একজন শামানের পুত্র পৌত্রাদি বংশানুক্রমে শামানের মর্যাদা পান; এবং তিন, কখনও কোথাও গোষ্ঠী নির্বাচনের মাধ্যমে কাউকে সে দায়িত্ব ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যে ভাবেই শামানতন্ত্র চালু থাকুক না কেন দু'চারটি শক্তি ও জ্ঞান তাঁর থাকা চাই। এক, যাকে বলে অলৌকিক ক্ষমতা বা দূরদর্শিতা— দৈবাদেশ বা প্রত্যাদেশ পাওয়ার শক্তি, সমাধিস্থ হওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি। দুই, তাঁর জানা থাকা চাই শামানপন্থার রীতি-আচার, গোপন শব্দ-প্রতীক, ভূত-প্রেত-আত্মা, শুভ-অশুভ শক্তির পরিচয় ও হাল হকিকত, গোষ্ঠীভুক্ত গোত্র-ইতিহাস, এবং তিন, গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পুরাণ আচার ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকা চাই তাঁর আয়ত্তে। অর্থাৎ গোষ্ঠীর সংস্কৃতির তিনি কাণ্ডারী। গোষ্ঠীর বহুজনের জীবনযাপন অনেকটাই থাকে তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় যদিও তিনি ওই বহুজনের একজন।

একজন পুরোহিতের ভূমিকা তুলনায় সীমিত হলেও যখন লৌকিক-অলৌকিক, প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃত, মানুষ-ঈশ্বর ইত্যাদি সম্পর্কের কথা ওঠে তখন বোধহয় শামান ও পুরোহিতের অবস্থান অনেকটাই কাছাকাছি। পুরোহিতের অবস্থান অবশ্য কিছুটা প্রথাসিদ্ধ— শামানের মতো অলৌকিক শক্তির অধিকারী তিনি নন। বিধিবদ্ধ আচার পালনে তিনি সহায়মাত্র— বলা যায় ঈশ্বর, আত্মা, অতিপ্রাকৃত শক্তি ইত্যাদির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনে তিনি মধ্যস্থ। আবার ইতিহাসের কোনও কোনও স্তরে কিন্তু দেখা যায় যে সমাজে তাঁর ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ— বহুজনের ভালমন্দের দায়িক থাকেন তিনি। নিরক্ষর সমাজে ধার্মিক-সামাজিক প্রথা, আচাররীতির তত্ত্বাবধায়ক তিনি; ধর্মীয় আচার সংগঠিত হয় তাঁর পরিচালনা ও নেতৃত্বে; মৌখিক ঐতিহ্যের কাণ্ডারী তিনি, পুরাণকথা তিনিই শোনান; আর প্রথার নির্দেশ ঘটে তাঁর অনুশাসনে। কখনও তিনিই সমাজপ্রধান এবং এই মর্তে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই ভূমিকা, অধিকার ও প্রতিপত্তির হেরফের অবশ্য ঘটে অঞ্চলভেদে। কিন্তু সারসত্য এই যে মানুষ যখন থেকে সমাজবদ্ধ হতে শিখেছে তখন থেকেই পুরোহিতরূপে (যে নামেই ডাকি না কেন) একজন ব্যক্তি সংস্কৃতির কাণ্ডারী, তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক। উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের একটি পুরাণকথা (অধিবাসীদের বিশ্বাসে কিংবদন্তি) শোনাই; 'একসময় স্বর্গে ঈশ্বরের আশ্রয়ে বাস করতেন ষোলোটি পরিবার। তার মধ্যে সাতটি পরিবারকে কোনও এক সময় ঈশ্বর পাঠান মর্তে। সেই পরিবারগুলির প্রধানের নাম উ লাক্রিয়া। মর্তে পৌঁছে পরিবারগুলি যখন নানা অসুবিধের মধ্যে পড়লেন তখন তাঁরা তাঁদের সমস্যা সমাধানের আর্জিতে ঈশ্বরের দ্বারস্থ হলেন। ঈশ্বর এলেন মর্তে, উলাক্রিয়াকে ডেকে পাঠালেন একটি গোপন জায়গায়। জানালেন তাঁর অভিপ্রায়, নির্দেশ ও তিনটি অনুশাসন। পরিবারগুলির কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছল উ লাক্রিয়ার মাধ্যমে আর তিনি জানালেন যে উ লাক্রিয়াই তাঁর অনুশাসন প্রচার করবেন, নেতৃত্ব দেবেন ও সাতটি পরিবারের লোকজনের ভালমন্দের দায়িক থাকবেন।' উল্লেখ্য ওই তিনটি অনুশাসনই খাসি-জয়ন্তিয়া সমাজ-প্রথা ও ধর্মের মূল স্তম্ভ।

এই পুরাণকথাটি আবৃত্তি করা হয় প্রতি বছর একটি আচার উৎসবে। আবৃত্তি করেন একজন কথক। আবৃত্তির আগে তাঁকে মন্ত্রপূত করেন অঞ্চল প্রধান এবং আচারটি পালিত হয় পুরোহিতের বাড়ির আঙিনায়। কালক্রমে হয়ত প্রধান ও পুরোহিতের ভূমিকা আলাদা হয়েছে কিন্তু পুরাণকথা অনুসারে মনে হয় যে উ লাক্রিয়ার ছিল দ্বৈত ভূমিকা। তিনি ছিলেন একাধারে সমাজনেতা ও ধর্মগুরু। কিংবা শাসনপ্রধান ও পুরোহিত।

যে কোনও জনজাতি গোষ্ঠীর সংহতি অটুট রাখার ব্যবস্থা থাকে প্রথা ও আচারের বাঁধনে। সে বাঁধনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে যে প্রধান ও পুরোহিতের নেতৃত্ব স্বীকৃত তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আর এইসব আচার ও প্রথার বেশিরভাগই যে নির্দিষ্ট থাকে পুরাণবৃত্তে তাও আমাদের জানা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরোহিতকুল সেই পুরাণবৃত্তের কাণ্ডারী। আচারব্যবস্থার শর্তগুলিও পূরণ হয় তার পালনে পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে। তাই অনেক সময়ই পুরোহিত ও প্রধানকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়। আবার গোষ্ঠীর বহুজনের কাছে তিনি তো তাঁদেরই একজন, আপনজন। এই যে সম্পর্ক, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, তাই-ই স্থির করে দেয় গোষ্ঠীর অভিজ্ঞান, পুরাণ নির্ভর। সাত পরিবারের পুরাণের সূত্রে সবাই, পুরোহিত প্রধান ও অন্যরা, আত্মীয় এবং তাঁদের আশ্রয় একটি অন্তরঙ্গ বিশ্ববীক্ষা ও বিশ্বাসভূমির সামাজিক-ধার্মিক ব্যবস্থা। পুরোহিত অনেক সময়ই সেই ব্যবস্থার কাণ্ডারী। এবং লোকসংস্কৃতিও একটি ব্যবস্থা। তারও কাণ্ডারী, অনেক সময়ই, একজন পুরোহিত।

কেউ হয়ত বলবেন যে আমি যে সমাজ ও সংস্কৃতির কথা জানালাম, কিংবা শামান ও পুরোহিতের ভূমিকার কথা বললাম, তা তো 'আদিবাসী' সমাজ ও সংস্কৃতির কথা। তা আমাদের অভ্যস্ত সংজ্ঞা ও সংস্কারে লোকসংস্কৃতি নয়। আদিবাসী সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি যে আলাদা তা তো অমরা মেনে নিয়েছি সংস্কৃতির ত্রি-স্তর ব্যাখ্যায়। সে ব্যাখ্যার বিতর্কে এখন যাব না; শুধু বলে নিই যে এই ব্যাখ্যা কৃত্রিম (ও এক ধরনের সাংস্কৃতিক রাজনীতি) আর 'লোক' ও 'লোকসংস্কৃতি'র সংজ্ঞা পালটে গেছে, যে সংজ্ঞা জানায় যে তথাকথিত আদিবাসী গোষ্ঠীও 'লোক'।[১১]

এই বিভাজন যদি কেউ মানেনও, যদি বলেন যে আদিবাসী সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি আলাদা, তিনিও কিন্তু পুঞ্জীকৃত তথ্যের ভিত্তিতে, অস্বীকার করতে পারবেন না যে, কোনও স্বীকৃত ও চিহ্নিত লোকসাংস্কৃতিক উপাদানেও ব্যক্তির তত্ত্বাবধান ও হস্তক্ষেপ ঘটে। উদাহরণ অনেক। আমি দুটি পরিচিত উপাদান, বাংলার একটি চিহ্নিত 'লোকনাট্য' ও বাংলার 'লোকধর্ম' বেছে নিলাম। এবং আমার যুক্তির সমর্থনে কয়েকটি বিবরণ তুলে নিচ্ছি। (বলতে হয় যে এই বিবরণগুলি আমার ক্ষেত্র-অভিজ্ঞতা নয়। কয়েকজন স্বনামখ্যাত বিশেষজ্ঞ গবেষকের অভিজ্ঞতা। তাঁরা যদি ভুল করে থাকেন, তবে তর্ক উঠুক। তাতে লোকসংস্কৃতি চর্চার উপকার।)

'বরেন্দ্রভূমির নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণের (কোঁচ, প'লে) সাধারণ নাম "বাঙ্গাল"। বাঙ্গালগণ চৈত্রমাসের শেষে শিবপূজা করিয়া থাকে।... গম্ভীরা-উৎসবের সময় বাঙ্গালেরা আন্তরিক ভক্তি ও পবিত্রতা পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহাদের পূজক ব্রাহ্মণ নাই। তাহারা নিজেরাই পূজাদি সম্পাদন করিয়া থাকে।... *প্রধান সন্ন্যাসী* বা *গুণী পূজা করে*। ...'নৃত্যগীতাদি উৎসবসহ "জাগরণ" এবং মুখার নৃত্য হয়। তাহাদের উপর বহু গ্রাম্য ও গ্রামান্তরের ভূত ভর করিয়া থাকে। বাঙ্গালেরা ভূত বিশ্বাস করে এবং প্রতি গৃহে ভূতের পূজা দেয়। তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গবাস বড় পছন্দ করে না, তাহারা বলে, "কেষ্ট বিষ্ট হয়ে কি করমু, মশনা মুশনী হমু যে ঘরে রহমু।"... এই বিশ্বাসে তাহারা গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিন্দুরলিপ্ত বেদী প্রস্তুত করিয়া থাকে।... গম্ভীরা-পূজার সময়ে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে উক্ত প্রকার বহু ভূতের পূজা হইয়া থাকে।...'গম্ভীরা-পূজায় শিবপূজাপেক্ষা ভূতের পূজারই ঘটা দৃষ্ট হয়।... *সন্ন্যাসী* বা ভক্তের উপর যখন ভর নামে অর্থাৎ যখন *ভূতাবেশ* হয়, তৎকালে তাহাদের মস্তকসঞ্চালন, হস্তপদাদির বিক্ষেপ ও *আকুঞ্চন*, মুখভঙ্গি, নৃত্য ও উৎকট চিৎকার প্রভৃতি অতি অদ্ভুত ব্যাপার। *প্রধান সন্ন্যাসী* এই প্রকার আবেশ দর্শনে কোনও ভূত বা মশান চামুণ্ডা কালীর আবির্ভাব বুঝিতে পারিয়া সেই সেই দেবের উদ্দেশ্যে, সেই সেই দেবের প্রীতির জন্য *শান্তিপাঠ শোনায়* এবং *পুষ্প ও গঙ্গাজল প্রদান করে*। তৎপর প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে নৃত্য করান হয়।... *ভূতাবিষ্টের বা মূল-সন্ন্যাসীর* নিকট অনেকে ব্যাধির ঔষধ পায়, স্ত্রীগণ পতিবশের ঔষধ গ্রহণ করে। "জাগরণ" দিবস সমুদায় রাত্রি ওই প্রকার নৃত্য এবং "মুখার" নৃত্য হইয়া থাকে। গীতবাদ্য এবং শিবের বন্দনাও চলিতে থাকে।' (হরিদাস পালিত, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। বঙ্কিম অক্ষর আমার)।[১২]

এই যে গম্ভীরা যাকে তথাকথিত আদিবাসী পূজাচারই বলতে হয়, তাতে *শামানতন্ত্রের* নিশানাও পাওয়া যাচ্ছে। এই পূজাচারে 'প্রধান সন্ন্যাসী বা গুণী পূজা করে', ভূতপূজা হয়, সন্ন্যাসীর 'ভূতাবেশ হয়', তিনি 'শান্তিপাঠ' শোনান, প্রত্যেককে 'নৃত্য করান', 'ব্যাধির ঔষধ', 'পতিবশের ঔষধ' দেন।

কালান্তরে নেতৃত্বে প্রবেশ করেন একজন মণ্ডল:

'প্রত্যেক গ্রামে একাধিক "মণ্ডল" থাকে। মণ্ডল গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি। পূর্বে গ্রামের সমুদায় কার্য্যাদি মণ্ডলের আদেশে সম্পাদিত হইত। ...প্রত্যেক মণ্ডলের অধীনে একটি গম্ভীরা থাকে। মণ্ডল ব্যতীত *কোনও গম্ভীরাই দৃষ্ট হয় না*। প্রত্যেক গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল থাকে। মালদহে যত গম্ভীরা বর্তমান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এক এক জাতির এক এক গম্ভীরা থাকিলেও সকল জাতির যে একটি আদি গম্ভীরা আছে তাহাকে "ছত্রিশী গম্ভীরা" বলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল বর্তমান থাকিলেও ছত্রিশী গম্ভীরার মণ্ডলপদ উক্ত মণ্ডলগণের মধ্যে *একজনের* থাকে।' (হরিদাস পালিত, তদেব, পৃঃ ৯। বঙ্কিম অক্ষর আমার)।

গম্ভীরা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার লক্ষ্য নয়। এ বিষয়ে অনেক লেখালেখিও হয়েছে। সেই সব লেখা থেকে আর একটি সংবাদ জেনে নিতে চাই আমার এই লেখার স্বার্থে। জানা যাচ্ছে যে যে বরিন্দ এলাকা (মালদহ জেলার পুরাতন মালদহ, গাজোল, বামনগোলা ও হবিবপুর থানা এলাকা 'বরিন্দ' বা 'বরিন' এলাকা নামে পরিচিত। এই এলাকায় রাজবংশী, দেশি, পলি, বাবুপলি, সাধুপলি প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর বসবাস।[১৩]) গম্ভীরার উৎসভূমি। পরবর্তীকালে এই এলাকায় 'বিভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন জাতিধর্মের মানুষের সমাবেশ ঘটেছে। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে, একসঙ্গে বসবাসের ফলে সামাজিক সাংস্কৃতিক মিলন মিশ্রণ ঘটেছে। দেশবিভাগের পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে এসে এ জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সংস্কৃতিক আদান-প্রদান গ্রহণ-বর্জন হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য-কুণ্ডু তিলিসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এমনকি *মুসলমান সম্প্রদায়ও* গম্ভীরাগানের অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সুফি মাস্টার (মহম্মদ সুফি), মেরাজুদ্দীন, শমীর খলিফা, আবদুন মজিদ, সোলেমান ডাক্তার প্রমুখ গম্ভীরা শিল্পীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।'[১৪]

উপরের বিবরণ থেকে দুটি শব্দ আমি বেছে নিই— গান ও শিল্পী। অর্থাৎ গম্ভীরার আদিরূপ, পূজাচার থেকে আমরা অনেক দূর সরে এসেছি। ভূতপূজা, ভূতাবেশ, সন্ন্যাসী, মণ্ডল, শিবপূজা, ইত্যাদি অনেক দিনের অতীত। গম্ভীরা এখন গান; সেই গান পরিবেশন করেন একজন বা একদল শিল্পী। মুসলমান শিল্পীও। এই পরিবর্তন লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের পূর্ব-প্রচল কিছু ধারণাকে ধ্বস্ত করে। প্রথমেই বলা যায় যে সময়

ও পরিবর্তনের চাপে 'লোক', অর্থাৎ গম্ভীরার 'লোক' পালটে গেছে। পূজাচার থেকে যখন 'গানে' পৌঁছে যাওয়া গেল, যখন পালাগানের 'শিল্পী'র দেখা পাওয়া যাচ্ছে, সুফি মাস্টার, মটরবাবু বা দোকড়ি চৌধুরিকে চেনা যায়, তখন বলা যাচ্ছে না যে গম্ভীরা এমন কোনও 'অকৃত্রিম ঐতিহ্য' যার কোনও ছেদ ঘটেনি, কোনও মাত্রাভেদ ঘটেনি। বরং বলা যায় যে নতুন এক 'ঐতিহ্য' তৈরি হল পুরনো ঐতিহ্যের আশ্রয়েই। বলা যাবে না যে লোকসংস্কৃতি শুধুই মৌখিক ও অনামি কিংবা 'লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি' আর এই সংস্কৃতিতে 'গভীর অনুধ্যান ও অনুশীলন নেই বলে লোকভাবনার দ্বারা নতুন উদ্ভাবন সম্ভব হয় না' এবং তা 'মননশীল নয়।' যদি বলা যায় তা হলে গম্ভীরা একটি লোকনাট্য, লোকসংস্কৃতির একটি উপাদান, এই দাবি প্রত্যাহার করে নিতে হয়।

লোকনাট্য গম্ভীরাগান 'নগর ভিত্তিক গান', সে গানে একজন রচয়িতা ও শিল্পীর ভূমিকা, গম্ভীরার দল তৈরি ইত্যাদি প্রসঙ্গে একজন খ্যাতনামা 'গম্ভীরা শিল্পী' দোকড়ি চৌধুরির একটি সাক্ষাৎকার থেকে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করা যাক:

'...১৯৪৮ সালে আমি এখানে মালদায় চলে এলাম।... আমাদের চাঁপাই-নবাবগঞ্জে সেখানে মালদা জেলায় যেমন গম্ভীরা উৎসবটা হয় এই জিনিস ওখানে ছিল না।... তো মটরবাবু একবার ওইখানে গান করতে গিয়েছিলেন।... সেই গানটা দেখে আমার খুব ভাল লাগল। ...আমার বাবা এখানে চলে আসার পর আমরা যেখানে এলাম আমাদের পাশেই মকদমপুর একটি পাড়ার নাম... সেখানে পাশেই হরিবোলা নামে একজন লোক ছিল।... তো সেই দুর্ধর্ষ তখকার দিনে গম্ভীরাগানের শিল্পী ছিলেন এবং ওর যে রচয়িতা ধরণীধর সাহা সে ওর, ওখানেই বাড়ি। এদের আমি সান্নিধ্য পেয়ে গেলাম এবং আমি *দল করে ছাত্রটাত্রদের নিয়ে... গানের দল* তৈরি করলাম। ...তাতে দেখা গেল যে, আগেরকার দিনের যে শিল্পীরা এবং গম্ভীরা রচয়িতারা খুব একটা *শিক্ষিত ছিল না*। যার জন্য ওদের গান এবং ভাষা ইত্যাদি এসবগুলো হতে লাগল এবং এপার-ওপার হয়ে যাওয়ার পর পার্টিশন হওয়ার পর বিভিন্ন বাইরের লোক এসে মালদার এইসব ভাষাগুলি আঞ্চলিক ভাষা অনেকের খারাপ লাগত শুনতে। আমি এটাকে একটু *শুদ্ধভাষায়* মানে জেলারই লোক আমরা। কিন্তু ও ভাষাগুলো আমাদের অসত না। ...আমরা তো, হ্যাঁ *আঞ্চলিক ভাষা* ব্যবহার করতাম কিন্তু কিছুটা এটাকে *পাল্টে* নিয়ে, কিছুটা শুদ্ধ করে নিয়ে।'

'...এটা কিন্তু নগরভিত্তিক গান। গ্রাম না।... প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যে ছিল না।... বহু দল ছিল এই মালদা শহরে... ওই মটরা ছিল, মটরার গান যদিও আমি *লিখতাম*... সুফি মাস্টারের বাড়ি *মালদা টাউনেই*... বিশ্বনাথ পণ্ডিতের বাড়ি... মটরবাবুর বাড়ি *মালদা টাউনেই*... এই জন্যই বলছি এটাকে নগরভিত্তিক গান বলা যায়।... (গম্ভীরা) গ্রামীণ লোকনাটক তো বটেই। এ ছাড়া তো এটা গ্রাম থেকেই এসেছে। কিন্তু সেই গম্ভীরাটা হল শিবের গাজন। শিবের গান বুঝলা?... আমাদের পালামাফিক গান সেটাও কিন্তু মুকুন্দ দাসের যাত্রা থেকেই এসেছে *তার আগে পালা ছিল না গম্ভীরার*।...'

'গম্ভীরার সূত্রটা যদি ধরা যায় তাহলে ধরুন দু-আড়াইশো বছর এবং তার আগে গম্ভীরাটাকে যে ভাবে করা হত তখনও হয়েছে তবে মূলত শৈবপূজা ওরা বলত, শিবের পূজা আগে হত তারপরে সূর্যপূজা এই সূর্য পূজার সময় ওরা সূর্যের গান গাইত, শিবের গান গাইত... ছুট ছুট গান ছিল। আর *পালামাফিক* যেটা সেটা ১৯৩০-৩২ সাল থেকে... *নাটকের আকার* নিয়েছে।

'পরিবর্তনটা এইটুকুই হয়েছে আগে যেমন শিবের থানে একটা শিবের মূর্তি থাকত। মানুষ শিবের কাছে বলছে আমরা খেতে পাচ্ছি না, খরা হচ্ছে কি বন্যা হচ্ছে, তুমি এর বিহিত ব্যবস্থা কর। ঠাকুরের কাছে মানত করা যাকে বলে.....এই যে কিছু কিছু লোক যেমন ধরণী ডাক্তার তারপর সুফি মাষ্টার তারপরে ওই দাস গোপাল *পালামাফিক গান লিখতে* লাগল।... প্রথমে শিবের বন্দনা হয়ে গেল, তারপর চারিয়ারি....তারপর ডুয়েট গান একটা....এটাও একটা নাটকীয় ঘটনা, এর মধ্যে সংলাপ আছে।...গম্ভীরার ক্ষেত্রে... পাঁচটা প্লট থাকে। একটা বন্দনা, একটা চারইয়ারি, একটা ডুয়েট, একটা টপ্টিং, একটা রিপোর্ট... ।'[১৫]

লোকসংস্কৃতির একটি উপাদানে আমরা দেখলাম, এই সাক্ষাৎকার ও অন্য বিবরণে, সময়ের ধাপে কত রূপ, রূপান্তর। এতে কি লোকসংস্কৃতির অনেক অভ্যস্ত ধারণারই পুনর্বিচারের প্রয়োজন ঘটে না? উপাদানটিই যেমন গম্ভীরা, আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে এক সময় যে অভিধাগুলি তৈরি হয়েছিল, সীমিত অভিজ্ঞতায়, কালান্তরে, অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিতে, তা আর যথেষ্ট যথার্থ থাকছে না। স্মরণ করিয়ে দেয় যে 'ঐতিহ্য' বার বার পালটায়, যেমন পালটায় উপাদানটির রূপ ও তাৎপর্য; নতুন যে ঐতিহ্য তৈরি হয় তা মৌখিক ও অনামি নাও হতে পারে; তা শুধুই 'সামাজিক কৃতি' নয়, তার নির্মাণ ও প্রসারে ব্যক্তিরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। গম্ভীরার ক্ষেত্রে দেখছি কখনও সন্ন্যাসী বা গুণী, কখনও মন্ডল পূজাচার ও উৎসবের কর্তৃত্বে, আর যখন তা লোকনাট্য তখন দলপতি পালাকার ও গায়ক।

লোকধর্মের ক্ষেত্রে একজন ও বহুজনের এই সম্পর্ক আরও স্পষ্ট। তথাকথিত আদিবাসী ধর্মগুলির শামান, গুনিন, ওঝা,

সন্ন্যাসী ও পুরহিতের অবস্থান আমরা জেনে নিয়েছি। বাংলায় আমরা যে সব ধর্মকে 'লোকধর্ম' বলে মান্যতা দিই, সেই ধর্মগুলির প্রবর্তয়িতা অবশ্যই একজন ব্যক্তি। একজন সাঁই কিংবা গুরু। এই সব লোকধর্মে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা 'মানেন গুরু কিংবা মুর্শেদকে। কেননা গুরু ও মুর্শেদ পথদ্রষ্টা ও সঠিক পথের পরিচালক।'[১৬] তিনি ঈশ্বরের চেয়েও বড়।[১৭] গুরুপাট তাই আশ্রয়। এই ধর্মগুলির ভিত্তি এক ধরনের গুপ্ত সাধনা। সে সাধনার দীক্ষা দেন, পন্থা নির্দেশ করেন গুরু ও মুর্শেদ। সহজিয়া, কর্তাভজা, বাউল, ফকিরিমত, সাহেবধনী, বলরাম, খুশিবিশ্বাসী, লালনপন্থা ইত্যাদি সব ধর্মমত ও আচার বিধি গড়ে উঠেছে একজন প্রবর্তক, একজন বা কয়েকজন 'গুরু'কে কেন্দ্র করে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের 'কর্তাবাবার বংশলতিকা' ও তো পাওয়া যায়।[১৮]

কর্তাভজা ও সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক, প্রচারক ও সংগঠক-নির্ভরতার একটি বিবরণ বস্তুত অন্য আরও অনেক লোকধর্মের ক্ষেত্রেও সত্য: 'কর্তাভজাদের সঙ্গে সাহেবধনীদের মিল বিস্ময়কর। উভয় ধর্মই বেদবিরোধী ও কায়াসাধনায় বিশ্বাসী। উভয় ধর্মের সূচনাতে একজন করে মুসলমান উদাসীন ব্যক্তির (আউলচাঁদ ও সাহেবধনী) প্রবর্তন রয়েছে। কর্তাভজাদের প্রধান প্রচারক ও সংগঠক রামশরণ পাল ও তাঁর পুত্র রামদুলাল। সাহেবধনীদের প্রধান প্রচারক ও সংগঠব দুঃখীরাম (নামান্তরে মুলীরাম) পাল ও তাঁর পুত্র চরণ পাল। রামশরণ সদগোপ, দুঃখীরাম গোপজাতীয়। উভয় সম্প্রদায়েই বংশানুক্রমিক গুরুবাদ প্রচলিত। কর্তাভজাদের গুরুপাট ঘোষপাড়ায়, সাহেবধনীদের বৃত্তি হুদায়। উভয়স্থলেই সাম্বৎসরিক মেলা হয় ও "আসন" আছে।....এ ছাড়া উভয় সম্প্রদায়ের সাধনার অন্যতম উপাদান সংগীত। কর্তাভজারা গায় লালশশীর গান, সাহেবধনীরা কুবির গোঁসাইয়ের গান।'[১৯]

লোকসংস্কৃতির নির্মাণ ও প্রসারে একজন ব্যক্তি কখনও থাকেন নেপথ্যে, কখনও আসেন প্রকাশ্যে। এই সব অভিজ্ঞতায় তাই বলা সম্ভব যে লোকসংস্কৃতি একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত সংলাপ-বহুজন ও একজনের অভিজ্ঞতা, অনুভব, উপলব্ধির অন্তরঙ্গ বিনিময় এবং তার প্রসার নানা মাত্রায় ও প্রত্যয়ে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. তুষার চট্টোপাধ্যায়, লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান, কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৫

২. ওয়াকিল আহমেদ, বাংলার লোকসংস্কৃতি, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪

৩. এইসব প্রসঙ্গের কিছু আলোচনা আছে আমার সাম্প্রতিক কয়েকটি প্রবন্ধে। দ্র. 'লোক-এর বিভাজন' লোকশ্রুতি ২০. আষাঢ় ১৪০৯; 'লোকসংস্কৃতির স্থান-কাল-পাত্র: পরিবেশ-প্রসঙ্গ বিচার', লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ১৪ বর্ষ, সংখ্যা ৪, ১৪০৯; 'মধ্যবিত্ত লোকসংস্কৃতি', চতুরঙ্গ, বর্ষ ৬২, সংখ্যা ১, ১৪০৯।

৪. ওয়াকিল আহমেদ, তদেব, পৃ.১৩

৫. লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে দ্র. আমার একটি রচনাঃ 'ঐতিহ্যের পরম্পরা ও লোকসংস্কৃতির পরিসর', লোকশ্রুতি, জুন ২০০৪।

৬. Andrew Lang তাঁর Custom and Myth গ্রন্থের (১৮৮৪) 'The Method of Folklore' প্রবন্ধে বললেন, 'There is a science, Archaeology, which collects and compares the material relics of old races, the axes and arrow-heads. There is a form of study, folklore, which collects and compares the similar but immaterial relics of old races, the surviving superstitions and stories, *the ideas which are in our time but not of it*. Properly speaking folklore is only concerned with the legends, customs, beliefs, of the folk, of the people, of the classes *which have least been altered by education*, which have *shared least in progress*. But the student of folklore soon finds that these unprogressive classes retain many of the beliefs and ways of the savages...The student of folklore is thus led to examine the usages, myths, and ideas of savages which are still retained, in rude enough shape, by the European peasantry' (1884: II. emphasis added.)

৭. গ্রামাঞ্চলে বাউল ফকিরদের দেশছাড়া করার ফতোয়া যেমন জারি হয় 'এরা পাপী, লজ্জাকর জীবনযাপন করে। মানুষের সমাজে এদের জায়গা দেওয়া উচিত নয়' [যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য]; এই প্রবঞ্চক প্রতারক দলকে মোছলমান ও হিন্দু দুই সমাজ হইতে শৃগালের ন্যায় বিতারিত করা উচিত।' [রেয়াজউদ্দিন আহমদ]- দ্র. সুধীর চক্রবর্তী, লালন। কলকাতা: ৫৪-৫৫) কলকাতায় তেমনই 'ইতর সংস্কৃতির' মোকাবিলায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'সোসাইটি ফর দ্য সাপ্রেশন অব পাবলিক অবসিনিটি' (দ্র. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাঈনাচ বনাম খেমটা', বারোমাস, শারদীয় ১৯৮৬: ২৮)। আবার যে রবীন্দ্রনাথ কবিওয়ালাদের মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন,

তাঁদের ও তাঁদের পেট্রন সর্বসাধারণের রুচিকে স্থূল অমার্জিত অযোগ্য বলে কটাক্ষ করেন। ('ইংরাজের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। এখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্য-রস আলোচনার অবসর যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল?- 'কবি-সংগীত', লোকসাহিত্য, রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৬৮: ৭১০), তিনিই আবার তথাকথিত গৌণধর্মীদের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন (দ্র.'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', আত্মশক্তি ও সমূহ, রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, ৭২৮)। গোপাল উড়ের আড়খেমটা তালে রচিত রসাল গানগুলি জনপ্রিয় হলেও, ভদ্ররুচির মাপে ছিল স্থূল, অমার্জিত, রুচিহীন, অভদ্র,'ইতর অথচ সেই তালে গান বাঁধতে রবীন্দ্রনাথের বাধেনি (উদাহরণের জন্য দ্র. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব পৃ. ২৪)। 'কৃতবিদ্য সমাজ' কীভাবে এই 'ইতর গানগুলি' নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন তা আমাদের জানিয়েছিলেন রাজেশ্বর মিত্র (' এই অভদ্র ইতর গানগুলি তো সুরের দিক থেকে দরিদ্র ছিল না। সুতরাং কৃতবিদ্য সমাজ একটি চমৎকার কাজ করলেন। ... অর্থাৎ সেইসব গানের সুর এবং সৌষ্ঠব নিজেদের গানে এনে বসিয়ে ছিলেন এবং ঘৃণাক্ষরেও একথা প্রকাশ করলেন না। ফলে তাঁদের রচনার জয়জয়কার হল...' (উদ্ধৃতির জন্য দ্র. সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব। পৃ: ২৪)।

৮. সুধীর চক্রবর্তী, 'লোকধর্ম', বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' সম্পা. বরুণকুমার চক্রবর্তী। কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স। ১৯৯৫:৩৮৪।

৯. 'লালনের গান ভাল লেগেছিল বলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি এস্টেটের কর্মচারীদের দিয়ে লালনের গানের দুটো খাতা নকল করিয়ে এনেছিলেন। সে খাতাদুটো এখনও বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সযত্নে রাখা আছে। ১৯২৫ সালে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালনের ছেঁউরিয়া আখড়ায় গিয়ে একখানা পুরনো গানের খাতা দেখতে পান, যা ভুলে ভরা। লালনশিষ্যরা তাঁকে বলেন, 'সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহে রবিবাবু মশায় নিয়ে গেছেন'। একই কথা অন্নদাশংকর রায়কে বলেন কাঙাল হরিনাথের ভাইপো ভোলানাথ মজুমদার... (সুধীর চক্রবর্তী, লালন। কলকাতা: প্যাপিরাস। ১৯৯৮:২৮-২৯)।

১০. তুষার চট্টোপাধ্যায়, তদেব। পৃ. ৫২। বঙ্কিম অক্ষর আমার।

১১. দ্র. আমার রচনা 'লোক-এর বিভাজন', লোকশ্রুতি, আষাঢ় ১৪০৯। পৃ ১-১১।

১২. হরিদাস পালিত, আদ্যের গম্ভীরা। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০৩ (পুনর্মুদ্রণ): ৩৫-৩৬। প্রথম প্রকাশ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

১৩. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা। কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র। ২০০০:১৭।

১৪. ঐ. পৃ. ২০। বঙ্কিম অক্ষর আমার।

১৫. দোকড়ি চৌধুরী, 'সাক্ষাৎকার', দীপঙ্কর ঘোষ, লোকশ্রুতি জুন ২০০৪: ২৪৩-৫৮। বঙ্কিম অক্ষর আমার।

১৬. সুধীর চক্রবর্তী, 'লোকধর্ম', বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ। পৃ ৩৮৫

১৭. ঐ।

১৮. দ্র. সনৎকুমার মিত্র, সম্পা. কর্তাভজা: ধর্মমত ও ইতিহাস। কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ। ১৩৮৩।

১৯. সুধীর চক্রবর্তী, 'কর্তাভজা সম্প্রদায়: ধর্মমত ও সাধনতত্ত্ব', কর্তাভজা: ধর্মমত ও ইতিহাস. সনৎকুমার মিত্র. সম্পা. কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৩৮৩। পৃ. ২৯।

প্রবন্ধ

চলচ্চিত্রের কাছে দর্শক যা চায়

সুনীত সেনগুপ্ত

এ কদিন বিকেলে আমরা চারবন্ধু মিলে ঠিক করলাম একটা সিনেমা দেখতে যাব। সকলেই এক কথায় রাজি। কলকাতার হলে তখন বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি সব রকমরে ছবি। নন্দনেও নামকরা এক ইতালীয় পরিচালকের ছবি। সবাই একসঙ্গে ছবি দেখব, এই পর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত এক রকমের হলেও গোল বাধল কোন ছবি দেখব এই নিয়ে। কেউ বলল, পুরনো বাংলা ছবি— পঞ্চাশ দশকের— যেখানে নিটোল একটা গল্প আছে, কেউ বলল টারমিনেটর মার্কা হলিউডি ছবি— যা দেখতে দেখতে চোখ কান বাঁধিয়ে যায়, কেউ বলল, মারদাঙ্গাওয়ালা হিন্দি ছবি— যা বাস্তব অবাস্তবের কোনও সীমারেখা মানে না। আর একজন এ সবে নাক সিঁটকে ইতালীয় ছবিটিতে মত দিল। পেশাগত দিক থেকে আমরা সকলেই কৃতী, আধুনিক ও ঝকঝকে। তা হলে ছবি দেখার ব্যাপারে এতটা মতের অমিল কেন? সেটা কি রুচির তফাত না, সিনেমা থেকে প্রত্যাশায় আমরা একে-অন্যের থেকে পৃথক?

তা হলে গোড়াতেই এই প্রশ্নটা করা যাক, কেন আমরা সিনেমা দেখি? বা চলচ্চিত্রের কাছে একজন দর্শক কী চায়? আমরা কি ছবি দেখি নিছক সময় কাটানোর জন্য? বিনোদনের জন্য? যদিও আমি যা বলতে চাইছি সে অর্থে 'বিনোদন' কথাটা একটু বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আমরা কি ছবি দেখি নিছক হালকা আনন্দ পাওয়ার জন্য? 'আনন্দ পাওয়া' বলার সময় আমাদের নিশ্চিত হতে হবে কী ধরনের আনন্দ। রুচি ও শিক্ষাভেদে আনন্দ পাওয়ার উপকরণ পালটায়। শিল্পকে উপভোগ করার জন্য চাই বিশেষ সংবেদনশীল মন। এটা সম্পূর্ণই মানসিক গঠনের ওপর নির্ভরশীল। প্রথাগত শিক্ষা বা অশিক্ষার ওপর নয়। অনেক উচ্চশিক্ষিত লোক কবিতা শুনতে শুনতে হাই তোলেন, আর অনেক তথাকথিত স্কুল কলেজে না পড়া সামাজিক অর্থে অশিক্ষিত লোকের গান গাওয়া বা আঁকার পারদর্শিতার প্রমাণ ভূরিভূরি। শিল্পকে উপভোগ করার জন্যও যেমন চাই মনের সংবেদনশীলতা তেমনই শিল্পবোধে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য চাই উপযুক্ত শিল্পশিক্ষা। তাই মানুষের মানসিক গঠন ও শিল্পরুচি ভেদে সাহিত্য-শিল্প, নাটক-চলচ্চিত্র থেকে আনন্দ পাওয়ার উপকরণ ভিন্ন হতে বাধ্য। খেয়ে পরে থাকার জন্য জীবিকা আর জীবন যে সব মানুষের কাছে সমার্থক, তার বাইরে আগ্রহ একটুকুও প্রসারিত নয়, সে সব মানুষদের রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিয়েছেন 'অলসচিত্ত জনসাধারণ', আর এরা 'আনন্দ পাওয়ার অধিকারী নয় বলে চমক পাওয়ার নেশায় ডোবে।' এ কথা চলচ্চিত্র সম্পর্কে আরও প্রযোজ্য কেননা 'সিনেমাটা একটা বারোয়ারি শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পকেটে টিকিট কেনার মতো পয়সা আর হাতে ঘন্টা তিনেক সময় থাকলেই যথেষ্ট। তদুপরি যন্ত্রনির্ভর এই শিল্পটিতে 'কলার চেয়ে কারদানি'কে মুখ্য করে চমক দেওয়ার সুযোগও বেশি।

চলচ্চিত্র শিল্প কি না এ প্রশ্ন এখন আর কেউ-ই তুলবে না। তবুও একটু পেছনের দিকে তাকানো যাক। ইতিহাস পড়ে আমরা জেনেছি, নাটক ও কাহিনি-বিবর্জিত সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনার সামিল একটি বিষয়কে নিয়ে লুমিয়েরের তৈরি ছবির থেকে চলচ্চিত্রের যাত্রাপথ শুরু। চলচ্চিত্রমাধ্যমের বিকাশ বিগত একশো বছরের মধ্যে এতটা পথ পরিক্রমা করে এসেছে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যে আজ আর কোনও কিছুই এই মাধ্যমে প্রকাশ করা অসম্ভব নয়। চলচ্চিত্রে এই বিবর্তন এত দ্রুত সম্ভব হয়েছে তার প্রধান কারণ প্রচলিত ধারণা সব চিত্র পরিচালকদের অন্য সব শিল্প-মাধ্যম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করার পেছনে একটি আধুনিক ও সচেতন মন। কিন্তু আজকালকার ছবি দেখে মনে আশঙ্কা জাগে যে যন্ত্রনির্ভর এই শিল্পমাধ্যমটি ক্যামেরার হাত থেকে মুক্তি নিয়ে কম্পিউটারের খপ্পরে পড়ল কি না। বিষয়বস্তু যেন পরিচালকের কল্পনার নির্ভরতা কাটিয়ে অনাবশ্যক কারণে Special effects-এর কারদানির দ্বারা রূপায়িত না হয়। তা হলে চলচ্চিত্র জীবনের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাণহীন কতগুলো অবাস্তব বিষয়ের চিত্র-মাধ্যম হয়ে উঠবে। তা ছাড়া যন্ত্রনির্ভর এই শিল্পটিকে রূপায়িত করার সময় নানারকম যান্ত্রিক কারসাজির সাহায্য নিতে হয়। তাই চলচ্চিত্র-মাধ্যমের পরিভাষা অনেক ব্যাপক। যান্ত্রিক

কারসাজি জেনে বা পরিভাষার জ্ঞানকে ভর করে যদি আমরা নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করার জন্য ছবিকে বিচার করার সময়, তার বিষয়ের গভীর না গিয়ে মানবিক অনুভূতির প্রকাশক্ষমতার বিচার না করে, সমাজজীবন ও সময়ের সঙ্গে কতটা সম্পৃক্ত সে আলোচনা না করে, শুধু অবাস্তব কারসাজির আড়ম্বরের প্রকাশে মুগ্ধ হই, তবে সে ধরনের পাণ্ডিত্য আমাদের বরং গণ্ডিবদ্ধ করে এক ভীতিগ্রস্ত সংযোগহীনতার কোঠায় নিয়ে যাবে। ছবি সার্থক হয় তখনই, যখন দর্শকের সঙ্গে এক অন্তরঙ্গতা প্রতিষ্ঠিত হয়। চলচ্চিত্রকারের সঙ্গে দর্শকের এই মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য সে রকম আলোচনার প্রয়োজন যেখানে আমরা প্রমাণ করব চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু আমাদের জীবনের সঙ্গে কতখানি ঘনিষ্ঠ। চলচ্চিত্র হচ্ছে তার প্রকাশভঙ্গি, বলার ছন্দ, বলার কথা— সব মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ প্রকাশ। এ বিষয়ে দর্শকেরা যতই বুঝতে শিখবে ততই বাজে ছবি দেখা বন্ধ হবে। পরিচালকেরাও তাদের মনগড়া, অবাস্তব, অসার, ইচ্ছাপূরণের গল্প ফেঁদে দর্শকদের মন ভোলাতে পারবে না। তখন আমরা বুঝব যে, যে-কোনও ছবিকে বাছবিচারহীনভাবে গোগ্রাসে গিলতে পারাটাই চলচ্চিত্র-প্রীতির নমুনা নয়। আর যে-দর্শক তার নিজস্ব জীবনের সামগ্রিক বাস্তবতার থেকে সরে গিয়ে ছবির অবাস্তব পরিবেশে মগ্ন থেকে চিন্তাভাবনাহীন মনগড়া এক জগতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসার আনন্দ পেতে চায়, তাদের আমরা ভাল দর্শক বলে গণ্য করব না।

আমরা সে রকম ছবি দেখতে চাই যা আমাদের নিশ্চিতভাবে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেয়। যে-ছবিতে বর্ণিত জগৎ আমাদের নিজস্ব চেনা জগৎ। ছবির চরিত্রগুলি আমাদের চেনা-জানা মানুষ বা চেনা না হলেও বিশ্বাসযোগ্য মানুষ। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বাস্তব ঘটনার সত্য প্রতিফলন হলে আমরা ছবির বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি। ছবির চরিত্রের দুঃখ-শোক, কল্পনা-অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার অংশীদার হয়ে উঠি। আমাদের নিজেদের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখি, খণ্ডিত ভাবে নয়, সামগ্রিকভাবে। স্রষ্টা যুগপৎ তাঁর সৃষ্টির বেদনা ও প্রস্ফুটিত প্রকাশের আনন্দ ছবির মধ্য দিয়ে আমাদের মনে সঞ্চারিত করে দেন। আমরা অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করি জীবনকে দেখার আনন্দ, খণ্ডকে ছেড়ে সমগ্রকে, ক্ষুদ্রকে ছেড়ে বৃহৎকে দেখার আনন্দ, আমরা ছবিটি দেখার পরও উপলব্ধিজাত এই আনন্দকে বিস্মৃত হই না, স্মরণীয় করে রাখি। ছবি দেখার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে ছায়ার মতো বহুদিন থাকে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সারা জীবন। এই অভিজ্ঞতা আমাদের কল্পনাকে প্রসারিত আমাদের জীবনধারণের আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে। গানের কলির মতো কবিতার কোনও লাইনের মতো চলচ্চিত্রের কোনও দৃশ্য, কোনও সংলাপ আমাদের মনে নানা সময়ে ফিরে ফিরে আসে। আমাদের সুখ-দুঃখ শোক-প্রতিবাদের ভাষা হয়ে ওঠে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি নিজে৩২ অনেকবার কোনও মমতাহীন বিরুদ্ধ পরিবেশে আক্রান্ত হয়ে বলে উঠেছি 'I accuse... কারে?' আমার এই নিষ্ফল প্রতিবাদের ভাষা আমি ঋণ নিয়েছি 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতার বাবার একটি সংলাপ থেকে। আমি সেই মুহূর্তে ওই অসহায় করুণ বাবার মতো হয়ে যাই। আবার কোনও কোনও সময়ে আমি যেন আউড়ে উঠি, (দাদা) আমি বাঁচতে চাই। ওই 'মেঘে ঢাকা তারা'র শেষ দৃশ্যের নীতার মতো। আমি যখন সঙ্গীহীন, দুর্বল, অসহায়, চারপাশটা যখন আমার অস্তিত্বের টুঁটি চেপে পিষে ফেলতে চাইছে, তখন আমার জীবনের প্রতি আগ্রহ, আমার বাঁচার অদম্য ইচ্ছা ওই ভাবেই প্রকাশ পায়। অনেকে হয়ত বা দৃশ্যটিকে লাউড বা মেলোড্রামাটিক বলবেন। সেটা লাউড বা মেলোড্রামাটিক হলেও বাস্তবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংপৃক্ত। আর বাস্তব বলেই পরিবেশনার আন্তরিকতায় হয়ে ওঠে শিল্পসম্মত। 'কোমল গান্ধার' ছবিটির কিছুটা অস্পষ্ট, কিছুটা দুর্বোধ্য কথার সঙ্গে রেললাইন ধরে দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসা চলমান দৃশ্যটিও আমাকে স্বপ্নে জাগরণে তাড়িয়ে বেড়ায়। দৃশ্যটির অর্থ হয়ত আমি সঠিকভাবে বুঝি না। অনেক না-বোঝা বিষয়ও আমাদের কাছে দারুণ অর্থবহ ও প্রয়োজনীয়। এই সূত্র ধরে, গানের প্রসঙ্গে আমি স্বীকার করছি 'এ কি সত্য, সকলই সত্য, হে আমার চিরভক্ত' বা 'মেঘ বলেছে "যাব যাব", রাত বলেছে "যাই"'/সাগর বলে "কূল মিলেছে— আমি তো আর নাই।" এই গান দুটির অর্থ কি আমি সম্পূর্ণ বুঝেছি? হয়ত না, তবু এই গান দুটি আমার প্রিয় গানের তালিকায় একেবারে প্রথম সারিতে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। শিল্পের, সে চিত্রকলাই হোক, কবিতা বা চলচ্চিত্রই হোক, আমরা নিজেরা ঠিকমতো বুঝেছি কি না, সেটা যাচাই করার জন্য অনেক সময় শিল্পীর বা কবির বা নির্মাতার মুখাপেক্ষী হই। শিল্পের রসগ্রাহণে এর প্রয়োজন আছে কি? আমার কাছে, আমার বোধ ও বিচারে যে অর্থটা প্রতিভাত হয় উঠছে সেটাই ঠিক। কেননা আমি তো আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে তাকে বিচার করি।

ছবি আর আমি— এর মাঝখানে কেউ নেই, সেখানে কেবলমাত্র জীবন এসে উঁকি দেয়। আমার অভিজ্ঞ জীবন, শুধু সেটুকু না, আমার সাধের জীবন, আমার অপূর্ণ জীবন। তখন আমি ছবির ব্যাখ্যা করি আমার মতো করে। ছবি সেখানে যেন শুধু উৎসভূমি। স্রষ্টার সৃষ্টিতে ছড়িয়ে থাকা কোনও সঙ্কেত বা ইশারাকে ভর করে আমি বেরিয়ে পড়ি নিজের কল্পনার জগতে।

যেতে যেতে কোনও কোনও সময় এতটাই দূরত্বে চলে যাই, যেখানে সেই উৎস যে ছবিটা, তার আর কোনও হদিস থাকে না, সে মিলিয়ে যায় আমাকে এক নির্জন জায়গায় ছেড়ে। এ জায়গাটাকে আমার অস্পষ্টভাবে চেনা মনে হয়— আবার অচেনাও লাগে। তবে এ আমার গোপন কান্নার জায়গা, অপার বিস্ময়ের জায়গা, গভীর অনুভূতিকে স্পর্শ করার জায়গা। সচরাচর এখানে আসা হয় না। কোনও একটা সূত্র ধরে তো আসা চাই— গানের কথা বা সুর— কবিতার কোনও শব্দবন্ধ বা গোটা একটা লাইন, ছবির কোনও দৃশ্য হল সেই সূত্র— তা তো মেলে কদাচিৎ। তাই আসার পথটাকে বাস্তবজীবনের দৈনন্দিনতায় হারিয়ে ফেলি। তাকে আবার খুঁজে পেতে হয়। এত সব ঘটনা মনের মধ্যে ঘটে বলেই আমার ব্যাখ্যার সঙ্গে অন্যের ব্যাখ্যা মিলবে কি করে?

তবে আমরা কি শুধু নিজের ব্যাখ্যা নিয়েই থাকব অন্যদের উপলব্ধিকে উপেক্ষা করে? তা মোটেই নয়। কেননা, কোনও কোনও ছবি আমাদের মনের অন্তর্গত আলোড়নের মর্মস্পর্শী প্রকাশ করে, অভিজ্ঞতার চাপে জীবনের মৃত্তিকার গভীরে যে সব কম্পন ঘটায় তার কথা বলে। এ সব ছবিকে যেমন নিজস্ব বোধে, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় যাচিয়ে নিতে হয়, তেমনই অনেক ছবি কবিতার মতো আমাদের নিজস্ব বোধের পরিধির থেকে কেন্দ্রচ্যুত করে এক ভিন্ন স্তরে টেনে নিয়ে যায়। এই দুই ক্ষেত্রে আমি যেমন দর্শক হিসাবে একা ও নিঃসঙ্গ তেমনই আবার কোনও কোনও ছবি দেখে হয়ে উঠি প্রতিবাদমুখর। হাত আপনা-আপনি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়, চোখ রক্তবর্ণ, স্বরগ্রাম উঁচু তারে বাঁধা, মেরুদণ্ড হয় টান টান, পা সচল হয়ে জানায়, এ জুলুম চলবে না, এ নির্যাতন অসহ্য, এ বঞ্চনা অমানবিক, এই উন্মত্ত হিংসার প্রতিকার চাই। এ রকম ক্ষেত্রে আমরা একজন সহচর খুঁজি। সমস্তরের না হলেও সমগোত্রীয়। প্রসঙ্গত, অপর্ণা সেনের সাম্প্রতিক ছবি 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার'-এর কথাই ধরা যাক। বর্তমান ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক হানাহানি যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই ছবিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রচেষ্টা। এই ছবিটি তার বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার গুণে আমাদের সকলকে নাড়া দিয়েছে, ভাবিয়ে তুলেছে। প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করেছে— আমাদের সত্যিকারের আইডেনটিটি কী? আমাদের অস্তিত্ব কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে? এই ছবির মধ্য দিয়ে আমরা যেমন টের পেয়েছি আমাদের চরিত্রের সীমাবদ্ধতাকে, তেমনই মানবিকতাকেও। এমন একটি ছবি নিয়ে নানারকম আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক। কয়েকটি আলোচনা আমাদের চোখে পড়েছে, যার লেখকেরা, যেমন দয়িতা দত্ত, রামচন্দ্র গুহ, অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় বা দেবেশ রায়, সচরাচর ফিল্ম নিয়ে এঁরা লেখালেখি করেন না। নিশ্চয়ই, কোনও একটা তাগিদে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁরা লিখেছেন। পেশাগত দিক থেকে এঁরা কেউ শিক্ষাবিদ, কেউ সমাজতাত্ত্বিক কেউ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। এর ফলে এঁদের বিশ্লেষণে এমন কয়েকটা দিক ফুটে উঠেছে যা হয়ত আমাদের নজর এড়িয়ে যেত। দয়িতা দত্ত আক্ষেপ করেছেন যে আজকাল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইতিহাস পড়ার কোনও সিরিয়াস আগ্রহ নেই। তার চেয়ে বিজ্ঞান বা কমার্স পড়ে MBA ডিগ্রি নিয়ে মোটা রোজগারের দিকেই ঝোঁক। কে আর ইতিহাস পড়ে দেশের বা মানুষের ইতিহাস জানতে চাইবে এই বাজার অর্থনীতির যুগে? অথচ আজ যে অতীতচর্চাই সবচেয়ে জরুরি কেননা এই বোধশূন্য তথাকথিত আধুনিকতা যে আমাদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আর আমরা যে অরাজনৈতিক চেতনার জন্য ক্রমশ শঠ ও চতুর রাজনীতিবিদদের শিকার হয়ে উঠছি, সেটা বোঝার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলছি। ছবিটি দেখার পর, একজন ভদ্রলোক নাকি মুসলমান ছেলে আর হিন্দু মেয়ের মধ্যে প্রেমের গল্প ফেঁদে বসার অভিযোগে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বলেন, এ সব ছবি পুড়িয়ে ফেলা ভাল। ঘটনাটির বর্ণনা দিয়ে লেখিকার মন্তব্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ, এ কারণেই ছবিটি প্রাসঙ্গিক ও জরুরি।

রামচন্দ্র গুহ লেখেন একজন নামকরা ঐতিহাসিক অযোধ্যার তাণ্ডবলীলার বছরগুলিতে ছদ্মনামে ঘুরে বেড়াতেন। নিজ বাসভূমে এমন পরবাসী হয়ে থাকার মতো করুণ ও মর্মান্তিক অবস্থা আর কী হতে পারে। অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'আমাদের পরিবার, আমাদের সমাজ, আমাদের সম্প্রদায়, আমাদের রাষ্ট্র চায় না যে আমরা নিজেকে আবিষ্কার করতে শিখি, বিভিন্ন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নিজেকে বার বার নতুন করে খুঁজে নিই। আমাদের আসল লড়াই নিজের আইডেনটিটি নিজে খুঁজে নেওয়ার লড়াই, খুঁজে নেওয়ার অধিকার অর্জনের লড়াই। তার দাবি হল, আমরা কোনও আরোপিত আইডেনটিটিকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেব না। এবং কোনও একটি আইডেনটিটিকে অন্য বহু আইডেনটিটির ওপরে প্রভুত্ব করতে দেব না। জীবনের সর্বস্তরে এই বহু সত্তার জন্য লড়াইটা চালাতে পারলে তবেই বোধ হয় সাম্প্রদায়িক মোকাবিলায় আমরা একটা বিশ্বাসযোগ্য অবস্থান নিতে পারব। এই ছবি না দেখলে কথাটা ঠিক এভাবে ভাবতে পারতাম না।' দেবেশ রায় 'অপর্ণা সেনের সিনেমাটি: গেরিলা যুদ্ধের অস্ত্র হোক' শিরোনামে লেখাটির শেষে বলেন, 'এখন এই লেখাটিতে আমি অপর্ণার এই সিনেমাটিকে সীমান্ত রক্ষার কাজে ব্যবহার করতে চাই। এ ছবি নরেন্দ্র মোদিকে অবরুদ্ধ

করবে। এই ছবি গেরিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে গুজরাটের বাইরে আসতে হবে।' এমন সব আলোচনা পড়ে আমরা সুযোগ পাই লেখকদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের অনুভূতিকে মিলিয়ে দেখার। শুধু তাই না, নানা ভাব ও ভাষার ছবির দেখার অভিজ্ঞতায় 'চলচ্চিত্রের কাছে দর্শক কী চায়' সে ধারণাকেও আরও স্পষ্ট আরও পরিমৃত করে নেওয়ার সুযোগ পাই, এই তুলনামূলক আলোচনা বা ভাবনা আমাদের অনেক সময় ছবির অর্থময়তার দিক থেকে নতুন আলোর সন্ধান দেয়। এ ধরনের লেখা নিয়ে আমরা নিজেদের মনে তর্ক বিতর্ক করতে পারি। নিজস্ব অনুভবকে যুক্তিযুক্ততা দিয়ে আরও সমৃদ্ধ করতে পারি, নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে তুলতে পারি।

তবে অর্থময়তার দিক থেকে শিল্প তো সব সময় গাণিতিক সূত্র মেনে চলে না। এখানে দুই আর দুই মিলে যে সব সময়ই চার হবে এমন কথা হিরনিশ্চয় করে বলা চলে না। কোনও কোনও বিচারে পাঁচও হতে পারে। যেমন হয়েছিল আমার সঙ্গে কলেজে পড়া একটি চেনা মেয়ের। চারুলতা ছবিটি দেখে তার প্রতিক্রিয়া ছিল বাকি সকলের চেয়ে আলাদা, আর সেটা তার সম্পূর্ণই নিজস্ব ভাবনা। ছবির শেষ দৃশ্যে অফ্ ভয়েসে যখন ছবির আরম্ভের কথাগুলো আবার পুনরাবৃত্ত হয়, তক্ষুনি ওই মেয়েটির মন ভীষণ ভাবে বিষিয়ে ওঠে ছবির অমলের ওপর। বড় করুণ দৃশ্যটি— কী অসহায় এই দুটি প্রাণী— চারু আর ভূপতি। মনে হয় এরা বেশ তো ছিল, ভালই ছিল, খামোখা কেন ঝামেলা নিয়ে এল অমল, এসে তাদের সম্পর্কের খড়কুটো বের করে দিয়ে চলে গেল। আমরা তো অনেক সময়ই বাস্তবের মুখোমুখি হতে চাই না— যেটা খুব করুণ আর রূঢ় বাস্তব। কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে। এই মেয়েটির কথাগুলি আমাদের একটু আলাদা রকমের লেগেছিল। নিশ্চয়ই তার অভিজ্ঞতার থেকে ওই কথাগুলো মনে এসেছে। তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা। কোনও এক অমলকে সে হয়ত চেনে। সে হয়ত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে যে আমাদের মুখের দু'একটা কথা, ছোটখাট ব্যবহার আর একজনের মনে কতটা ভাঙচুর করতে পারে। অথচ যারা সে রকম ব্যবহার করে তারা হয়ত খেয়ালই করে না, অন্যমনস্ক ভাবে করে। আসলে আমরা সকলে নিজেদের নিয়ে বড় ব্যস্ত থাকি। তারপর অবলীলাক্রমে যখন সমস্ত কিছু ফেলে চলে যাই নিজের কাজে, আমাদের পাতানো সম্পর্কের প্রতি সম্পূর্ণ খেয়ালশূন্য হয়ে তখন কি আমরা বুঝতে পারি অন্য মানুষটির চোখে বা মনে এই ব্যবহার কত নির্মম নিষ্ঠুর হতে পারে? ওই মেয়েটি হয়ত তার চেনা অমলের উপর রাগ বা অভিমান এই অমলের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। তার মন্তব্যর পেছনে যে ঘটনা বা পরিপ্রেক্ষিত তার বর্ণনা সে দেয়নি, তবু, তার কথাগুলো ফেলতে পারিনি— আজও মনে আছে।

সম্প্রতি দেশ পত্রিকায় জয় গোস্বামীর একটি লেখা পড়লাম— নিজের রবীন্দ্রনাথ। সোনার তরী কবিতাটি এই লেখকের কাছে কীভাবে স্নেহ হারানো শোক পাওয়ার কবিতা হয়ে আছে, সেই নিয়ে এই লেখা। 'শ্রাবণ গগন ঘিরে/ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে/শূন্য নদীর তীরে/রহিনু পড়ি/যাহা ছিল নিয়ে গেল/সোনার তরী।' কালো হয়ে আসা আকাশের নীচে, সারাদিনের বৃষ্টিতে ভেজা গাছপালার প্রেক্ষাপটে কবিতার এই লাইন ক'টি তাঁর বাবার মৃত্যুস্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে। জয় গোস্বামীর লেখাটি পড়ে মনে হয়, সত্যিই কবিতার এই কথাক'টি কত মর্মান্তিক আর তাঁর বুকে চাপা কষ্টের ভার কত নিদারুণ। লেখক তাঁর এ রকম মনে হওয়ার কারণটি শৈশবের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে আরও স্পষ্ট করে তুলেছেন। লেখাটি পড়ে আমার কাছেও সোনার তরীর ওই লাইন ক'টি নতুনভাবে অর্থময় হয়ে ওঠে। আমার শোকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে গিয়ে আমার কাছেও শোকের কবিতা হিসাবে দেখা দেয়।

চলচ্চিত্রের কাছে দর্শক কী চায় বা চলচ্চিত্রের কাছে আমাদের প্রত্যাশা কী? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে হয়ত একটা স্বার্থপরতার ছোঁয়া পাওয়া যাবে। বিষয়টিকে আরও নির্দিষ্ট করে বলি। চলচ্চিত্রের প্রয়োজন আমার কাছে কতটা? বিনোদনের প্রশ্ন বাদ দিয়ে, বলা যেতে পারে আমার জীবনে, আমার জীবনযাপনের খাতিরে আমি কি এই শিল্পমাধ্যমটির প্রয়োজন বোধ করছি? হাতের কাছে আছে গান, গান শুনেই তো মন ভরে যায়। গান তার সুরের রশ্মি ছড়িয়ে মনের মধ্যে এমন এক অনুষঙ্গ রচনা করে বা পুরনো কোনও অনুষঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটায় যা মুহূর্তে আমার শরীরে এক শিহরণ জাগিয়ে তোলে যখন ক্লান্তিকর এই অস্তিত্বকে মনে হয় ভারহীন ছন্দোময়। এ আমির আবরণ থেকে আর এক আমিতে পৌঁছে যাই। আর আছে বই। বিশেষ করে কবিতার বই, যা পড়ে আমরা আমাদের নিজেদের তৈরি ক্ষুদ্র গণ্ডির বেষ্টনি থেকে এক বৃহত্তর সীমানায় পৌঁছে যেতে পারি। চলচ্চিত্র কি পারে সে রকম কিছু? পারে, শুধু পারে না, বেশি করেই পারে। পুদভকিনের ভাষায় বলি, 'The film is the greatest teacher, because it teaches not only through brain but through whole body.' চলচ্চিত্রমাধ্যম আমাদের শুধু উত্তেজিত করে না, উদ্বেলিত করেও তোলে। কবিতা বা গানের মতো চলচ্চিত্রের কোনও চলমান দৃশ্য বা মুহূর্ত আমাদের তন্ময় করে তোলে যা দেখে আমরা

কোনও এক বেদনার স্তরে পৌঁছে যাই, মনের মধ্যে ভেসে আসে হারিয়ে যাওয়া নানা স্মৃতি, তৈরি হয় নানা দৃশ্যকল্প, আমরা চলে যাই মনের গোপন গভীরে। 'অপরাজিত' ছবিতে মা সর্বজয়া বসে আছে গাছে ঠেস দিয়ে, দূরে ট্রেন চলে যায়। তার এই নিঃসঙ্গ প্রতীক্ষা আমরা উপলব্ধি করি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে। সর্বজয়ার শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে, সময় কেটে যাচ্ছে দ্রুত। প্রতীক্ষার শেষ কোথায়? নিঃসঙ্গ এই অস্তিত্ব বড়ই বেদনাবহ, দীর্ঘ ও করুণ। জীবনের শেষ মুহূর্তে ছেলের ডাক শুনে বাইরে আসে। কেউ কোথাও নেই, ভুল শুনেছে সে। ছেলে আসেনি। শূন্য মনে ঘরে ফিরে যায়। মানুষ নিশ্চয়ই মৃত্যুর মুহূর্তে তার প্রিয়জনকে দেখতে চায়। জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় ক্ষুদ্র বাস্তব আকাঙ্ক্ষা। অসমর্থ শরীরের সমস্ত স্নায়ু শক্তি যোগায় বাঁচিয়ে রাখার, চোখ মেলে তাকাবার। সে খোঁজে প্রিয়জনকে, পায় না, দেরি আর সয় না, চোখ আপনিই বুজে আসে। অপুর চোখের আড়ালে, আমাদেরও, সর্বজয়ার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সাক্ষী থাকে অন্ধকারের জোনাকিরা আর আকাশের নীরব নক্ষত্রমালা। সবাক চলচ্চিত্রে এইসব দৃশ্য নীরব। চলচ্চিত্রের দৃশ্য অনেক সময় এভাবে হয়ে যায় নিঃশব্দ, সচল ছবি স্থির। দৃশ্যের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের মতো, গতি আর শব্দের তারতম্য ঘটিয়ে চলচ্চিত্রে কোনও বিশেষ মুহূর্ত তৈরি করা বা অনুষঙ্গ রচনা করা সম্ভব, যাতে সমগ্র ছবিটি হয়ে ওঠে ছন্দোময় ও অর্থবহ।

সব শিল্পই জীবনের কথা বলে। প্রকৃতিকে দেখতে চেনায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের, প্রকৃতি, জগতের, সৃষ্টিরহস্যের অন্তর্লীন সম্পর্ককে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে। প্রকাশের এই আলোকে আমরা নিজেদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে পারি। আমাদের মনে যে অনুভূতি আবছা হয়ে লুকিয়ে আছে তাকে সেই আড়াল থেকে টেনে আনাই শিল্পীর ক্ষমতা। আমরা সাধারণ মানুষেরা আমাদের অনুভূতির রূপরেখা বা গভীরতা সব সময়ে ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারি না। প্রকৃত শিল্পীরা নির্বাচন করেন এমন শব্দ, এমন দৃশ্য যার মধ্য দিয়ে বিষয়ের মূল সুরটি বা গভীর সত্যটি বেরিয়ে আসে। 'ইনার আই' ছবি তৈরির সময় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় সত্যজিৎ রায়কে সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছেন— 'তোমার ফিল্মে খোয়াই দেখাবে তো?... খোয়াই বাদ দিও না। খোয়াই আর তাতে একটা সলিটারি তালগাছ। ব্যস্। আমার স্পিরিট, আমার জীবনের মূল ব্যাপারটা যদি কোথাও পেতে হয়, ওতেই পাবে। বলতে পার ওটাই আমি।' আর সেই সঙ্গে প্রকাশভঙ্গি হবে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক। যাতে বিষয়ের সমগ্র রূপটা ফুটে ওঠে। এক পাল মোষের ছবি আঁকার সময় একটা বাচ্চাকে সঙ্গে দিতেই হবে। তা না হলে মোষের পালের ছবি সম্পূর্ণ হবে না। অস্বাভাবিক হয়ে পড়বে। ছবির দর্শকের যখন এই উপলব্ধি ও বিচারবোধ দৃঢ় হবে, তখন সে তার নিজের প্রয়োজনেই চলচ্চিত্রের কাছে যাবে, স্রষ্টার শিল্পে প্রস্ফুটিত প্রকাশের আনন্দের আস্বাদনের আকুলতায়।

বাইরের বিরুদ্ধে পরিবেশ যখন আমাদের অস্তিত্বকে তছনছ করে দেওয়ার উপক্রম করে, যখন খুঁটিনাটি জীবনযাপনের গ্লানিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন জীবনের আবেগঘন মুহূর্তকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করার আকাঙ্ক্ষায় আমরা আমাদের প্রত্যাশার চলচ্চিত্রের কাছে যাই আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাওয়ার আশায়।

ধারাবাহিক স্মৃতিচারণ

ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়

সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আগেই বলেছি 'জনসেবক' পত্রিকায় আমার কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের মিটিং রিপোর্ট করা। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত একটানা ছয় বছর আমি এই কাজটি করেছি। স্বাধীনতার আগে ইংরেজ আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে 'স্ট্যাটুট' তৈরি হয়েছিল, ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ওই আইন ও নিয়মবিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হত। আমার যতদূর মনে পড়ে ১৯৫২ সালেই পশ্চিমবাংলা সরকার রাজ্য বিধানসভায় নয়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস করিয়ে নেন। সম্ভবত ১৯৫৩ সাল থেকে নতুন আইনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৫০ সালের মে মাস নাগাদ তখনকার ভাইস চ্যান্সেলর বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় রাজ্য সরকার বিচারপতি শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন। নতুন আইনে মাইনেকরা পূর্ণসময়ের জন্য ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগের বিধান অনুযায়ী শম্ভুনাথবাবুই ভাইস চ্যান্সেলার পদে বহাল থাকেন। বাংলার স্কুল শিক্ষার (অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্যন্ত) যে দায়দায়িত্ব প্রায় শতবর্ষ ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয় বহন করে আসছিল নতুন আইনে তারও অবসান ঘটানো হল। এ জন্য গঠন করা হল সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড। সেকেন্ডারি বোর্ড ১৯৫৩ সাল থেকে কাজ আরম্ভ করলেও তার নিয়ন্ত্রণে প্রথম স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা হল ১৯৫৪ সালে।

বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত খবরাখবর রিপোর্ট করার পদ্ধতি, নিয়মকানুন, সেনেট, সিন্ডিকেট এবং নতুন আইনে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের ভূমিকা প্রভৃতি আমাকে যিনি শিখিয়েছেন, তাঁর নাম সমর চক্রবর্তী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচেয়ে পরিচিত ও প্রবীণ রিপোর্টার ছিলেন। ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার (ইউ পি আই) রিপোর্টার সমরদা ১৯৩২-৩৩ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোর্ট করা আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ভারত সরকার স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে যে এডুকেশন কমিশন গঠন করেছিলেন, সেই কমিশন যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সফরে আসে, তখন সমরদা স্যার তেজ বাহাদুরের 'ইন্টারভিউ' নিয়েছিলেন। এই সময় স্যার তেজ বাহাদুরের সঙ্গে নেওয়া তাঁর ছবিটি সমরদা নিজের কালীঘাটের বাড়িতে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবাদে তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। সমরদা অনেকটা তাঁর পরিবারের সদস্যের মতো ছিলেন। সমর চক্রবর্তীর ব্লাড সুগার কত, এ খবরটি পর্যন্ত শ্যামাপ্রসাদ রাখতেন। শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে সমরদার ঘনিষ্ঠতা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়প্রাঙ্গণে প্রভূত প্রভাব প্রতিপত্তি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করেছিল। এই সমরদা আমাকে হাতে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপকদের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। আমাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত করেছেন। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে একদিন সকালে কালীঘাট স্টেশনে রেল লাইন পার হতে গিয়ে সমরদা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা যান। কেওড়াতলায় তাঁর শেষকৃত্যে ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত, ট্রেজারার অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সেনেটে তাঁর জন্য শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। একজন রিপোর্টারের পক্ষে এটি এক বিরল সম্মান।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোর্ট করার সুবাদে আমি শিক্ষাজগতের তিনজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছিলাম। তাঁদের অপরিমেয় স্নেহ, বিশ্বাস ও মমতা আমাকে এক নতুন জগতে নিয়ে গিয়েছিল। ওঁরা তিনজন হলেন ড. জিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী (ড. জে পি নিয়োগী নামে সমধিক পরিচিত), অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ। ড. নিয়োগী দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিন অব দি ফ্যাকাল্টি অব আর্টস' ছিলেন এবং অধ্যনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন অন্তত পঁচিশ বছর। এঁরা সকলেই জন্মেছেন ১৮৯৩ সাল থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে। ড. নিয়োগী ও অধ্যাপক সতীশ ঘোষ দু'জন দু'জনকে 'তুই' বলে ডাকতেন। কিন্তু জে পি নিয়োগী ও অধ্যাপক সত্যেন বসু উভয়ে উভয়কে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন।

আবার সত্যেন বসু ও সতীশ ঘোষ নিজেদের তুই-তোকারি করতেন। এঁরা দু'জনে উত্তর কলকাতায় একই পাড়ায় থাকতেন। সত্যেনবাবু থাকতেন ঈশ্বরী মিল লেনে ও সতীশবাবু থাকতেন গোয়াবাগান লেনে। এঁরা দু'জন একসঙ্গে মর্নিওয়াক করতেন হেদুয়ার আজাদ হিন্দ বাগে। ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত এঁরা দুজন আজাদ হিন্দ বাগের চারপাশে চক্কর দিতেন। সম্ভবত ১৯৫৪ সালে পরিকল্পনা কমিশন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের একটি বিশেষ সমীক্ষা চালানোর জন্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করে। সমীক্ষার বিষয় ছিল— দেশবিভাগ ও পূর্ববাংলার ১৯৫০-এর দাঙ্গার পর কলকাতা শহরে, নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মধ্যবিত্তের সংখ্যা কীভাবে বেড়েছে এবং সমাজের এই শ্রেণির লোকদের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন— তা দেখা। এই সমীক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে। তিনি ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের 'রিডার'। অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিষয়ে সদ্য এম এ পাশ করা কিছু ছেলেদের নিয়ে ড. সেন তাঁর সমীক্ষক দল তৈরি করলেন। প্রশ্নমালাও তিনি নির্বাচন করলেন। প্রশ্নমালায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে কোনও পুরুষ বা মহিলা তাঁর রুজি রোজগার ও জীবননির্বাহ সম্পর্কে কিছু বলার সময় সামাজিক কারণে নিজের নাম গোপন রাখতে চাইলে, তা পারবেন। এই সমীক্ষক দলের প্রায় সকলেই কম-বেশি আমার বন্ধু ছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন দেশে ও বিদেশে পরবর্তীকালে অধ্যাপক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছেন। এলাকা নির্বাচনের-ব্যাপারে ড. সেন ছাত্রদের উদ্বাস্তু অধ্যুষিত এলাকার ওপর বিশেষ জোর দিতে বলেন। এই সমীক্ষায় তখনকার বাঙালি জীবনের অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের নমুনা ধরা পড়ে। এই সমীক্ষা-রিপোর্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ পুস্তক আকারে প্রকাশ করেছিল। তবে কিছু কিছু তথ্যাদি গোপন রাখা হয়েছিল খুব সঙ্গত কারণেই। কিন্তু একটি তথ্য যা হৃদয়কে কেবল উদ্বেলিতই করে না, চোখে জল এনে দেয়, তা আমি আমার একজন সমীক্ষক বন্ধুর কাছ থেকে জেনেছিলাম। ওই তথ্যটি ছিল একজন শিক্ষিত উদ্বাস্তু মহিলা ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে। ব্যাপারটি ছিল এ রকম— ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় ঘরবাড়ি হারিয়ে এক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা তিনটি সন্তান নিয়ে এদিকে চলে আসেন। ঢাকা শহরে ওদের নিজেদের বাড়ি ছিল। ভদ্রলোক ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করতেন এবং ভদ্রমহিলা আই-এ পাশ ও ঢাকার একটি মেয়েদের স্কুলে পড়াতেন। কলকাতায় এসে তাঁদের জায়গা হল শিয়ালদা স্টেশন এলাকার এক হোগলার ছাউনিতে। ওদের তিনটি সন্তানের বয়স ১৫ থেকে ৮ বছরের মধ্যে। সরকারি ডোল (Dole) ও বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠনের সাহায্যে এদের দিন কাটছিল। এই অবস্থায় ভদ্রলোক অসুস্থ হয়ে ১৯৫২ সালে মারা যান। ভদ্রমহিলা দেখতে সুশ্রী ছিলেন এবং বয়স বছর ৩৪। একটি অবাঙালি সমাজসেবী সংগঠনের একজন মধ্যবয়সী স্বেচ্ছাসেবীর ভদ্রমহিলা উপর নজর পড়ে। অবাঙালি ভদ্রলোক তাঁকে ও তাঁর সন্তানদের জন্য কোথাও ঘরভাড়া করে থাকার প্রস্তাব দেন। ভদ্রমহিলা ওঁর বড়বাজারের ব্যবসার গদিতে একটি চাকরি চান। ভদ্রলোক রাজি হলেন। ভদ্রলোকের অর্থসাহায্যে ভদ্রমহিলা বেলেঘাটার একটি পাড়ায় দু'খানা ঘর ভাড়া নিলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে চুক্তি হল যে ওই ভদ্রলোক কখনওই কোনও অজুহাতে তাঁর খোঁজ করতে এ বাড়িতে অসবেন না কারণ, তিনি তাঁর সন্তানদের লেখাপড়া শেখাতে চান। বিশেষ করে সন্তানেরা যেন মা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ না করে। সে জন্যই এই ব্যবস্থা। ওই ভদ্রমহিলা আমার বন্ধু সমীক্ষককে অকপটে বলেছিলেন, ওই অবাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় কিন্তু ভদ্রলোক কখনওই তাঁর ওপর জুলুম করেননি এবং চুক্তিও ভাঙেননি। সমীক্ষককে তিনি এ-ও জানান যে তাঁর তিনটি সন্তানের মধ্যে একজন এম-এ পড়ছে। দ্বিতীয়জন কলেজে। ওই ভদ্রলোকের গদিতে কর্মচারি হিসাবে তাঁর নাম লেখা আছে এবং তিনি স্বাক্ষর দিয়ে মাইনের টাকা আনেন। এই তথ্যটি আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে 'জনসেবক' পত্রিকায় প্রকাশ করি। যদিও 'জনসেবক' খুবই ছোট কাগজ এবং প্রচার সংখ্যাও নগণ্য তা হলেও অধ্যাপক সত্যেন সেন এই লেখায় অস্বস্তি প্রকাশ করেন ড. জে পি নিয়োগীর কাছে। অধ্যাপক সেন চেয়েছিলেন ড. নিয়োগী যেন আমাকে ডেকে একটু বকে দেন। কিন্তু ড. নিয়োগী এরকম আরও কিছু তথ্য থাকলে সেগুলির কিছু গোপনীয়তা রক্ষা করে বড় কাগজে, বিশেষ করে ইংরেজি কাগজে বের করা যায় কি না তা অধ্যাপক সেনকে চিন্তা করতে পরামর্শ দিলেন।

ড. জে পি নিয়োগী খুব তেজি ও সাহসী মানুষ ছিলেন। রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ড. নিয়োগীকে তাঁর দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষতার জন্য ১৯৪৭ সালের শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিয়োগ করেন। অল্প কিছুদিনের জন্য তিনি কমিশনের চেয়ারম্যানের কাজও করেছিলেন। ওই সময় সম্ভবত ১৯৪৮ সালের কোনও এক সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে একটি নিয়োগের ব্যাপারে তাঁর মতপার্থক্য হয়। ড. রায় চেয়েছিলেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে দিয়ে কোনও একজন অফিসারের নিয়োগ রেগুলারাইজ (regularise) করিয়ে নিতে। কিন্তু ড. নিয়োগী

তাতে আপত্তি জানান এবং ফাইলে লিখিতভাবে বিরূপ মন্তব্য করেন। এই ঘটনার জন্যই তিনি কমিশনের কাজে ইস্তফা দিয়েছিলেন। পরিষদীয় নিয়ম অনুযায়ী পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ হয়ে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ সালের পি-এস-সি-র বিবরণী ১৯৫২-৫৩ সালে বিধানসভায় পেশ হল। বিরোধীপক্ষ পি এস সি-র বিবরণী থেকে উল্লিখিত ঘটনাটি তুলে মুখ্যমন্ত্রী ড. রায়ের তীব্র সমালোচনা করেন। বিরোধী সদস্যদের মধ্যে কেউ কেউ ড. নিয়োগীর লিখিত মন্তব্যগুলির উদ্ধৃতি দেন। এই সময় হঠাৎ ড. রায় বিধানসভায় উত্তেজিত হয়ে ড. নিয়োগী সম্পর্কে বলে ফেলেন, 'Am I to listen to the mad man?' খবরের কাগজে ডা. রায়ের এই মন্তব্য প্রকাশিত হল। পরের দিনই ড. নিয়োগী বিধানসভার স্পিকারকে এরূপ চিঠি দিলেন যে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিধানসভার গ্যালারি থেকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হোক। স্পিকার ড. নিয়োগীর ওই অনুরোধ নাকচ করে দিলে তিনি স্পিকারকে আর একটি চিঠি দিয়ে বলেন, 'I have been accused by the Chief Minister "a mad man" on the floor of the West Bengal Legislative Assembly. But I can assure the members that I have neither embazzled any public fund nor eloped with anybody's wife.' ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বেশ কয়েকবার ড. জে পি নিয়োগীর নাম উল্লেখ করেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে।

১৯৫৬ সালের প্রথমদিকে আমি বেশ কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোর্ট করতে যাইনি। ওই সময় ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইউ পি আই-এর সমর চক্রবর্তী আমাকে অফিসে ফোন করে বললেন, ড. নিয়োগী তোমায় না দেখে উদ্বিগ্ন। তুমি অবশ্যই দু'একদিনের মধ্যে দেখা করবে। আমি পরেরদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. নিয়োগীর কাছে গেলাম। উনি আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, অসুস্থ ছিলে নাকি? তারপর আমাকে চেয়ার টেনে ওঁর পাশে একেবারে গায়ের কাছে বসতে বললেন। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না কী ব্যাপার। এরপর তিনি টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি পোস্টকার্ড বের করলেন। পোস্টকার্ডটি হাতে নিয়ে আমাকে বললেন, 'এর মধ্যে রাখালের কাছে করে গিয়েছিলে?' আমি বললাম, 'মাস দুয়েক আগে স্যার।' খানিকক্ষণ নীরব থেকে তিনি বললেন, 'আগে তোমাকে ব্যাপারটা খুলে বলি। আমাদের department-এ একটি leave vaccency হচ্ছে। আমি রাখালের কথা ভাবছি। তোমার কী মনে হয়, গভর্নমেন্ট কলেজ ছেড়ে রাখালের ইউনিভার্সিটিতে আসা উচিত?' (ড. নিয়োগী যে রাখালের কথা বলছিলেন, তিনি অর্থনীতির খ্যাতনামা অধ্যাপক রাখাল দত্ত। ৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে অধ্যাপক রাখাল দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিষয়ের প্রধান হয়েছিলেন। ড. নিয়োগী জানতেন যে রাখাল ও আমি একসঙ্গে বহুদিন হস্টেলে ছিলাম এবং আমরা দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ড. নিয়োগী যে সময়ে এই কথাগুলি বলছিলেন, তখন রাখাল ঝাড়গ্রাম সরকারি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক)। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে জানতে চাইলাম, 'তা হলে কি রাখালকে আপনি অস্থায়ীভাবে আপনার ডিপার্টমেন্টে আনতে চাইছেন?' ড. নিয়োগী আমার মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিলেন, 'আপাতত তাই। তবে ওই vaccency স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' আমি একপলক এভাবে ভেবে নিলাম, যে-বিভাগে ড. জে পি নিয়োগী প্রধান, সেই বিভাগের অন্তত দেড় বছরের অধ্যাপনার অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষের যে কোনও কলেজে বা অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা পরিষদে চাকরি পাওয়া খুব কঠিন হবে না। পরক্ষণেই আমি ড. নিয়োগীকে বললাম, আমি রাখালকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসতে বলব। এবার তিনি পোস্ট কার্ডটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার যে কথা হল, এটা তুমি রাখালকে এই পোস্টকার্ডে লেখ।' আমি সংক্ষেপে গুছিয়ে লিখলাম। পোস্টকার্ডটি ড. নিয়োগী আমার হাত থেকে নিয়ে কয়েকবার পড়লেন। এরপর তিনি বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'ড. বসুকে গিয়ে বল আমার ঘরে আসতে।' ড. বসু অর্থাৎ ড. সরোজকুমার বসু, তখন কমার্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান এবং অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপকদের মধ্যে দু'নম্বর। ড. সরোজ বসু ঘরে ঢুকতেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ড. বসু আমাকে দেখেই বললেন, 'এই তো ড. নিয়োগী তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন।' আমি বুঝে নিলাম রাখালের বিষয়ে এবং সেই সঙ্গে আমাকে নিয়েও তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। ড. নিয়োগী রাখালকে লেখা আমার পোস্টকার্ডটি ড. সরোজ বসুর হাতে তুলে দিলেন। ড. সরোজ বসু সরাসরি আমার কাছে জানতে চাইলেন আমি মাঝে মাঝে ঝাড়গ্রামে যাই কি না। আমি তাঁকেও বললাম, মাস দুয়েক আগে গিয়েছিলাম। এবার তিনি ড. নিয়োগীকে বললেন, 'সুখরঞ্জন ঝাড়গ্রামে চলে যাক এবং রাখালের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এসে আপনাকে রিপোর্ট করুক। এ কথা বলে ড. সরোজ বসু পোস্টকার্ডটি ছিঁড়ে বাজে কাগজের টুকরিতে ফেলে দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ড. নিয়োগী ড্রয়ার খুলে মানিব্যাগ বের করে দু'খানা দশ টাকার নোট আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি বললাম, 'টাকা দিয়ে কী হবে স্যার?' তিনি বললেন, 'তোমার যাতায়াতের খরচ আছে তো।' আমি টাকা নেব না, আর ড.

নিয়োগী আমাকে টাকা দেবেনই। এই অবস্থায় সরোজবাবু হেসে ড. নিয়োগীকে বললেন, 'আপনি টাকা নিতে ওকে পীড়াপীড়ি করবেন না। ওর অস্বস্তি হচ্ছে।' ড. নিয়োগী বললেন, 'ও তো আমার সন্তানের মতো।' সরোজবাবু ড. নিয়োগীকে বললেন, 'সন্তানের অনুভূতিকে আপনি আদৌ উপেক্ষা করছেন কেন?' ড. নিয়োগী 'তা হলে থাক' বলে নোট দু'খানা ড্রয়ারে রেখে দিলেন। এ ভাবে রাখাল দত্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে যোগ দিলেন ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। এ দিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ রাখাল দত্তের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করতে রাজি হল না। ওই সময়ে পড়াশোনায় ভাল ছেলেরা প্রায় সকলেই আই এ এস, আই এফ এস ও আই পি এস-এ চাকরি পেতে অনেক বেশি আগ্রহী ছিল। রাখালের রিলিজ অর্ডার বের করার জন্য আমি শিক্ষাবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক সনৎ বসুর কাছে গেলাম। (অধ্যাপক সনৎ বসু প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।) সনৎবাবু খুব ভাল মানুষ। তিনি রাখালকে ছাড়তে রাজি। কিন্তু সেকশন অফিসার ও অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি একেবারে অনড়। তাঁরা বিকল্প কাউকে না পেলে ঝাড়গ্রাম কলেজ থেকে রাখাল দত্তকে ছাড়তে রাজি নয়। সনৎ বসু উলটে আমাকেই বললেন, 'দু'একটা ভাল ছেলের নাম দিতে পার? সরাসরি appointment হবে। পি এস সি-তে যেতে হবে না।' আমি ও রাখাল যুক্তি করে বিকাশের বাড়ি গেলাম (বিকাশ অর্থাৎ বিকাশকলি বসু, যিনি আই পি এস হয়ে পুলিস কমিশনার ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ডিরেক্টর জেনারেল হয়েছিলেন)। বিকাশ তখন থাকে অশ্বিনী দত্ত রোডে। বিকাশ ইউ পি এস সি-র পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু তখন ওর একটি চাকরির প্রয়োজন ছিল। বিকাশ সনৎ বসুর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হল। বিকাশ খুব দ্রুত ঝাড়গ্রাম কলেজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের appointment পেল। গ্রীষ্মের ছুটির আগেই যাতে রাখালের রিলিজ অর্ডার সরকারের কাছ থেকে আদায় করা যায় সে জন্য আমি রাইটার্স বিল্ডিং-এ তদ্বির অব্যাহত রাখলাম। ইতিমধ্যে রাখাল অধ্যাপক সত্যেন সেনের কাছ থেকে অধ্যাপক সনৎ বসুর নামে একটি চিঠি লিখিয়ে নিল। সনৎ বসুকে লেখা সত্যেন সেনের চিঠির প্রারম্ভিক লাইনটি আজও আমার মনে আছে:

"প্রীতিভাজনেষু

সনৎ, গাছ বড় হইলে তাকেই বেশি ঝড়-ঝাপটা সইতে হয়। একথা মনে রেখেই তোমার দ্বারস্থ...।' সনৎবাবু ও সত্যেন সেন কলেজে একসঙ্গে পড়তেন। ছাত্রজীবনে দুজনের মধ্যে খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল। যা হোক শেষপর্যন্ত গরমের ছুটির আগেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাখালকে রিলিজ দিলেন এবং বিকাশও গ্রীষ্মের ছুটির আগেই ঝাড়গ্রামে সরকারি কলেজের বুড়ি ছুঁয়ে এল।

ওই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। ১৯৫৮ সালের গোড়ার দিকে রাখাল যে vaccencyতে এসেছিল সেটিকে পাকাপাকি স্থায়ী করল বিশ্ববিদ্যালয়। বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ড. নিয়োগী প্রস্তাব দিলেন যে রাখাল দত্ত রাজ্য সরকারের এডুকেশন সার্ভিসে থাকলে তার মাইনে, পি এফ এবং তাঁর অন্যান্য আর্থিকসুবিধা হত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসার ফলে তার যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত তা পূরণ করে দেওয়া। প্রস্তাবটি নিয়ে ড. নিয়োগী ট্রেজারার অধ্যাপক সতীশ ঘোষের কাছে গেলেন। সতীশবাবু ড. নিয়োগীকে বললেন, 'তোর কী ইচ্ছা বলে ফেল।' ড. নিয়োগী বললেন, 'আমি রাখালের জন্য চারটি ইনক্রিমেন্টের প্রস্তাব করছি' সতীশ ঘোষ ড. নিয়োগীকে বললেন, 'সিন্ডিকেটে তুই চারটি ইনক্রিমেন্টের কথা বলবি। আমি রেগে গিয়ে বলব না, হবে না। দুটোর বেশি ইনক্রিমেন্ট দেওয়া যাবে না। তারপর তোর সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে, শেষে তিনটি ইনক্রিমেন্ট রফা হবে।' কিন্তু সিন্ডিকেটে এক বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটল। সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে ভাইস চ্যান্সেলার কিছু বলেন না। বিভাগীয় প্রধান ও ট্রেজারারের মতামতই তিনি মেনে নেন। কিন্তু অধ্যাপক রাখাল দত্তের ক্ষেত্রে ভাইস চ্যান্সেলার নির্মল সিদ্ধান্ত একটির বেশি ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হবে না বলে রায় দিলেন। ড. নিয়োগীর সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলারের কথা কাটাকাটি হল। ফুল্ল ড. নিয়োগী অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্তকে বলেছিলেন যে ১৯৩০ সাল থেকে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। তাঁর কোনও সুপারিশই এযাবৎ কোনও ভাইস চ্যান্সেলার নাকচ করেননি। এটাই প্রথম ব্যতিক্রম। এটার জের ধরে প্রায় তিন বছ বাদে আর একটা অভাবনীয় ঘটনা। ১৯৬০ সালের শেষ নাগাদ অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্তকে ভারত সরকার পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যপদে নিয়োগ করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি থেকে তাঁর বিদায়ের দিন আসন্ন। তখন অর্থনীতি বিভাগ বি টি রোডে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাগান বাড়ি 'এমারেল্ড বাওয়ার' (Emereld Bower) -এর একাংশে চলে গিয়েছে। একদিন অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত কাউকে আগে থেকে কিছু না জানিয়ে বি টি রোডের বাড়িতে চলে গেলেন। দারোয়ানরা হঠাৎ ভাইস চ্যান্সেলারকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে দোতলায় গিয়ে বিভাগীয় প্রধান ড. জে পি নিয়োগীকে খবর দিল। ড. নিয়োগী ভাইস চ্যান্সেলারকে তাঁর ঘরে স্বাগত জানালেন। ওই সময়কার দুজন বিশিষ্ট বাঙালি

ব্যক্তিত্ব মুখোমুখি। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত কোনও ভূমিকা না করে ড. নিয়োগীকে বললেন, 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।' ড. নিয়োগী প্রস্তুতভাবে প্রশ্ন করলেন, 'কেন, কী হয়েছে?' ভাইস চ্যান্সেলার বললেন, 'রাখাল দত্তের বেতন কাঠামো স্থির করার ব্যাপারে আমার কাজটা ঠিক হয়নি। আমি রাখালের কাছেও ক্ষমা চাইব।' ড. নিয়োগী আবেগ আপ্লুত। তিনি অধ্যাপক রাখাল দত্তকে ক্লাস থেকেই ডেকে পাঠালেন। রাখাল ঘরে ঢুকতেই নির্মল সিদ্ধান্ত রাখালের হাত ধরে বললেন, 'তুমি দুঃখ করো না। আমি অনুতপ্ত হয়ে এসেছি।' রাখাল বিস্ময়বিমূঢ়। রাখাল ক্লাসে ফিরে গেলে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ড. নিয়োগীকে শোনালেন তিনি ভাইস চ্যান্সেলারের বিশেষ ক্ষমতাবলে অধ্যাপক রাখাল দত্তকে দুটি স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট মঞ্জুর করেছেন। ড. জে পি নিয়োগীর কাছে গিয়ে অকপটে নিজের ভুল স্বীকার এবং অধ্যাপক রাখাল দত্তের প্রতি অবিচারের সংশোধন করে অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত তাঁর চরিত্রের মহানুভব দিকটি উন্মোচন করেছেন। বর্তমান প্রজন্মের বাঙালিরা অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯২০/২২ সাল থেকে যে কয়েকজন বাঙালি বাংলার ভৌগোলিক সীমানার বাইরে পশ্চিম ও উত্তর ভারতে গিয়ে নিজেদের প্রতিভার দাপটে দেশের শিক্ষাজীবনে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন, নির্মল সিদ্ধান্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত তাঁর অধ্যাপনা জীবনের বেশির ভাগ দিন কাটিয়েছেন এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর সহপাঠী এবং ওই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর একসময়কার সহকর্মী আর এক বাঙালি মনস্বী পণ্ডিত অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তার স্মৃতিকথায় 'মনে পড়ে') নির্মলবাবুর প্রতিভা ও তাঁর বিদগ্ধচিত্তের বিষয়ে অনেক কথা লিখে গিয়েছেন। ধূর্জটিবাবু লিখেছেন যে তিনি 'সারা জীবনে নির্মলের মত 'প্রিসাইজ' মনের মানুষ আর একটিও' দেখেননি। সমসাময়িক ভারতবর্ষের শিক্ষাজীবন ও শিক্ষাসমস্যা ছিল নির্মল সিদ্ধান্তের নখদর্পণে। এই কারণেই ১৯৪৪/৪৫ সালে ভারত সরকার ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন তাতে অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত নিযুক্ত হয়েছিলেন এই কমিশনের সদস্যসচিব। ওই শিক্ষা কমিশনের পুরো রিপোর্টটি ছিল নির্মলবাবুর নিজের হাতে লেখা। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের এই রিপোর্টটিকে সেই সময় বলা হত জাতীয় শিক্ষার 'নয়া টেস্টামেন্ট'।

কলকাতা থেকে দিল্লি চলে যাওয়ার আগে ঘটনাচক্রে একজন বিশ্বাত ভারতীয় সাংবাদিকের সঙ্গে নির্মল সিদ্ধান্তের কাছে গিয়েছিলাম। ওই সময়টা ভারতের শিক্ষাজীবনের খুব দুঃসময় ছিল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য ভাইস চ্যান্সেলার ও বিশ্বাত অর্থনীতিবিদ ড. বি এন গাঙ্গুলিকে ছাত্ররা প্রায় ১৮ ঘণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ঘেরাও করে রাখল। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্ররা ছাত্রীদের নির্বিচারে পেটাল এবং তারপর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অবস্থিত ছাত্রীদের হস্টেল আক্রমণ করল। তাদের বেইজ্জতি ও বিবস্ত্র করে জামাকাপড় বাইরে এনে আগুন ধরিয়েছিল। ভাইস চ্যান্সেলার দেশের অন্যতম সমাজবাদী চিন্তানায়ক আচার্য নরেন্দ্র দেব আমরণ অনশন শুরু করলেন। আচার্য কৃপালনি ছুটে গেলেন লক্ষ্ণৌতে। অশ্রুযুক্ত কণ্ঠে তিনি ছাত্রদের বললেন, 'তোমরা এভাবে আমাদের কন্যাদের অপমান করে রাজ্য ঘরে ফেরত পাঠিয়ে দিও না!'এসব ঘটনার প্রেক্ষাপটে The Statesman পত্রিকা দেশের বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অশান্ত অবস্থা নিয়ে এক বিশদ সমীক্ষা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এই সমীক্ষা লেখার দায়িত্ব পেলেন ভারতীয় সাংবাদিকতার এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব চঞ্চল সরকার। তিনি তখন দিল্লিতে 'স্টেসম্যান' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। এটি ১৯৬০-এর শেষে কিংবা ১৯৬১ সালের একেবারে গোড়ার কথা। আমি তখন 'জনসেবক' পত্রিকা ছেড়ে 'যুগান্তর' পত্রিকায় যোগ দিয়েছি। চঞ্চলদা আমাকে চিঠি দিলেন। এই কাজের জন্য আমাকে তাঁর সঙ্গে কয়েক জায়গায় যেতে হবে। আমি ছোট কাগজে কাজ করার সময় থেকে তিনি আমাকে এত স্নেহ করতেন যে তাঁর অনুরোধ আমাকে রাখতে হত। চঞ্চলদার সঙ্গে বিভিন্ন ছাত্রনেতার সঙ্গে দেখা করলাম। কয়েকজন শিক্ষাবিদের সঙ্গেও তিনি দেখা করলেন। ড.জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের বিখ্যাত সমীক্ষা 'Calcutta Students, how they live and how they read'-এর একটি কপি সংগ্রহ করলাম। (ড. ঘোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার থাকার সময় ওই সমীক্ষা করিয়েছিলেন)। সবশেষে চঞ্চল সরকার অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্তের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। নির্মলবাবু চঞ্চল সরকারকে খুব ভাল চিনতেন। দ্বারভাঙা বিল্ডিং-এ ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরে ঢুকতেই নির্মল সিদ্ধান্ত চঞ্চল সরকারকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করলেন। চঞ্চলদা আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ওকে তো আপনি চেনেন।' নির্মল সিদ্ধান্ত একটু অম্ল হেসে বললেন, 'তা চিনি, কিন্তু এখন তো আর ওকে সেনেটের মিটিংয়ে দেখছি না।' জবাবটা চঞ্চলদাই দিলেন, 'ও ছোট কাগজ থেকে এখন বড় কাগজে চলে গিয়েছে।' এ কথা বলে তিনি কাগজের নাম বললেন।

এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চঞ্চল সরকার নির্মল সিদ্ধান্তকে শিক্ষাসমস্যা ও ছাত্ররাজনীতি নিয়ে অনেক প্রশ্ন

করেছিলেন। চঞ্চল সরকারের একটি প্রশ্ন আজও আমার কানে বাজে। প্রশ্নটা ছিল— দেশের ছাত্ররাজনীতি ও ছাত্রআন্দোলন কি ছাত্ররাই নিয়ন্ত্রণ করে? একেবারে দ্বিধাহীন কণ্ঠে অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্তের উত্তর ছিল, 'Perhaps not।' এই সমীক্ষা অনেকগুলি কিস্তিতে সে সময় 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এই সমীক্ষা রিপোর্ট পুস্তিকাকারে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটি প্রকাশ করে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে এত ভাল সমীক্ষা আমি আর কখনও দেখিনি।

অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত যোজনা কমিশনের সদস্য হিসাবে যোগ দিয়ে নয়া ওড়িশার স্থপতি বিজু পট্টানায়েককে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। তারই সুপারিশে নয়া রাজধানী ভুবনেশ্বরের জন্য ও পারাদ্বীপ বন্দর গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সাহায্য বরাদ্দে সহায়তা করেছিল। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে অথবা ১৯৬২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি নাগাদ নির্মল সিদ্ধান্ত কটক বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ভাষণ দেওয়ার জন্য মৃখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়কের সঙ্গে কটকে আসেন। পরদিন সকালে তাঁবে সমাবর্তন প্রাঙ্গণে নিয়ে যেতে বিজু পট্টনায়কে অতিথিভবনে আসেন। কিন্তু তখনও নির্মলবাবু নিদ্রামগ্ন। অনেক ডাকাডাকির পর পুলিস ও মন্ত্রীরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত শয্যায় চিরনিদ্রায় শায়িত। যে বিজু পট্টনায়কে জীবিত নির্মল সিদ্ধান্তকে দিল্লি থেকে কটক নিয়ে এসেছিলেন, সেই বিজু পট্টনায়কই নির্মল সিদ্ধান্তের মৃতদেহ নিয়ে দিল্লি ফিরে গেলেন। বিজু পট্টনায়কে যখন নির্মলবাবুর দেহ নিয়ে তাঁর বাড়িতে গেলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল সেখানে উপস্থিত। এর কয়েকদিন পরে চঞ্চল সরকার স্টেটসম্যান পত্রিকায় তাঁর Speaking Generally কলমে বিষাদের সঙ্গে লিখলেন, 'Death again played its upredictable tricks on professor Nirmal Kumar Siddhanta...'

ড. জে পি নিয়োগীর সঙ্গে অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্তের ভুল বুঝোবুঝির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নির্মল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেক কথাই বলে ফেললাম। কারণ নির্মল সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর এক স্মরণীয় বাঙালি ব্যক্তিত্ব। ড. নিয়োগী সম্ভবত ১৯৬১ সালের গোড়াতেই অর্থনীতি বিভাগের প্রধান পদ থেকে অবসর নিলেন। তাঁর অবসর নেওয়ার আগে একেবারেই মনের তাগিদে ওঁর কাছে গিয়েছিলাম। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'এবার বলতে পার, আমার একেবারেই ছুটি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসে তিন বছরের স্টাডি লিভে বিলেত গিয়েছিলাম পিএইচ ডি করতে। তারপর থেকে আর কোনওদিন ছুটি নেইনি।' এর কিছুদিন পর সম্ভবত ১৯৬৩ সালে একদিন সকালে গড়িয়াহাটের দিকে যাচ্ছি। বাসে বসে দেখতে পেলাম ড. নিয়োগী ফুটপাথ দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছেন। তিনি বালিগঞ্জ প্লেসে থাকতেন। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে দৌড়ে ড. নিয়োগীকে ধরলাম। পেছন থেকে স্যার বলে ডাকতেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রণাম করতেই তিনি সস্নেহে বললেন, 'তুমি এত সকালে এই রাস্তায়?' আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'আপনি তো উত্তর কলকাতা ছেড়ে দিয়েছেন তাই।' আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ঠিক তাই। আমার যে অস্টিন গাড়িটা দেখতে, সেটা বিক্রি করে দিয়েছি।' আমি জানতে চাইলাম, 'কেন স্যার?' তিনি জবাবে বললেন, 'গাড়িটা থাকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে ইচ্ছে করবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া মানে সতীশের (সতীশচন্দ্র ঘোষ) কাছে বসে আড্ডা, কিছুটা পরচর্চা, কিছুটা রাজনীতি। আবার তা নিয়ে অন্যদের সমালোচনা। এসব থেকে দূরে থাকতেই গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি।' মৃত্যুর আগে ড. নিয়োগী তাঁর বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি ও সংলগ্ন কয়েক কাঠা জমিসহ তাঁর স্থাবর সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে উইল করে গিয়েছিলেন।

আমি আগেই বলেছি যে 'জনসেবক' পত্রিকায় কাজ করার সময় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত খবর বিশেষ করে সেনেটের মিটিং রিপোর্ট করা আমার রুটিন কাজের মধ্যে ছিল। সেনেটের মিটিং সাধারণত বেলা সাড়ে তিনটের পর শুরু হত। দু'ঘণ্টা তো বটেই কখনও কখনও তিন ঘণ্টা পর্যন্ত মিটিং চলত। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তখন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক। আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর পদটিকে বলা হত, 'খয়রা প্রফেশর অফ ফিজিক্স (Khaira Professor of Physics)। একটানা প্রায় চার বছর সেনেট মিটিং রিপোর্ট করার সময় অধ্যাপক বসুকে কখনওই সময় মেনে সেনেট সভায় উপস্থিত হতে দেখিনি। সার্কুলার রোডে বিজ্ঞান কলেজ থেকে তাঁর আসতে সর্বদাই কম করে একঘণ্টা দেরি হয়। তিনি সবসময়েই একেবারে পেছনের সারিতে রিপোর্টারদের পাশে বসে পড়তেন, রিপোর্টারদের প্রশ্ন করতেন, 'কোনও চেঁচামেচি হয়েছে? কী নিয়ে হয়েছে?' ইত্যাদি। সেনেটের মিটিং রিপোর্ট করতে তিন-চারজনের বেশি রিপোর্টার কখনওই উপস্থিত থাকত না। আমি সবসময়েই একেবারে পেছনের সারিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসতাম। অধ্যাপক সত্যেন বসু এসেই আমার পাশের চেয়ারটাতে দু'হাত ছড়িয়ে বসতেন। তাঁর বাঁ-হাতটা আমার কাঁধ ছুঁয়ে আমার চেয়ারের ওপর আশ্রয় নিত। সেনেটের সভায় সদস্যদের জন্য বরাদ্দ ছিল দুটো বড় চ্যাপ্টা ধরনের কড়া পাকের সন্দেশ, দুটো ব্রিটানিয়া বিস্কুট ও এক কাপ চা। এটা সাধারণত সভার মাঝপথে দেওয়া হত।

সত্যেন বসু যত দেরিতে আসুন না কেন, তাঁর বরাদ্দ চাপরাশিরা তাঁকে দেখামাত্র টেবিলে নিয়ে অসতেন। তাঁকে চিনি ছাড়া চা দেওয়া হত। এবং তাঁর বরাদ্দ সন্দেশদুটো তিনি প্রতি সভায় আমার হাতে তুলে হেসে বলতেন, 'তোর ব্লাড সুগার হতে অনেক দেরি।' আমার কাজ ছিল, তিনি সভায় হাজির হওয়ার আগে কী কী হয়েছে, তার একটা সারাংশ তাঁকে বলে দেওয়া। এভাবে এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত মানুষটি আমাকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধেছিলেন।

সেই সময় আমার কর্মস্থল ও বাসস্থল একই জায়গায় এবং সেটা সত্যেন বসুর বাড়ির কাছেই বিডন স্ট্রিটে, তা তিনি জানতেন। অধ্যাপক সত্যেন বসু ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ দুজনেই ছাত্রজীবন থেকে বন্ধু। দুজনেই একই পাড়ায় থাকতেন। সত্যেন বসু থাকতেন গোয়াবাগানের ঈশ্বরী মিল লেনে। আর সতীশ ঘোষ থাকতেন গোয়াবাগান লেনে। দুজনেই একসঙ্গে মর্নিংওয়াক করতেন হেদুয়া পার্কের চারপাশ ঘুরে, পার্কের ভেতর ঢুকতেন না। পার্কের চারপাশে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতেন। তখন হেদুয়া পার্ক অর্থাৎ আজাদ হিন্দ বাগ-এর চারপাশে লোহার রেলিং ছিল এবং পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে অনেকগুলি গেট ছিল। সত্যেন বসু প্যান্ট ও ঢোলা ফুল শার্ট গায়ে একটা লাঠি নিয়ে চলতেন। সতীশ ঘোষ পাটভাঙা ধুতি ও পাঞ্জাবি গায়ে চলতেন। সতীশবাবু তাঁর হাত দুখানা পেছনে রেখে হাঁটতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এই ভঙ্গিতে চলতেন। দুজনে হাঁটতেন ও সবসময়ে কথা বলতেন, মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠতেন। আমি কখনও কখনও সকালে তাঁদের মর্নিংওয়াকের সময় অনুসরণ করতাম। একবার ওঁদের পেছনে আমার দূরত্বটা বেশ কমে গিয়েছিল। সতীশ ঘোষ ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে নিলেন। পরক্ষণেই বললেন, 'এই ছোঁড়া এত কাছে আসবি না। আমাদের কথাবার্তা তোর শোনা একেবারেই নিষিদ্ধ।' সত্যেন বসু হেসে লাঠিটা পেছনে ঠেলে বুঝে নিতে চাইলেন আমার সঙ্গে ওঁদের দূরত্ব কতখানি। এক পয়লা জানুয়ারির সকালে বিডন স্ট্রিটের উত্তরদিকে ফুটপাথ ধরে হেদুয়ার দিকে যাচ্ছিলাম। সত্যেন বসু ও সতীশ ঘোষ স্কটিশ চার্চ কলেজের পেছন দিকে বিডন স্ট্রিট পার হতেই আমি ওঁদের সামনে পড়ে গেলাম। সতীশ ঘোষ আমাকে দেখেই সত্যেন বসুকে বললেন, 'তোর ভায়দুত এসে পড়েছে।' সত্যেন বসু লাঠির ধরার জায়গা দিয়ে আমাকে খোঁচা মেরে বললেন, 'সাতসকালে কোথায় চললি?' ওঁদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গোবর ঘোষের কৃত্তির আখড়া পর্যন্ত অসতেই সতীশ ঘোষ ডানদিকের রাস্তা ধরে তাঁর বাড়ির দিকে চললেন। বাঁদিকের রাস্তায় সত্যেন বসুর বাড়ি। আমি ওঁর সঙ্গে হাঁটছি। ওঁর বসার ঘরে একজনকে দেখে আমার বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রইল না। যাঁকে দেখলাম তিনি বিখ্যাত কমেডিয়ান অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সত্যেন বসু ঘরে পা দেওয়া মাত্র ভানু হাঁটু গেড়ে বসে ওঁকে প্রণাম করলেন। হাতে তুলে দিলেন এক লাল গোলাপের তোড়া। আমার চোখে মুখে বিস্ময় দেখে সত্যেন বসু আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন বুঝলি।' উনি বলামাত্র আমিও ওঁকে প্রণাম করলাম। আমাকেও বসতে বলে তিনি পোশাক বদলাতে ভেতরে চলে গেলেন। আমি ভানুবাবুর দিকে তাকিয়ে আছি, কারণ আলাপ হয়নি। এই সময়েছয় সাত বছরের একটি মেয়ে ভানুর কাছে এসেই থিলখিল করে হেসে উঠল। বুঝে নিলাম মেয়েটি সত্যেন বসুর নাতনি এবং সে ভানুকে চেনে। মিনিট দশেক পরে সত্যেন বসু প্যান্টের ওপর গায়ে একটা ফতুয়া চাপিয়ে বসার ঘরে এলেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভানু আমার ঢাকার ছাত্র। সিনেমা করছে বলে ওকে হ্যালাফ্যালা করবি না, ভানু ফিজিক্সের খুব ভাল ছাত্র।' ভানু খুব লাজুক মুখ করতে নাতনি আবার হেসে কুটিপাটি। একটু পরেই সত্যেন বসু আবার বললেন, 'জানিস, ভানুই ঢাকা থেকে আমার জন্মদিন পালন করার ব্যাপারটা শুরু করল। ভানু থাকত ঢাকার বুড়িগঙ্গার ধারে বাদামতলি ঘাটের কাছে। সেখান থেকে পয়লা জানুয়ারির ভোরে সাইকেল চালিয়ে রমনায় আমার বাড়িতে চলে এসে জানান দিত যে আজ আমার জন্মদিন।' ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় ভরে গিয়েছিল। সেদিনই প্রথম জানতে পারলাম যে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম দিন ১৮৯৪ সালের পয়লা জানুয়ারি।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সাধারণভাবে আমরা বিজ্ঞান সাধক বলেই জানি। অনেকেই বোধ হয় জানেন না সত্যেন বসু একবারে প্রথম শ্রেণির সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি খুব ভাল এস্রাজ ও বেহালা বাজাতে পারতেন। জন্মদিনেরে সন্ধেয় যাঁরা তাঁর বাড়িতে যেতেন তাঁদের অনেকেরই তাঁর বাজনা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যচর্চায় তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি 'বীরবল' প্রমথনাথ চৌধুরির 'সবুজপত্র'-এর আসরের নিয়মিত সভ্য ছিলেন। প্রমথ চৌধুরির সেক্রেটারি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'চলমন জীবন' গ্রন্থে সত্যেন বসুর জীবনের প্রায় অজানা এই দিকটিকে তুলে ধরেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য যে কমিটি গঠন করেছিলেন, তাঁর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কথা বলার ভঙ্গি ও হিউমার বোধ ছিল অপরিসীম। ১৯৫৪ সালে আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু মুকুলকে নিয়ে ওঁর কাছে যেতে হয়েছিল। পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক

হিসাবে তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডিন অব দি ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স'। মুকুল প্রেসিডেন্সি কলেজে কেমিস্ট্রি নিয়ে বি এসসি পড়ার সময় নিদারুণ যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তার তাঁর চলাফেরা পড়াশোনা বন্ধ করে দিলেন। তখন পর্যন্ত স্ট্রেপটোমাইসিন বাজারে আসেনি। তারপর ১৯৫২ সালে ওই ওষুধের গুণে সে নিরাময় হয়। মুকুল খুবই ভাল ছাত্র ছিল। কিন্তু অসুখের জন্য সে বি এসসি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেল না। এম এসসি-তে এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি পড়বার জন্য দরখাস্ত করল। কিন্তু নাম উঠল 'পিওর কেমিস্ট্রি'-র তালিকায়। একদিন সত্যেন বসু মর্নিংওয়াক থেকে ফিরছেন। বিডন স্ট্রিট ও গোয়াবাগানের মুখে দাঁড়িয়ে থেকে ওঁকে ধরলাম। সঙ্গে মুকুল। মুকুলের কথা স্যারকে বললাম। সব শুনে উনি বললেন, 'কেন পিওর কেমিস্ট্রি তো ভাল সাবজেক্ট রে। তবে শোন, তোদের একটা ঘটনা বলছি। এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি খোলার পর প্রথম বছর বেশ কয়েকটি ছেলে ফার্স্ট ক্লাস পেল। কিন্তু কাজকর্ম পাচ্ছে না বলে দু-তিনটি ছেলে আমার কাছে এল। আমি ওদের একটা নামী ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানির ঠিকানা দিয়ে দরখাস্ত করতে বললাম। ওদের সামনেই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে ফোন করলাম। ওই ব্যাটা স্কুলে আমার সঙ্গে পড়ত। পড়াশোনা বেশি দূর করেনি। বাবা ওই ব্যবসার লাইনে খুব নামকরা লোক ছিলেন। এখন ছেলে বাপের ব্যবসা দেখছে। মাস দুয়েক পর ছেলেগুলো আবার আমার কাছে এল। ওদের ইন্টারভিউতে পর্যন্ত ডাকেনি শুনে আমি খুব বিস্মিত হলাম। ওদের সামনেই আমি মালিককে ফোন করলাম। মালিক যে আমার স্কুল সহপাঠী ছিল, সে আমাকে কী বলল জানিস! আমাকে ব্যাটাচ্ছেলে বলল, 'কয়েকটা পিওর কেমিস্ট্রির ছেলের দরখাস্ত পেয়েছি, আর পাঠানো ছেলেদের দরখাস্ত পেয়েছি। ভেবে দেখলাম একই মাইনে যখন দেব, তখন আর এপ্লায়েড কেন নেব? 'খাঁটি' ছেলেগুলোকে নিয়ে নিয়েছি।' আমি ওকে গাধা বলে ফোনটা ছেড়ে দিলাম। এরপরও কী তুই এপ্লায়েড কেমিস্ট্রি পড়তে চাস?' বলে সত্যেন বসু মুকুলের দিকে তাকালেন। আমরা তখন দুজনেই হাসছি। শেষপর্যন্ত মুকুল পিওর কেমিস্ট্রিতে এম এসসি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল।

১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ এই পাঁচ বছরে আমি সেনেটের যতগুলি সভা রিপোর্ট করেছি তার মধ্যে মাত্র একদিন সত্যেন বসুকে সেনেটের সভার নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হতে দেখেছি। ওই বিশেষ দিনটিতে সত্যেন বসু সভা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজির হওয়ার আমি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'কি রে খুব ঘাবড়ে গেছিস মনে হচ্ছে?' একটু পরেই ওঁর ঠিক সময়ে আসার কারণটা বুঝতে পারলাম। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯০১/০২ সাল পর্যন্ত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসার কোনও সর্বনিম্ন বয়স বেঁধে দেওয়া ছিল না। এর ফলে অনেক প্রতিভাবান ছেলে (যেমন মনীষী হরিনাথ দে) সাড়ে তেরো বছরে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। কিন্তু পরে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের সর্বনিম্ন বয়স ১৪ বছরে বেঁধে দেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন, তখনও তাঁর বয়স তেরো বছর পূর্ণ হয়নি। হেড মাস্টার মহাশয় তাঁর পিতৃদেবকে ডেকে বললেন, 'আপনার ছেলেকে এ বছর Sent up করা যাবে না, কারণ ওর বয়স ১৪ বছর হয়নি।' অগত্যা পিতৃদেব সত্যেনের আবদার মতো ছেলের বয়স এক বছর বাড়িয়ে দিলেন। নিয়ম মতো ওই বর্ধিত এক বছরই সত্যেন বসুর প্রকৃত বয়স হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেকর্ডভুক্ত হয়ে রইল। তাঁর আসল বয়সটা রয়ে গেল তাঁর জন্মকুণ্ডলীতে, যার কোনও আইনগত মূল্য নেই। সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বয়স বাড়ানোর ঘটনাটি উল্লেখ করে জন্মকুণ্ডলীর বয়সকে প্রকৃত বয়স বলে গণ্য করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেছিলেন। ওই দিনের সেনেটের আলোচ্যসূচিতে তাঁর ওই আবেদনপত্রটির বিষয় নথিভুক্ত হচ্ছিল। এ জন্যই তিনি সেদিন যথাসময়ে সেনেটের সভায় হাজির হয়েছিলেন। সত্যেন বসু তাঁর আবেদনপত্রের সমর্থনে তাঁর ওই ছিমপত্র জন্মকুণ্ডলী থেকে তাঁর জন্মের সময়, নক্ষত্রের অবস্থান, রাশিলগ্ন পাঠ করে সদস্যদের শোনাতে লাগলেন। তখন ভাইস চ্যান্সেলার ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী এবং তাঁরা উভয়েই একই বছরে ম্যাট্রিক পাস করেছেন। সেনেট সদস্যরা সকলে একবাক্যে বললেন, আইনগতভাবে জন্মকুণ্ডলীর বয়স গ্রাহ্য নয়। গ্রাহ্য হল ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটের বয়স। এর ব্যতিক্রম করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া ঘটবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সত্যেন বসু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গালে হাত দিয়ে সদস্যদের বক্তৃতা শুনছেন। আলোচনা শেষে ভাইস চ্যান্সেলার ড. জ্ঞান ঘোষ গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়ালেন এবং আবেগের সঙ্গে বললেন, 'সত্যেন বসুর মতো অধ্যাপক কী করে এ কথা ভাববেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ৬০ বছর বয়সেই অব্যাহতি দেবে। শুধু কলকাতা কেন দেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কী একথা চিন্তা করতে পারে?' এ কথা বলেই ড. ঘোষ সত্যেন বসুর কাছে চলে এলেন। আমি তাঁর পাশে বসা, ভাইস চ্যান্সেলার এসে দাঁড়াতেই আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ড. জ্ঞান ঘোষ সত্যেন বসুকে বললেন, 'তুই দরখাস্ত ফিরিয়ে নে। তোর দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়েছে এই রেকর্ড থাকুক, তা আমি চাই না।' ভাইস চ্যান্সেলারের এই কথার পর সত্যেন

বসু তাঁর দরখাস্ত ফিরিয়ে নিলেন। সব সেনেট সদস্য হাততালি দিয়ে সত্যেন বসুকে অভিনন্দিত করলেন। সভা শেষে আমি যখন কাগজপত্র গোছাচ্ছি, তখন স্যার বললেন, 'কী রে আমার সঙ্গে ফিরবি নাকি?' গাড়িতে উঠে উনি আমাকে কেবল একটা প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোর কী মনে হল?' আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'স্যার, আমার ভাইস চ্যান্সেলারকে খুব ভাল লেগেছে।' উনি হাত বাড়িয়ে হেসে আমার কানটা মলে দিলেন। আমি স্কটিশ চার্চ কলেজের পিছনে ওঁর গাড়ি থেকে নেমে গেলাম।

ওই সময়টাতে কলকাতার ছাত্রসমাজে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিউনিস্টদের সাংস্কৃতিক প্রভাবপ্রতিপত্তি। ভিয়েতনাম, কোরিয়া নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ হত। কয়েকজন কমিউনিস্ট অধ্যাপক বিশেষ করে অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য মার্কিনবিরোধী ওইসব বিক্ষোভে ছাত্রদের আরও উস্কানি দিতেন। সে সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন সাইবেরিয়াতে এবং আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রায়শই পরমাণু পরীক্ষা চালাত। ভারতের খবরের কাগজগুলিতে এরকম খবর ছাপা হল যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়ে আসা বিমানগুলি তাদের প্রপেলার, ডানা ও ল্যাজে ওইসব পরমাণু বিস্ফোরণের Fall out ও Radio active dust নিয়ে ভারতীয় বিমানবন্দরগুলিতে নামছে। ফলে ভারতীয়দের প্রজনন ক্ষমতার ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে। এর ফলে দেশে বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্ম হবে। সাঙ্ঘাতিক খবর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যা বিভাগের তরুণ কমিউনিস্ট অধ্যাপক বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরি (বি ডি নাগচৌধুরি) একদল ছাত্র নিয়ে রোজ দমদম বিমানবন্দরে যাচ্ছেন এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে বিমানের ল্যাজ, ডানা ও প্রপেলারের ধুলো সংগ্রহ করে বিজ্ঞান কলেজে নিয়ে আসছেন এবং পরে রায় দিচ্ছেন যে আমেরিকার পরমাণু বিস্ফোরণের Radio active dust দেশের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। কলকাতার ছাত্ররা বিক্ষোভে উত্তাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে এক সেমিনার অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হল। সভাপতি বি ডি নাগচৌধুরি। প্রধান বক্তা থাকবে করা হল সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। তিনি সাধারণত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কোনও সভাসমিতিতে যেতেন না। কিন্তু যেহেতু এটা পরমাণু বিজ্ঞানের ব্যাপার, সেহেতু ওই সভায় আসতে সত্যেন বসু রাজি হলেন। সভায় তিলধারণের জায়গা নেই। করিডরে ছেলেমেয়েরা গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে। অধ্যাপক বি ডি নাগচৌধুরি ও অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য প্রচণ্ড মার্কিনবিরোধী জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। সত্যেন বসুকে সকলের শেষে বলতে ডাকা হল। তিনি সাইবেরিয়ায় সোভিয়েত পরমাণু বিস্ফোরণের ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকার পরমাণু বিস্ফোরণের পরিসংখ্যান দিলেন। তাতে দেখা গেল যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার চেয়ে দ্বিগুণ পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এবার সত্যেন বসু সভার উদ্যোক্তাদের প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা সোভিয়েত পরমাণু বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে কতগুলি প্রতিবাদসভা করেছ?' শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। সত্যেন বসু বললেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যে বিস্ফোরণগুলি ঘটিয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে তোমরা ছেলেরা কিন্তু কোনও সভা করনি। বাসন্তীদুলাল (বি ডি নাগচৌধুরি) বলছে, আমেরিকার পরমাণু বিস্ফোরণের Radio active dust প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে আসা বিমানগুলির গায়ে খুঁজে পেয়েছে। আমি যদি যুক্তির খাতিরে মেনেনিই যে বিমানের গায়ে তেজস্ক্রিয় ভস্ম পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বাসন্তীদুলাল ওই সিদ্ধান্তে পৌঁছল, তা ওকে বলছি আমাকে বুঝিয়ে দিতে।' এই বলে সত্যেন বসু পকেট থেকে চক বের করে বি ডি নাগচৌধুরিকে ব্ল্যাকবোর্ডে যেতে বললেন। বি ডি নাগচৌধুরি মাথা নিচু করে রইলেন। চতুর অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য বারে বারে ঘড়ি দেখে হল থেকে কেটে পড়লেন। সত্যেন বসু শেষে বললেন, 'আমাকে ছেলেরা ছেলেদের এখানে আলোচনা বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে হবে কিন্তু এখানে যে সব কথাবার্তা শুনলাম তাতে মনে হল যে এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই।' এ কথা বলে তিনি আশুতোষ হল থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওইরকম একটা সময়ে অধ্যাপক সত্যেন বসুকে নিয়ে কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চে (গোয়েন্দারা) একবার হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। ওই সময় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার সহ-সভাপতি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু নামে এক ব্যক্তি। তিনিও উত্তর কলকাতার গড়পার অঞ্চলে থাকতেন। এই রাজনৈতিক নেতা সত্যেন বসুর গতিবিধির ওপর নজর ও তিনি কোথায় কী বক্তৃতা দিচ্ছেন, তা জানার জন্য কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চ একজন গোয়েন্দা ওয়াচার মোতায়েন করল। সে বেচারা রোজ বিজ্ঞান কলেজের পুরনো বিল্ডিংয়ের (যা একসময় স্যার তারকনাথ পালিতের বসতবাটি ছিল) গাড়িবারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। এই ওয়াচার লোকটি বিজ্ঞান কলেজের দারোয়ানের কাছ থেকে অধ্যাপক সত্যেন বসু লোকটিকে চিনে নিল। ওয়াচার রোজই এসে বিজ্ঞান কলেজে ডিউটি দেয়। কিন্তু 'সত্যেন বসুর' বক্তৃতা কিছু সংগ্রহ করতে পারছে না। একদিন সে অধ্যাপক সত্যেন বসুর অনুসরণ করে পদার্থবিদ্যার লেকচার থিয়েটারে গেল তাঁর বক্তৃতার নোট নিতে। হলে না ঢুকে সে হলের বাইরে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখতে পেল সত্যেন বসু

ব্ল্যাকবোর্ডে দাগ টেনে অঙ্ক লিখে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সে তো কিছু বুঝতে না পেরে লেকচার শেষে হল থেকে বেরিয়ে যাওয়া শেষ ছাত্রটির কাছে গিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের স্যার যা বক্তৃতা করলেন, তা আমাকে বলে দিলে আমার চাকরিটা রক্ষা পায় দাদা।' ছেলেটি সাতপাঁচ কিছু না ভেবে বলল, 'চলুন আপনাকে স্যারের কাছে নিয়ে যাই, উনি আপনাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন।' এবার ওয়াচারের উভয়সঙ্কট। ছাত্রটি তাকে একরকম জোর করেই স্যারের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'স্যার, এই লোকটি আপনি যা আমাদের পড়ালেন, তা বুঝে নিতে চাইছে।' সত্যেন বসু লোকটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তুই কোন কলেজে পড়াচ্ছিস?' এবার লোকটি কাঁদো কাঁদো হয়ে সত্যেন বসুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'স্যার আমি পুলিসের লোক, আমি সুফিয়া স্ট্রিট থানা থেকে আসছি। আপনার নামের একজন লোকের ওপর আমাকে ওয়াচ করার ডিউটি দিয়েছে।' সত্যেন বসু জানতে চাইলেন, সেই লোকটি কী করে? ওয়াচার জবাব দিল, আজ্ঞে হিন্দু মহাসভার নেতা। অধ্যাপক সত্যেন বসু উচ্চস্বরে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন। ছাত্রটি উপস্থিত থাকার ফলে ঘটনাটি দ্রুত বিজ্ঞান কলেজে ছড়িয়ে পড়ল। দারোয়ানদের মধ্যে কেউ সুফিয়া স্ট্রিট থানায় ছুটে গিয়ে খবর দিল এমন একটা কাণ্ডের। আধ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা পুলিসের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার বিজ্ঞান কলেজে চলে এলেন। অধ্যাপক সত্যেন বসু তখন বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নীচে নেমে এসেছেন। ডেপুটি কমিশনার স্যারকে প্রথম স্যালুট করে পরে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। স্যার সিনিয়র পুলিস অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার আবার কী হল?' পুলিস অফিসার বললেন, 'স্যার আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি, আমার লোকটা স্যার গাধা।' এবার সত্যেন বসু আপত্তি করলেন, 'তোমার ওয়াচার লোকটি মোটেই গাধা নয়, অত্যন্ত চতুর। ও রোদবৃষ্টিতে কোন সত্যেন বসুকে খুঁজে বেড়াবে? ও রোজ দিব্যি এখানে বসে দশটা—চারটে ডিউটি দিয়ে কাজ সেরেছে। আর তুমি বলছ কিনা লোকটা গাধা, আসলে গাধা তুমি' বলে দুজনেই হো হো করে হাসলেন।

সম্ভবত ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় সরকার সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত করলেন। তিনি ওই পদে যোগ দেন ১লা জানুয়ারি ১৯৫৬-তে। তাঁর এই নিয়োগকে শান্তিনিকেতনের মৌলবাদীরা মেনে নিতে পারেননি। এই মৌলবাদীদের নেতৃত্বে ছিলেন প্রবোধচন্দ্র সেন, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ও কানাইলাল সরকার (আনন্দবাজার পত্রিকা)। তিনিই শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন বিজ্ঞান ফ্যাকালটি গড়ে তুলে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করে দেন। বলতে গেলে তাঁরই আমলে বিশ্বভারতী একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবয়ব ধারণ করল। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল এই তিন বছরে দুটি ঘটনা সত্যেন বসকে খুবই চিন্তিত করে তোলে। ওই সময় তাঁর জামাতার অকালমৃত্যু ঘটে। জামাতা হাওড়ায় থাকতেন। মেয়ের বৈধব্যদশা তাঁর মনকে ভেঙে দেয়। ওই সময়ে তাঁর মেয়ের সন্তানেরা কেউই প্রাপ্ত বয়স্ক ছিল না। তিনি মেয়ে ও নাতিনাতনিদের শান্তিনিকেতনে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। এটি গেল তাঁর নিতান্তই ব্যক্তিগত সঙ্কট। অন্যটি ঘটল ইংরাজির একজন অধ্যাপককে নিয়ে। তাঁর নাম ড. সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ। বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইংরাজি সাহিত্যে বিশেষ করে গ্রিক ট্র্যাজিডির ওপর গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছিলেন। এই ড. ঘোষকে সত্যেন বসু চিনতেন তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সময় থেকে। তিনি যখন রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্য পড়াচ্ছিলেন, ভাইস চ্যান্সেলার সত্যেন বসু তখন তাঁকে শান্তিনিকেতনে আসার প্রস্তাব দেন। তিনি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন ইংরাজি পড়াতে।ড. ঘোষ অবিবাহিত ও কিছুটা ক্ষ্যাপাটে ধরনের লোক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন রকমের বৈচিত্রময় পোশাক পরতেন। মদ্যপানও করতেন প্রচুর। এ কারণে শিল্পী রামকিঙ্কর বেজের সঙ্গে এক নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠছিল। কিন্তু শান্তিনিকেতনের মৌলবাদীরা প্রবোধচন্দ্রের নেতৃত্বে গোড়া থেকেই ড. ঘোষের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছিলেন। কোনও এক শীতের রাতে গৌড় প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটকের মহড়া চলছে এবং তার পাশেই চলছে মঞ্চসজ্জার প্রস্তুতি। মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন রামকিঙ্কর বেজ। রামকিঙ্কর বেজ ও ড. ঘোষ দুজনেই আকণ্ঠ পান করে মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থা দেখছেন। দেখতে দেখতে ড. ঘোষ মঞ্চসজ্জা তাঁর মতে কী হওয়া উচিত তা বলতে লাগলেন। রামকিঙ্কর বললেন, না, ওটা রবীন্দ্রনাটকে চলবে না। কিন্তু ড. ঘোষ নাছোড়বান্দা, তদুপরি মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া। রামকিঙ্করও একই অবস্থায়। রামকিঙ্কর জোর দিয়ে বললেন, 'শালা, এটা কী গ্রিক নাটক!' বাস আর যায় কোথায়। রামকিঙ্করের সঙ্গে ড. ঘোষের মারামারি আরম্ভ হল। উপস্থিত অন্যান্যরা মারামারি থামিয়ে দেওয়ার আগেই রামকিঙ্কর বেশি মাত্রায় আহত হলেন। শান্তিনিকেতনে প্রচণ্ড উত্তেজনা। ভাইস চ্যান্সেলার সত্যেন বসু তখন দিল্লিতে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ড. ঘোষের বিরুদ্ধে খবর ছাপতে লাগল ক্রমাগত। এর দু-তিন দিন পরে ড. ঘোষ সন্ধ্যার পর পূর্বপল্লীতে কারও বাড়ি থেকে ফিরছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাড়ির রাস্তাঘরের পিছন দিয়ে। লীলা রায় রান্নাঘরে কুপির আলোতে কিছু একটা করছিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায় ভিতরে হ্যারিকেনের

আলোতে পড়াশোনা করছিলেন। এ সময় কে একজন আর্তনাদ করে উঠল, 'আমাকে মেরে ফেলল, আমাকে বাঁচাও...।' লীলা রায় কুপি হাতে রান্নাঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। স্বামীকে বললেন, 'তুমি আলো নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো। একজনকে কারা মেরে ফেলছে।' লীলা রায় কুপি হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এলে আক্রমণকারীদের একজন লীলা রায়ের গায়ের কাছে এসে ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। অন্নদাশঙ্কর রায় আলো নিয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন যে ড. ঘোষ রক্তাপ্লুত অবস্থায় গোঙাচ্ছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে ড. ঘোষকে তাঁদের ঘরে এনে শুইয়ে দিলেন। অন্নদাবাবু নিজেই বোলপুর গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন। সত্যেন বসু দিল্লি থেকে ফিরতেই অন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁর স্ত্রী লীলা রায় তাঁদের রান্নাঘরের পিছনে ড. ঘোষকে কীভাবে আক্রমণ করা হয়েছে তা জানালেন। লীলা রায় আক্রমণকারী একজন শিক্ষকের নামও বলেছিলেন। কিন্তু 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বলতে থাকল, ড. ঘোষ কোনও এক মেয়েছেলের বাড়ি থেকে ফুর্তি করে মদ খেয়ে ফিরছিলেন। রাস্তা বুঝতে না পেরে অন্ধকারে জঙ্গলে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন। লীলা রায় ও অন্নদাশঙ্কর রায় এ সব রিপোর্টের প্রতিবাদ করে 'আনন্দবাজারে' চিঠি দিলেন। অন্নদাশঙ্কর রায়কে মারের ভয় দেখিয়ে চিঠি দিলেন প্রবোধ সেন ও তাঁর দলবলেরা। 'আনন্দবাজার পত্রিকার' এই ভূমিকার প্রতিবাদে অন্নদাশঙ্কর রায় খুব সাহস দেখিয়েছিলেন এবং দীর্ঘদিন তিনি 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের ময়াদ শেষ করে সম্ভবত ১৯৬১ সালের কোনও এক সময়ে সত্যেন বসু কলকাতায় ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'স্যার, শান্তিনিকেতনের দিনগুলি আপনার কেমন মনে লেগেছিল?' তিনি পাল্টা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'শান্তিনিকেতনে কি কখনও গিয়েছিস?' আমি বললাম, 'না স্যার, সেভাবে কখনও যাইনি।' বেশ খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর তিনি বলেছিলেন, 'একটা এতটুকু ছোট জায়গায় কী করে অতগুলো দুষ্ট লোক একত্রে বাস করতে পারে তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি।' পরবর্তীকালে নিজে অনেক অশ্রুসিক্ত বিনিদ্র রজনী যাপন করে স্যারের ওই কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। শান্তিনিকেতন এমনই একটি বিদ্যানিকেতন যেখানে নিন্দুকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ছাত্রদের কেরিয়ার নষ্ট করে দেয় অবলীলাক্রমে। অথচ এই অন্যায়ের কোনও প্রতিকার নেই সেখানেই, যেখান থেকে উচ্চারিত হয়েছে 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে'।

খড়্গপুরে আই আই টি-র পত্তন থেকেই অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ওই শিক্ষায়তনের Board of Governaos-এর সদস্য ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই বোর্ডের সভাপতি থাকতেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় থেকে ১৯৭০ সালে অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত সকল মুখ্যমন্ত্রীরা সভাপতির পদটি নিজেরাই রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৭২ সলে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ইন্দিরা গান্ধীর প্রধান সচিব (Principal Secy.) কমিউনিস্ট পি এন হাকসারকে খুশি করার জন্য তাঁর ভাই তখনকার আই টি টি-র চেয়ারম্যানকে খড়্গপুর আই আই টি-র Board of Governors-এর সভাপতি করে দিলেন এবং এ জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে দিয়ে নিয়মের পরিবর্তন করিয়ে নিলেন। ১৯৬২-৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯-৭০ সাল একটানা প্রায় সাত বছর 'যুগান্তর' পত্রিকার তরফ থেকে আমি আই আই টি-র সমাবর্তন রিপোর্ট করেছি। এই সাত বছরের প্রতিবারই সত্যেন বসুকে উপস্থিত হতে দেখেছি। একাডেমিক গাউনে শোভিত সত্যেন বসুর স্থান থাকত সভাপতির পাশের আসনে। এই উপলক্ষে আমার একটা কাজ ছিল, স্যার যে গাড়িতে যাবেন, সে গাড়িতেই আমাকে যেতে হত। হাওড়া থেকে এমন একটা ট্রেনে আমরা যেতাম যে ট্রেনটি বিকেল চারটা নাগাদ খড়্গপুর পৌঁছত। খড়্গপুরে আই আই টি-র অফিসাররা গাড়ি নিয়ে থাকতেন। খড়্গপুর স্টেশনে সম্ভবত শতাধিক বছরের পুরনো একটি সাবওয়ে দিয়ে আমাদের যেতে হত। আমি স্যারকে হাতধরে সাবওয়ে দিয়ে নিয়ে ওপারে গিয়ে উঠাতাম। একবার হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি স্যারের কামরায় মোট 'তিন বুড়ো' বসে আছেন। অন্য দুজন হলেন ফোরেনসিক সায়েন্সের ডিরেক্টর ড. নির্মল সেন ও বিখ্যাত গণিতবিদ অধ্যাপক নিখিল সেন। এঁরা দুজনেই সত্যেন বসুর চাকরর ছাত্র। ড. নির্মল সেন ও নিখিল সেন ওই বছরে Board of Governors-এর সদস্য হয়েছিলেন। নির্মল সেন আমাকে খুব ভাল চিনতেন ও বিশেষ স্নেহ করতেন। ড. নির্মল সেন সম্পর্কে একটু বলে নিই। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রি পড়াতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ঢাকা ছেড়ে কলকাতা আসেন ও Bengal Education Service-এ যোগ দেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে কেমিস্ট্রির প্রধান অধ্যাপক থাকাকালীন সময়ে ফোরেনসিক সায়েন্সের ডিরেক্টর হন। তাঁরই নেতৃত্বে এই রাজ্যে ফোরেনসিক সায়েন্স গড়ে ওঠে এবং ফোরেনসিক বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি সমাদৃত ছিলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক রহস্যজনক খুনের ফোরেনসিক তদন্ত করেছেন। এগুলির মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য দুটি হল দিল্লিতে জেনারেল হেমনাথ সান্যালের হত্যা এবং ভারতীয় জনমঞ্চের সর্বজনশ্রদ্ধেয় সভাপতি পণ্ডিত দীনদয়াল

উপাধ্যায়কে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে খুন করা। ড. নির্মল সেন আমার বড় News Source ছিলেন। তিনি খুব ভাল ক্রিকেট খেলতেন এবং অবিভক্ত বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ছাত্রদের নিয়ে হৈহৈ করে ক্রিকেট খেলতেন। অধ্যাপক নিখিল সেনকে চিনতাম, তবে তেমন আলাপ ছিল না। আমি ওঁদের কামরাতে উঠতেই দেখি স্যার টানটান হয়ে একটা বার্থে শুয়ে আছেন। আমি বার্থের একদিকে বসে পড়তাম। গাড়ি ছাড়ার পর স্যার গম্ভীরভাবে বলতেন, 'শোনো নির্মল-নিখিল, স্বজাতি বলে এই ছেলেটাকে তোমাদের দলে টানবার চেষ্টা করো না। ও কয়েক বছর ধরে খড়্গপুরে সাবওয়ে দিয়ে আমাকে নিরাপদে নিয়ে যাচ্ছে। এবার তোমরা এর অন্যথা করার চেষ্টা করবে না। জানো নির্মল, এই ছেলেটা একসময় আমার বাড়ির কাছেই থাকত।' নির্মল সেন মাথা নেড়ে বললেন, 'তা বলতে চলবে কেন স্যার, সুখরঞ্জন এখন আমার বাড়ির কাছে থাকে। তা ছাড়া আমি ওকে কত গুপ্ত খবর দিয়ে থাকি।' সত্যেন বসু খুব জোরের সঙ্গে বললেন, 'ওসব কথা আমি শুনতে রাজি নই। ওকে আমি অনেকদিন চিনি, কথায় বলে পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।' এভাবে হাসাহাসি করতে করতে খড়্গপুর এসে গেল। সাবওয়ে পেরিয়ে আই আই টি-র অপেক্ষমান গাড়ির কাছে আসতে এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে স্যার ভীষণ রেগে গেলেন। আমি স্যারকে কখনও রাগতে দেখিনি। এই প্রথম দেখলাম। নির্মল সেন ও নিখিল সেন একেবারেই অপ্রস্তুত। যে গাড়ি ওঁদের নিতে এসেছে, তাতে পিছনের সিটে স্যারেরা তিনজন। সামনে ড্রাইভারের সঙ্গে বসবে আই আই টি-র দুজন অফিসার। আমার জায়গা গাড়িতে হচ্ছে না। স্যার প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আই আই টি-র লোকদের বললেন, 'তোমাদের এই বুদ্ধি, লোক গুনে গুনে গাড়ির ব্যবস্থা করো।' আমাকে দেখিয়ে স্যার বললেন, 'আমি ওকে ফেলে যাব না।' অবশ্য স্বাভাবিক করতে আমি বললাম, 'স্যার আপনি রাগছেন কেন? সামনেই ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, আমি ট্যাক্সি নিয়ে নিচ্ছি। আপনি আমার সঙ্গে ট্যাক্সিতে চলুন।' এবার স্যার হো হো করে হেসে বললেন, 'বেশ তাই হবে। তুষারের পয়সায় ট্যাক্সি চড়ে যাব' (তুষার মানে যুগান্তর-এর মালিক তুষারকান্তি ঘোষ, যিনি তাঁর কর্মচারীদের T A bill মঞ্জুর করতেন)। স্যারকে নিয়ে আমি ট্যাক্সিতে আগে যাচ্ছি। আমাদের পিছনে আই আই টি-র গাড়িতে নির্মল সেন, নিখিল সেন। কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই থেমে থাকেনি। সন্ধ্যার পর আই আই টি ক্যাম্পাসের 'বিশ্বেশ্বরায়া নিবাস'-এ আমার ঘরে ওই স্টেশনের ম্যানেজার মিঃ রাজন এসে বললেন, ডেপুটি রেজিস্ট্রার মিঃ চক্রবর্তী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। অন্ধ্রের লোক মিঃ রাজনকে আমি ভাল করে চিনি। অত্যন্ত বিনয়ী ও কর্তব্যপরায়ণ। রাজন জানাল যে চক্রবর্তী সাহেব নীচে ক্যান্টিনে লিখতে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে মিঃ চক্রবর্তী এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। আমি বললাম, সামান্য ব্যাপারে আপনারা এত বিব্রত হচ্ছেন কেন? মিঃ চক্রবর্তী বললেন, স্যার অর্থাৎ সত্যেন বসু রেজিস্ট্রারকে ডেকে খুব বকাবকি করছেন। তাই আমি এসেছি, অবশ্য আমি আপনাকে আগে থেকেই চিনি।' আমি ও চক্রবর্তীসাহেব যখন কথা বলছিলাম, অদূরে একটি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনছিল। আমি মেয়েটির দিকে চোখ ফেরাতেই চক্রবর্তী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছে।' এবার মেয়েটি আমাদের পাশে এসে বসল। ওর বাবা জানালেন, এবার সমাবর্তনে মেয়েটি কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পাচ্ছে। একই সঙ্গে রূপ ও বিদ্যার মিলন। মেয়েটিকে বললাম, 'আপনি আমাকে দেখতে এলেন কেন?' তাঁর সপ্রতিভ জবাব, 'সন্ধ্যায় পর পর কয়েকটা টেলিফোনে বাবা উত্তেজিত কথাবার্তা বলছিলেন ও প্রত্যেক কথায় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম উচ্চারিত হচ্ছিল। বাবার কাছে ব্যাপারটা শুনলাম। বাবা আপনার কাছে আসছে জেনে আমি বললাম সত্যেন বসু যাঁকে এত স্নেহ করেন, চলো আমিও তাঁকে দেখে আসি।' এবার আমার কিছু বলার পালা। বাপ মেয়ে দুজনেই প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন। মেয়েটি এতই সপ্রতিভা যে সমাবর্তনে স্বর্ণপদকটি গ্রহণ করার পর মঞ্চ থেকে নেমে রিপোর্টারদের টেবিলে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে স্বর্ণপদকটি দেখাল। পরদিন কলকাতার সব কাগজে এই মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছিল।

১৯৬১ সালের সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাস। তখনও একটু একটু শীত আছে। আমার নাইট ডিউটি। রাত ন'টা নাগাদ খবর পেলাম ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মারা গিয়েছেন। থাকতেন এলগিন রোড ও চৌরঙ্গির সংযোগস্থলে ছেলে কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে। কুমারবাবুও পিতার মতো বাকচাতুর্যে নিপুণ। অনেকদিন ধরে গলায় ক্যান্সারে ভুগছিলেন। বছরখানেক ধরে কথা বলতে পারছিলেন না। যে লোক কথা বলতে এত ভালবাসতেন, তাঁর কথা বলতে না পারার দুঃখ যে কী সাঙ্ঘাতিক তা ধূর্জটিপ্রসাদের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লে বোঝা যেত। আমি যখন এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। সাবেকি পুরনো ধাঁচের ফ্ল্যাট। ঘরে ঢুকেই দেখি ধূর্জটিপ্রসাদের শিয়রের কাছে একটি চেয়ারে বিষণ্ণভাবে বসে আছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ক্রমশ

ধারাবাহিক

ভ্রমণ বিভ্রম

চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অরণ্যপ্রীতির ফ্যাশন শো বেড়ে চলেছে দ্রুত। গাড়িতে অথবা আরও শিহরণ জাগানো অভিজ্ঞতার আশায় হাতির পিঠের হাওদানসীন নিরাপত্তায় অরণ্যগভীরে দুঃসাহসিক সফর। সেই গভীরেই শহরজীবনের যাবতীয় আধুনিক বিলাস-সমন্বিত বনবাংলো কিংবা টুরিস্টলজ। সাধারণ বন্য জীবজন্তুদের নিজস্ব পরিবেশে দেখার রোমাঞ্চ নিয়ে বাংলোয় ফিরে গিজারে স্নান সেরে উত্তেজনা প্রশমিত করার পর টিভির সামনে রঙিন পানীয়ের গেলাস হাতে আয়েসি সময় যাপন। বাছাই খাবার-দাবারের অর্ডার দেওয়াই রয়েছে। শহরের কেতাদুরস্ত রেস্তোরাঁর টেবিলের মেনু হাজার গুণ বেশি মজা নিয়ে এখানে হাজির। প্রাণ এবং চক্ষু যা চায় সব কিছুর অঢেল আয়োজনে সার্থক জনম মাগো। শহরেও আছি, জঙ্গলেও আছি— এই দ্বৈত-অনুভব ঘিরে পর্যটনের সার্থকতা। রয়েছে পরের দিন সকাল সকাল উঠে পড়ার তাড়া। এই তল্লাটে যখন এসে পড়া গেছে তখন কাছাকাছি যা কিছু দ্রষ্টব্য, তার কোনওটাই 'মিস' করা সমীচীন নয়। অন্তত দু'এক ঘন্টা সর্বত্রই দিতে হবে। দর্শনের তালিকা দীর্ঘ না হলে, ব্যয়ের আড়ম্বর না থাকলে ফিরে গিয়ে ফিরিস্তি দেওয়ার জো নেই। যে-অরণ্যে আবাসের আয়োজন যত আধুনিক, সে অরণ্যের প্রেমিকের সংখ্যা তত বেশি হতে বাধ্য। বস্তুত এই টুরিস্ট দল অরণ্যভ্রমণে যে ধরনের আচার আচরণের নমুনা রেখে যায়, তা সেই মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের বিজ্ঞাপনটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কখনও দেখা যায় পরিবেশ-উদাসীন বয়স্করা পরচর্চা ও বৈষয়িক আলোচনায় মুখর। আর কমবয়সিরা বনের ভেতর পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে শান্ত তদের জলে ক্রমাগত ছুঁড়ে ফেলার আনন্দে মশগুল। এ অভিজ্ঞতা বাঁকুড়া জেলার সুতানের অরণ্যে। তেমনই অনেকে পাহাড় পর্যটনে গিয়ে কাকভোরে কাঞ্চনজঙ্ঘার মুখোমুখি বসে হোটেল ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষায় মগ্ন। দলের বাদবাকি সদস্যেরা টিভি সিরিয়ালের আলোচনায় বিভোর। পাহাড়-সমুদ্রে বেড়াতে গেলে ভোরবেলায় শয্যাত্যাগ করতে হয়, এটা প্রথাসিদ্ধ। এই অর্জিত উষালগ্নটি কীভাবে ব্যয় করা উচিত, তা ব্যক্তিগত অভিরুচির অন্তর্গত প্রশ্ন।

পর্যটন অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অনিশ্চিত পণ্য। ব্যক্তির মনোভাব ও আচার আচরণ তাকে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্ব জুড়ে নিরন্তর ঘটে চলা নানা ঘটনা প্রভাবিত করে পর্যটন মানসিকতাকে। বিভিন্ন ছোট বড় ঘটনা প্রচারমাধ্যমের সৌজন্যে দ্রুত ছড়িয়ে যায় জনসমাজে, কখনও প্রকৃত অবয়বে, কখনও বা অতিরঞ্জিত হয়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় কোনও বিশেষস্থানে আচমকা পর্যটকের ভিড় আছড়ে পড়তে শুরু করে। কিংবা হঠাৎই জনপ্রিয়তা হারিয়ে পর্যটক-পরিত্যক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যেভাবে ভারতের পর্যটন মানচিত্রে হঠাৎ উদিত নাম— কারগিল। ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত সঙ্ঘর্ষের সূত্রে রাতারাতি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে একদা অজ্ঞাতকুলশীল স্থানটি। ঠিক তেমনই ভাবে ম্যালেরিয়া প্রবণ এবং সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গুলির আস্তানা হয়ে পড়ায় পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতের বহু অরণ্য পর্যটক-স্বল্পতায় ক্ষতিগ্রস্ত। মানসের স্বপ্নিল প্রকৃতিও সে কারণে দর্শনার্থীবিহীন। কাশ্মীরের মতো আদর্শ পর্যটনকেন্দ্রও ভূগোছে দীর্ঘকাল। অনেক ক্ষেত্রে একটি অবহেলিত স্থান অতি অদ্ভুত কারণে ভ্রমণেচ্ছু জনতার নজর কেড়ে নেয়। প্রাকৃতিক বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও তেমন পরিচিত ছিল না এমন অনেক জায়গা শুধু কোনও চলচ্চিত্রের শুটিং লোকেশন হওয়ার সুবাদে অবশ্য-দ্রষ্টব্যের ফর্দে স্থান পেয়ে যায়। রূপোলি পৃথিবীর নায়ক-নায়িকাদের পাদস্পর্শে ধন্য হয়ে যায়, তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদা আদায় করে নেয়। দার্জিলিং-এর তিস্তাবাজার, মিরিকের হ্রদ কিংবা অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং-বমডিলার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে সর্বভারতীয় সুপারহিট ছবির লোকেশন নির্বাচিত হবার ফলে। সে সব তথ্যকে পুঁজি করেই পর্যটনসংস্থার বিজ্ঞাপনী প্রচার। পরিবেশ-বিচ্ছিন্নতার অনুপ্রবেশও এ ভাবেই।

সাইট-সিয়িং— আধুনিক পর্যটনের একটি অতি প্রচলিত শব্দবন্ধ। নতুন নতুন 'সাইট' আবিষ্কার ও যোগান দেবার প্রবল প্রতিযোগিতা পর্যটন সংস্থাগুলির পরস্পরের মধ্যে। সেই লড়াইয়ের জেরে বহু সরল-সাধারণ, তথাকথিত অনাধুনিক জনপদ, জনজাতি, গ্রাম, সমাজ দ্রষ্টব্যের তালিকায় স্থান পায়।

তাদের জীবনযাত্রার গভীরে নিঃসাড়ে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ঢুকে পড়ে অর্থনীতির জীবাণু। পণ্যসম্ভাবনা সৃষ্টির তাড়নায় বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া গ্রাস করে জীবনকে। স্থানীয়দের ভাবনা চিন্তা অর্থকরী সংকীর্ণতায় কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। শুধু বহিরাগতদের সঙ্গে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নয়, নিজেদের মধ্যেও। পর্যটক সংখ্যা বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন রোদচশমা, স্নান-পোশাক, ক্যামেরা, ক্যাসেট-সিডি-র চাহিদা বেড়ে গেছে, তেমনই সাইটসিয়িং-এ গিয়ে কোনও জায়গার বিশেষত্ববাহী জিনিসপত্র কেনার হিড়িক বেড়ে গেছে। কোনও সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে তাঁদের ব্যবহার্য অলংকার, কোথাও নানা ধরনের পটচিত্র পোশাক কিংবা হস্তশিল্পের নমুনা কিনে এনে শহর-সমাজে ফ্যাশন চালু করা একটি নয়া হুজুগ। আসল ও নকলের তফাত ধরা বহিরাগতদের পক্ষে খুব কঠিন। সেই সুযোগে নকল পণ্যের ব্যবসা দিব্যি বেড়ে চলেছে। আঘাত পড়ছে ঐতিহ্যের ওপর। তিব্বতি জিনিসপত্রের দারুণ চাহিদা নেপাল পর্যটকদের মধ্যে। অথচ যা তারা তিব্বতি ঐতিহ্য জেনে কিনছে সেগুলোর উৎপাদনকেন্দ্র কাঠমান্ডু। তিব্বত থেকে আসে শুধু ইয়াকের গলায় বাঁধার ঘন্টা। তাও সব সময় নয়। নানা ধরনের ঐতিহ্য নির্ভর গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে জীবনযাপন চিরাচরিত নিয়মে চলে। কিন্তু পর্যটনশিল্পের প্রবল প্রসারের তীব্র প্রভাব পড়ে তাদের ওপর। হস্তশিল্প যে গ্রামের ঐতিহ্য, সেখানে পর্যটন ব্যবসায়ীদের আবির্ভাবে স্থানীয় অর্থনীতির লাগাম চলে যায় বহিরাগতদের হাতে। পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য নাগরিক জীবনের চাহিদা আনুষায়ী আধুনিক পরিষেবা আসে। স্থানীয় ঐতিহ্য এই আধুনিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আবার পর্যটনের স্বার্থেই ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ইদানীং খুব জরুরি। এই নবতম প্রয়াসের নাম হেরিটেজ টুরিজম। আধুনিকতার এই জাতীয় প্রয়াস মাসানোবু ফুকুওকা-র একটি মন্তব্য খুব প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ 'মানুষ তার কাজকর্মে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটায়, কিন্তু যে সব ক্ষয়ক্ষতিগুলো ঘটে সে সব মেরামতের চেষ্টা করে না। যখন তার কৃতকর্মের কুফল দেখা দিতে শুরু করে, তখন সারাবার জন্যে উঠেপড়ে লেগে যায়। সারানোর কাজে সফল হলে সেটাকে তারা বিশাল কৃতিত্ব বলে মনে করে। এই রীতিতেই চলে সবকিছু। যেন নিজেই বোকা একটি লোক নিজের ঘরের ছাদে দাপাদাপি করে টালি ভেঙে ফেলেছে। তারপর ঘর ভেঙে পড়ার উপক্রম হলে নিজেই দ্রুত ছাদে উঠে সারাই করতে শুরু করে। ঠিকমতো সারাই হলে নিজের কৃতিত্বে নিজেরই পিঠ চাপড়ায়।'[১০]

যা স্বাভাবিক তাকে প্রায় বিধ্বস্ত করে আবার স্বাভাবিক স্থবিরতায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সংরক্ষণ প্রয়াস এক আশ্চর্য স্ববিরোধিতা। এ ভাবে পর্যটন একটি সমাজের মানবিক মূল্যবোধে থাবা বসায়। ধ্বংস করে তার সাংস্কৃতিক ঐক্য, সমৃদ্ধিকে। তার জীবনধারাকে বাণিজ্যিক শিল্পে রূপান্তরিত করে। শেরপা জীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে জেমস ফিশার মন্তব্য করেছেন, 'A culture is turned from subject to object, from independent to dependent, from audience in its own right to spectacle।'[১১] এর আদর্শ দৃষ্টান্ত শেরপাসমাজ। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত শেরপাদের যা অবস্থা ছিল, আজ আর তা নেই। বিদেশি পর্বতারোহী ও ভ্রমণকারীদের সৌজন্যে তারা অনেকেই বদলে ফেলেছেন জীবনযাত্রা। রাতারাতি অর্থবান হয়ে ওঠার ফলে শেরপাসমাজ আজ শ্রেণিবিভাজনের শিকার। তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে নতুন সম্প্রদায়— টুরিস্ট শেরপা। জমিচাষ ও ইয়াক চরানোর চিরাচরিত পেশা শিকেয় তুলে হঠাৎ বিত্তের স্বাদ পেয়েছে অনেকেই। ধনী-দরিদ্রের তফাত আগে তাদের সমাজে ছিল না এমন নয়। কিন্তু ধনীদের জীবনযাপনের ধরনে দরিদ্রদের সঙ্গে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এই নব্য-বিত্তবান শেরপাদের বিদেশি পোশাক-পরিচ্ছদ তাদের সহজেই অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে দেয়। তাদের পারিবারিক জীবন প্রায় নেই বললেই চলে। বছরে নয় মাস তারা কাটায় গ্রামের বাইরে। এতে উপার্জনের পথ খুলেছে সন্দেহ নেই। স্কুল ছেড়ে পড়াশোনা ছেড়ে তারা দলে দলে পর্যটনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করছে। এমনকী স্কুলে পড়ানোর জন্য শিক্ষকও পর্যাপ্ত নয় কোথাও কোথাও। কারণ শিক্ষকতার চাইতে শেরপা পেশায় উপার্জন অনেক বেশি।

আধুনিক পর্যটনকে প্রকৃতপক্ষে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখা যাবে না। এটি আদতে আজকের সমাজ মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন। একটা সময় ছিল যখন মধ্যবিত্তসমাজ তার গার্হস্থ্য জীবনে আত্মীয়-পরিজন ছাড়াও যাবতীয় ভোগ্য উপকরণের সঙ্গে আত্মিক যোগ অনুভব করত। ব্যক্তিগত এক্তিয়ারভুক্ত ভোগ্যসামগ্রীর সঙ্গেও জড়িয়ে থাকত মায়ার বাঁধন। একটি বহু পুরনো খাট, অচল রেডিও, কিংবা বহু ব্যবহারে জীর্ণ হাতঘড়িটিও হাতছাড়া করতে বিষণ্ন বোধ করত। আজকের মধ্যবিত্তের জগতে সেই বাঁধন যৎপরোনাস্তি শিথিল। বাড়ি, গাড়ি, চাকরি ও ভোগ্যপণ্য ক্রমাগত বদলে চলার আধুনিকতায় কোনও কিছুর সঙ্গেই সে মানসিকভাবে গভীর ও স্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ নয় সেই মানসিকতার উৎকট প্রকাশ মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতরে সাধারণভাবে আপাতপ্রীতির আড়ালে এক সর্বব্যাপী ঔদাসীন্য। সেই উদাসীনতা একই রকম

ভাবে প্রকট পর্যটকের ক্রিয়াকলাপেও। এক সময় ভ্রমণকে ধরে নেওয়া হত পারস্পরিক সম্পর্কের অ্যাসিড টেস্ট। সফরে বেরিয়ে বিদেশ-বিভূঁয়ে হঠাৎ গজানো সমস্যা সঙ্কটে সঙ্গীদের ভূমিকা যে সব সময় বন্ধুসুলভ থাকে একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। একটি বারের জন্য একসঙ্গে ভ্রমণের অন্তে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সফর-সমাধি কোনও বিরল ঘটনা নয়। পরস্পর অতি-ঘনিষ্ঠ পরিবার যৌথ সফরে গিয়ে অটুট সম্পর্ক নিয়ে ফিরেছে, এরকম উদাহরণ ক্রমহ্র াসমান। তুচ্ছাতিতুচ্ছ পছন্দ-অপছন্দ থেকে শুরু করে আহারবিহার ও আর্থিক কারণে দূরত্ব বেড়ে যায়। হোটেলের ঘরের তুলনামূলক উৎকর্ষ কিংবা পছন্দের গরমিল নিয়ে মনোমালিন্যের শুরু। তার প্রভাব যথারীতি গড়িয়ে যায় অন্যান্য সব ক্ষেত্রে। বিশেষত ব্যক্তিগত উদ্যোগে আয়োজিত ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভাঙনের ঘটনা আজ সর্বজনীন। সফরসূচিতে হোটেল ঘরের আয়েস রসনার পরিতৃপ্তি, দলবদ্ধ আমোদ-প্রমোদ পরিবেশের চেয়ে অনেকগুণ বেশি উপভোগ্য। উত্তর আমেরিকার নায়েগ্রা জলপ্রপাতটি স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কারণে বিশ্বের একটি অন্যতম আকর্ষণ। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রুচি-প্রবৃত্তির আগন্তুকের ভ্রমণ বিলাস তৃপ্ত করে চলেছে। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে এই দৃষ্টিনন্দন জলধারাটি মধুচন্দ্রমাযাপন ও প্রেমনিবেদনের অন্যতম প্রকৃষ্ট স্থান হিসাবে সারাবিশ্বে আদৃত। পর্যটন বাণিজ্যের প্রবল প্রতাপে নায়েগ্রা আজ শুধু একটি প্রতীক মাত্র। উচ্ছল প্রেমিক-প্রেমিকারা সেখানে ট্রাভেল এজেন্ট টুর কনডাক্টর ও উদ্যোগী হোটেলওয়ালাদের বিছিয়ে রাখা পরিষেবা উপভোগের বাসনায় ভিড় জমায়। নায়েগ্রা সেখানে শুধু একটা নাম, একটা উপলক্ষ্য। তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকের লক্ষ্য নয়। নায়েগ্রাপ্রেমী পর্যটক আজ জলপ্রপাত-উদাসীন। এর নিজস্ব কোনও মূল্য আর অবশিষ্ট নেই। ওই কাঞ্চনজঙ্ঘা-দর্শনার্থী পর্যটকদের ভোরের কাকলির মতোই। সমাজতাত্ত্বিক ম্যাকনেল-এর মতে, পর্যটক শব্দটি উত্তরোত্তর নিন্দার্থেই প্রচলিত হয়ে চলেছে, কারণ টুরিস্ট বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তিকে যে অপ্রামাণ্য অভিজ্ঞতা লাভ করে পরিতুষ্ট।

আমাদের দেশে সমুদ্র সৈকতের অবস্থাও তথৈবচ। উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ইত্যাদি উপকূলবর্তী রাজ্যে বিরাট এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে অজস্র রেসর্ট, সমুদ্র-প্রেমী পর্যটকদের সেবায়। আধুনিক টুরিস্টদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে রেসর্টগুলিকে করে তোলা হয়েছে এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র। চার দেওয়ালের চৌহদ্দির ভেতর কৃত্রিম প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে সেখানে অতিথিদের জন্য কুটির, পায়চারির জন্য লন, প্রমোদের জন্য সন্তরণ-সরোবর-সহ বহুবিধ বিলাস-উপকরণে ঘেরা সুখ দেওয়ালের ওপারে দিগন্তবিস্তারী সমুদ্রের অস্তিত্ব অনেকটাই ভুলিয়ে দেয়। সাময়িক সৌখিনতায় মগ্ন পর্যটক পরিবেশের প্রকৃত বাতাবরণ থেকে অজান্তে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। তা হলে কিসের সন্ধানে পাড়ি দূরদূরান্তে? ব্যয়বিলাসিতার প্রদর্শনী ছাড়াও ভ্রমণপ্রিয় মানুষ চেনা চৌহদ্দি ছেড়ে বাইরে পা বাড়ায় আরও কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যা তার অভ্যস্ত পরিবেশে লভ্য নয়। পর্যটন-ভাবনার পেছনে থাকে প্রথমত সাধারণ্যে অসাধারণ হয়ে ওঠার তাগিদ। নিজের আটপৌরে জীবনের বাইরে যে বৈচিত্র তা প্রতিদিনের থেকে একেবারেই আলাদা এবং আয়েসি বলে তার সঙ্গে জুড়ে যায় আনন্দ ও আশ্চর্য ভাললাগা। টি. এস. এলিয়টের সেই বিখ্যাত উক্তি, মানুষ বাস্তবকে খুব বেশি সহ্য করতে পারে না— বোধহয় পর্যটনের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে অকাট্যভাবে প্রযোজ্য। আটপৌরে জগতের বাইরে এক প্রামাণ্য বাস্তব তার অনুসন্ধান যা চলতে থাকেঅন্য কাল ও সমাজ-সংস্কৃতির পরিসরে। প্রাত্যহিকতায় তিতিবিরক্ত ব্যক্তি মনে করে অপর কোনও পরিবেশে প্রামাণ্য, যথার্থ জীবনের সন্ধান লভ্য। সে হয়ে ওঠে পর্যটক, আধুনিক তীর্থযাত্রী। সাইট-সিয়িং তার একটি জরুরি রিচুয়াল বিশেষ। যান্ত্রিক জীবনে বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকে রেহাই পেতে ও কাজের চাপ সহনীয় করে তোলার জন্য সে অবসর কামনা করে। পর্যটন অভিজ্ঞতার অর্থ হল একটি দীর্ঘ ছুটিতে স্থানান্তর যাত্রা, যেখানে যথেচ্ছ অর্থব্যয় করে এবং অন্যদের কর্মব্যস্ততা পর্যবেক্ষণ করে সময় উপভোগ করা যায়। অপরিচিত পরিবেশে সময় উপভোগ করার আধুনিক পদ্ধতি হল ব্যয় ও ভোগলিপ্সা সমাহারে অপরিমেয় সুখ। ন্যান্সি মিটফোর্ড বহুদেশ ঘুরে ১৯৫৯ সালে 'দি টুরিস্ট' নামে একটি বই লেখেন। নিজের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় তিক্ত-বিরক্ত তিনি। পর্যটককুলের কার্যকলাপ দেখে তাঁর ক্রুদ্ধ মন্তব্যঃ The Barbarian of yesterday is the tourist of today। তাঁর মতে পর্যটক সংখ্যার এই পিপীলিকা-প্রায় বিস্তার যে কোনও যুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিতভাবে পুরনো ইউরোপকে ধ্বংস করবে।

পাহাড়, সাগর ছাড়াও ধর্ম, ইতিহাস, স্থাপত্য আরও বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় দ্রষ্টব্য পর্যটনমানচিত্র জুড়ে থাকে। তাজমহল, ইন্ডিয়াগেট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোণারকের মন্দির— এই ধরনের দ্রষ্টব্যগুলি এক এবং অদ্বিতীয়। সেই কারণেই বিখ্যাত। বিখ্যাত বলেই আরও বেশি জনপ্রিয়। যারা দেখতে আসে তাদের মধ্যে কতজন দ্রষ্টব্যটি সম্পর্কে আগে থেকে জেনে আসে কিংবা এসে জানবার চেষ্টা করে? হাজারে একজনও হয়ত নয়। বেশিরভাগ টুরিস্টের দৃষ্টির সামনে তাজমহল দাঁড়িয়ে থাকাও যা কোণারকের মন্দিরও তাই। অর্থাৎ চোখে পড়াটুকুই তার ভ্রমণের সামগ্রিকতার নির্মাণ। পাহাড় ভ্রমণের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। চোখের সামনে অজস্র পাহাড়চূড়া। চেনার তাগিদ কতজনের? পর্যটন সংস্কৃতির দুর্নিবার বিস্তারের যুগে অতি সাধারণ আইটেমও দ্রষ্টব্য হবার স্বীকৃতি পেয়ে যায় পর্যটনসংস্থার আরোপিত অসাধারণত্বের বলে।

আধুনিক ভোক্তা পণ্য পছন্দ, কেনাকাটা ও তার ব্যবহার থেকে আনন্দ আহরণ করে না। তার সুখবোধ তৈরি হয় কোনও নতুন ভোগ্যপণ্য সম্পর্কে পূর্বপ্রত্যাশা ও কাল্পনিক আনন্দ থেকে। পর্যটক হিসাবেও তার প্রতিক্রিয়া এর ব্যতিক্রম নয়। তার পরিকল্পিত সফর সম্পর্কে আনন্দের সঞ্চার হয় বিজ্ঞাপন এবং প্রচারমাধ্যমের প্রভাবে আর সুপ্ত পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মানসিকতা থেকে। ব্যক্তি যদি তার পরিকল্পনার সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত না থাকে, তবে ভোগ্যপণ্যটির মালিকানা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার আকর্ষণ অনেকটা থিতিয়ে পড়ে। সে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। সেরকম অবস্থায় অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার কখনওই সম্ভব নয়। সে নিষ্ক্রিয়, বিচ্ছিন্ন। যথাস্থানে নিজেকে উপস্থাপিত করাটাই পর্যটকের স্ব-আরোপিত কর্তব্য। তার ভ্রমণের স্থান নির্বাচিত হয় মূলত দুটি মাপকাঠিতে। প্রথমত, পর্যটনের জগতে জায়গাটির চাহিদা কতটা। দ্বিতীয়ত, বন্ধুবান্ধব পরিচিতজনের কাছে বহুশ্রুত কি না। বস্তুত স্থানটি সম্পর্কে তার নিজস্ব ধারণা প্রায় নেই বললেই চলে। বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন শিক্ষিত ব্যক্তির যেমন বইমেলায় ঢুকে হতবুদ্ধি বিচরণ। ঠিক কী বই কেনা উচিত তা তার বোধগম্য নয়। পাহাড় ভ্রমণে বেরনো বেশিরভাগ পর্যটকের কাছে তার চারপাশের শৈলমালা অন্ধের হস্তিদর্শনের সমতুল। এ কথা ঠিক একটি নদী কিংবা পাহাড়ের নাম না জানলেও তার সৌন্দর্য উপভোগে বাধা নেই। কিন্তু তথ্য আহরণে যে অনিচ্ছুক, তাকে মনোযোগী পর্যটক বলা যাবে না কখনওই। ইতিহাস ও স্থাপত্য প্রসিদ্ধ যেসব স্থান জনপ্রিয় সেখানেও সমান অজ্ঞতা নিয়ে ভিড় জমায় অধিকাংশ টুরিস্ট। দ্রষ্টব্যের সঙ্গে সম্যক পরিচিতির কোনও আগ্রহ তাদের থাকে না। কোনও নতুন পরিবেশে প্রিয়জনেদের সান্নিধ্যে আমোদ উপভোগেই এই ভ্রমণের সার্থকতা। স্থানের গুণগত তারতম্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নেই বলে টুর অপারেটর তাকে যেখানে নিয়ে যায়, সে সেখানেই যেতে প্রস্তুত। তাকে যা কিছু দেখায় তাতেই সে তৃপ্ত। যা তথ্য দেয় তার সত্যমিথ্যা নিয়ে ভাবিত নয় মোটেই। লব্ধ সুখ ও তথ্যেই সে তৃপ্ত ও সুখী। সদলবলে রুটিন-বহির্ভূত সময়যাপনই তার একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়। পিকনিক ও পর্যটনের মধ্যে গুণগত প্রভেদ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মাস-টুরিজম বা গণ-পর্যটনে ভোক্তার ব্যক্তিগত ইচ্ছে ও স্বাধীনতা নেই বললেই চলে। সে হয়ে পড়ে মেকি সংস্কৃতির ক্রেতা।

অ্যাডভেঞ্চার টুরিজমকে প্রাচীন ভ্রমণের পরপম্পরা হিসাবে ভেবে নিতে বাধা নেই। ভয়ংকর সুন্দরের টানে কৃচ্ছ্রসাধনের নেশায় দুর্গমের পথে বেরিয়ে পড়া। শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে অনাবিল প্রকৃতির কাছে ছুটে যাবার যে ধারা দীর্ঘকাল যাবৎ চলে আসছিল, তার হেরফের ঘটেছে। তিন দশক আগেও ট্রেকিং- এর নেশায় আসক্ত ভ্রমণার্থীরা নিজেদের উৎসাহেই প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করে বেরিয়ে পড়ত অচেনা পথে নতুন নতুন আবিষ্কারের আনন্দে। সেখানেও লাগল পরিবর্তনের হাওয়া। ট্রেকিং-এর উপকরণ যুগিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে এল নানা প্রতিষ্ঠান। সাধারণ পর্যটকদের মতোই ট্রেকারদের পথযাত্রার যাবতীয় দায়দায়িত্ব ব্যবসায়িক উদ্যোগের আওতাভুক্ত হয়ে পড়ল। ফলত ট্রেকিং যেহেতু আর কষ্টসাধ্য ভ্রমণ নয়, তাই সাধারণ্যে উৎসাহ বেড়ে চলেছে। নানা ধরনের নতুন নতুন রোমাঞ্চকর আইটেম ব্যবসায়িক উদ্যোগের সৌজন্যে ইদানীং যুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু নিখাদ অ্যাডভেঞ্চার টুরিজম— এ বস্তুত ভাঁটা পড়েছে। সক্রিয়, উদ্যোগী পর্যটক পর্বতারোহন, ট্রেকিং কিংবা অরণ্যের দুর্গমে যাবার নেশায় যে কৃচ্ছ্রসাধন করে তৃপ্তি লাভ করে, তার দিন গতপ্রায়। আজকের অ্যাডভেঞ্চার টুরিস্ট ভিন্নতর কৃচ্ছ্রসাধনে উৎসাহী। ভাড়া কিংবা নিজের গাড়িতে চেপে দূরদুরান্তরের পথ-পরিক্রমা তার নেশা। এক একটি সফরসূচিতে বেশকিছু গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট,যাতে উল্লেখযোগ্য কোনও স্থান বাদ না পড়ে। আবার কোথাও বেশি সময় খরচ করার পক্ষপাতী সে নয়। সকালটা কোনও বহুশ্রুত পাহাড়ের ঢালে, বিকেলটা মনোরম সমুদ্রসৈকতে, আবার পরদিন সকালের মধ্যে পৌঁছতে হবে কোনও বিখ্যাত জলপ্রপাতের ধারে। বাঁধা সময়ের মধ্যে যত বেশি সম্ভব দ্রষ্টব্যকে ছুঁয়ে যাওযার কৃতিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার আত্মমর্যাদার বিষয়টি। প্রতিবেশীর সঙ্গে নিরন্তর ঠান্ডা লড়াইয়ে হারজিতের প্রশ্নও। সে বস্তুতপক্ষে কিছু দেখতে, কোনও জায়গাকে অনুভব করতে উৎসুক নয়। সে যায়— দেখে এলাম— এই শ্লাঘা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক জয় নিশ্চিত করতে। এইভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে ছুটে চলার মধ্যে গতি, অচেনা পথের ঝুঁকি—সব মিলিয়ে যে রোমাঞ্চ, শিহরণের মেঘ-রোদ্দুর খেলা তাই-ই অ্যাডভেঞ্চার টুরিজমের আধুনিক চেহারা। সেখানে গন্তব্যস্থল একটি উপলক্ষ মাত্র। বিদেশি ভ্রমণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা উইক এন্ড, লং ড্রাইভ ইত্যাদি শব্দগুলিকে নিজেদের জীবনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে জুড়ে নিতে

পারলে আরও একটু বিশিষ্ট, অসামান্য হয়ে ওঠা সম্ভব। জাভাযাত্রীর পত্র-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'সিদ্ধির পথে চলা দৌড়ে, সুন্দরের পথে চলা ধীরে। আধুনিককালে সিদ্ধির লোভ প্রকাণ্ড প্রবল; তাই আধুনিককালে বাহনের বেগ কেবলই বেড়ে যাচ্ছে যাকিছু গভীরভাবে নেবার যোগ্য, দৃষ্টি তাকে গ্রহণ না করে স্পর্শ করেই চলে যায়।'

সেই সঙ্গে রয়েছে প্রথাভাঙার প্রলোভন। প্রতিদিনের জীবনে হাজারো উচিত-অনুচিতের সামাজিক নিগড়ে ব্যক্তির বসবাস। এই ঘেরাটোপের বাইরে যে সাময়িক মুক্তজীবনের প্রতিশ্রুতি, সেখানে কিছুটা বেহিসেবি, বেনিয়ম হবার দুরন্তপনা তাকে স্বভাবতই পেয়ে বসে। নিয়ম ভাঙার তাড়নায় খাদ্যপানীয় থেকে শুরু করে পোশাক, পরিচ্ছদ, কেনাকাটা, সময় অসময় সব ক্ষেত্রেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠার তাগিদ। মধ্যবিত্ত জীবনের সাধারণ বিধিনিষেধের বাঁধ ভাঙার আনন্দ। যে বাঙালি গৃহবধূ পরিবারের চৌহদ্দিতে পোশাক-আশাক ও চালচলনে অনিচ্ছাকৃত ভাবে প্রথাবদ্ধ, তিনি সফরে এসে তাঁর প্রাক-বিবাহিত জীবনের স্বাধীনতা ফিরে পেতে চান কিছুটা হলেও। যিনি ইচ্ছা থাকলেও মদ্যপান থেকে শতহাত দূরে থাকেন পরিবারের ও প্রতিবেশীর ভয়ে, তিনি বাইরে বেরিয়ে সেই নিষিদ্ধ আনন্দে মত্ত হবার সুযোগ পান। এই নিয়ম ভাঙার খেলা অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়। ঘটে মারাত্মক পরিণতিও। মত্ত অবস্থায় সমুদ্রে স্নান করতে নেমে প্রাণ হারানের খবর আজকাল আকছার। ভারতী মুখার্জির 'দি টাইগারস ডটার' উপন্যাসটি কয়েকটি মেয়ের গল্প। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এ গিয়ে একটি হোটেলে ওঠে তারা। সেই পাহাড়ি ছোট্ট শহরে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারে এমন অশোভনতা প্রকট হয়ে ওঠে যা কলকাতার মধ্যবিত্তসমাজে অকল্পনীয়। চলচ্চিত্র, দূরদর্শনের সৌজন্যে প্রথাবহির্ভূত আচরণে অভ্যস্ত হবার জন্য নমুনার অভাব নেই।

স্থানীয় বনাম বহিরাগত

টুরিস্টদের ভিড় ও অসংযত আচরণ অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় অধিবাসীদের ক্ষোভ, বিরক্তির কারণ ঘটায়। পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠার সুবাদে স্থানীয় মানুষদের উপার্জনের ক্ষেত্রে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেখা দেয়। তবু বহিরাগতদের সম্পর্কে তাদের সাধারণ মনোভাব খুব সদয় নয়। তাজমহলে পর্যটকের স্রোত আগ্রা শহরটিকে কতদূর বিপর্যস্ত করেছে তার ছবি এক বিদেশি লেখকের কলমে এ রকমঃ

Agra brings out the most venal in people with its hordes of touts, agents, fixers, middlemen, fleecers, milkers, extrators, hangers-on, advisers,smooth-talkers,double-dealers, crafty artists and seedy salesmen. A visit to the Taj will put most tourists off India for life.[২২]

এই দৃশ্য একান্তভাবে আগ্রারই, এমন কথা বলা যাবে না। পুরীর মন্দির, কলকাতার দক্ষিণেশ্বর-কালীঘাট থেকে যে কোনও জনপ্রিয় সৈকত ও শৈলশহরের একই ছবি। সর্বত্রই মাস টুরিজমের দৌলতে বহিরাগতদের স্রোত স্থানীয়দের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই অসহনীয়। ইউরোপে স্থানীয় ও আগন্তুকদের মধ্যে সম্পর্ক যে তিক্ততায় পৌঁছেছে, তা দেখে ভারতীয় পর্যটনের ভবিষ্যৎ আঁচ করা যায়। ইংল্যান্ডে উইন্ডসর, বাথ ইত্যাদি জায়গায় স্থানীয়েরা এত তিতিবিরক্ত যে অনেক সময় বাসের খোলা ছাদের দিকে জলের পাইপের মুখ ঘুরিয়ে দেয়। টুরিস্টরা, তাদের মতে,শহরের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। ভিড়, দূষণ ইত্যাদি সমস্যায় অধিবাসীরা উত্যক্ত। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনভূমি ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল অঞ্চল বিপন্ন। রাষ্ট্র সংঘের একটি তথ্য অনুযায়ী ১৯৮০ সালে এখানে আসত এক কোটি পর্যটক। ২০২৫ সালে তা দাঁড়াবে ৭৬০ মিলিয়ন। পরিণামে ঘাটতি দেখা দেবে খাদ্য, পানীয় এবং শ্রমশক্তিতে। ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরে ১৯৮০ দশকে জনসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ। প্রতিবছর সেখানে সতেরো লক্ষ পর্যটক ভিড় করে। ফলত শহরটি এখন পুরোদস্তুর টুরিস্টদের জন্য বলি প্রদত্ত। শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রগুলিকে পরিকল্পিতভাবে শহরতলি অঞ্চলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

আমাদের দেশে পরিস্থিতি ততদূর গড়ায়নি এখনও। তবু যে কোনও পর্যটনকেন্দ্রেই স্থানীয়দের দৃষ্টিতে এই ক্ষণিকের অতিথিরা স্বাগত নয়। দু'পক্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান দুস্তর। উদয়াস্ত প্রাণপাত করে চলা স্থানীয় বাসিন্দাদের দৃষ্টিতে বিলাসী বহিরাগতদের সুখী বিচরণ স্বভাবতই অনুমোদিত নয়। পর্যটকদের আরাম, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসিতায় মোড়া অবসর যাপনের ধরন তাদের কাছে যথেষ্ট দৃষ্টিকটু এবং ঈর্ষার বস্তুও বটে। বহিরাগতদের পোশাক-আশাক, রীতিনীতি, চলন-বলন, আদবকায়দা এমনিতেই স্থানীয়দের চেয়ে আলাদা। তা ছাড়াও কিছু কিছু অভিনবত্ব সংযোজিত হয়। সে সব নিয়ে তারা স্থানীয় মানুষজনের দৃষ্টিতে কৌতুক ও কৌতূহলের বস্তু যতটা, তার চেয়ে অনেক বেশি বিরক্তির উপাদান। নীতিগতভাবে পর্যটন সাংস্কৃতিক পাঠ ও সমন্বয়ের অঙ্গ হিসাবে গণ্য। একটি অপরিচিত সমাজ-সংস্কৃতিকে জানার সুযোগ। কিন্তু যেখানে বহিরাগতদের ভিড় ও আচরণে স্থানীয়েরা বিরক্ত, সেখানে এর অবকাশ কতটুকু? কোনও পক্ষই এই পরিস্থিতিতে সংস্কৃতি নিয়ে ভাবিত

নয়। দ্রষ্টব্যের বিবরণ সম্বলিত গাইডবুক সাংস্কৃতিক তথ্যের কোনও হদিশ দেয় না। যে প্রাপ্তিতে পর্যটকের সন্তোষ, সে টুকুই গাইডবুকের প্রতিপাদ্য। ফিজি দ্বীপের পর্যটন সম্পর্কে এক ভাষ্যকারের মন্তব্য 'আজকের পর্যটন মনকে উদার করে না, বরং আরও সংকীর্ণ করে দেয়।' শুধু ফিজি কিংবা তৃতীয় বিশ্ব নয়, এ মন্তব্যের যথার্থতা সর্বজনীন। স্থানীয়দের হালহকিকৎ সম্পর্কে উদাসীন আধুনিক টুরিজম সহমর্মিতা নয়, পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। পর্যটককুল স্থানীয় মানুষের সংস্রব থেকে সব অর্থেই দূরস্থ। সমাজতাত্ত্বিক ভ্যানডেনবার্গ-এর মতে বহিরগত-স্থানীয়দের পারস্পরিক সংযোগ, বস্তুত পক্ষে মানবিক সম্পর্কের ট্র্যাজেডি। ১৯৭০ সালে গ্রিক অর্থোডক্স চার্চ একটি নতুন প্রার্থনা চালু করেছিল। প্রভু যিশুর কাছে তাদের কাতর মিনতিঃ

Lord Jesus Christ, son of God, have mercy on the cities, the islands and the villages of this orthodox fatherland, as well as the holy monastaries which are scourged by the worldly touristic wave.....[২৩]

পর্যটক ও স্থানীয়দের মধ্যে সম্পর্কের ধরনটি অস্বস্তিকর। স্থান থেকে স্থানান্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রমোদ-পিয়াসী একদল বহিরাগত একদিকে, অপরদিকে একটি প্রায়-স্থাণু সমাজ যার দায় বহিরাগতদের আতিথেয়তাদান। অর্থাৎ তাদের স্বাচ্ছন্দ্য, ইচ্ছে-অনিচ্ছের তদারকি। উভয়ের মধ্যে যে লেনদেন তা ক্ষণিক, অনিয়মিত। এই সংসর্গে অংশগ্রহণকারীরা স্থায়ী সম্পর্কের পরোয়া করে না। তাৎক্ষণিক তৃপ্তিকেই মূল্য দেয়। যেহেতু বহিরাগতরা তাদের আচার-আচরণের সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন, তাই পারস্পরিক আস্থা বা বিশ্বাস গড়ে তোলার দায়ও থাকে না। ফলত এই পারস্পরিকতার মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস শঠতার সহজ অনুপ্রবেশ ঘটে। উভয়পক্ষই এ বিষয়ে সচেতন যে তার শত্রুতা, অসততার প্রতিটি ঘটনাই বিচ্ছিন্ন, তাদের কোনও প্রভাব থাকে না। এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অবস্থান বেশি সুবিধেজনক জায়গায়। কারণ বহিরাগতরা তাদের মেজাজ-মর্জির নির্ভরশীল। বহিরাগতদের অবসর বিনোদনকে ঘিরে স্থানীয়দের কর্মতৎপরতা। পরিস্থিতির এই বৈপরীত্য থেকে ভুল বোঝাবুঝি, স্বার্থের সঙ্ঘাত। প্রাথমিকভাবে পর্যটকরা চিরাচরিত অভ্যাগত-গৃহকর্তা সম্পর্কেরই অঙ্গ। কিন্তু তাদের সংখ্যা যত বাড়ে, ততই আতিথেয়তার ঘাটতি দেখা দিতে থাকে। জনসংখ্যার চাপ প্রভাবিত করে সম্পর্ককে। আন্তরিকতা বদলে যায় অর্থনীতিতে। আতিথেয়তা হয়ে ওঠে একান্তভাবেই বাণিজ্যিক। পারস্পরিকতার ধরন হয়ে ওঠে অনেকটা শিকার-শিকারি সুলভ। পর্যটকদের সংখ্যা যতদিন কম থাকে, ততদিনই মানবিকতা ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্টের মূল্য থাকে। সমষ্টি পর্যটনের ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিক কারণেই অন্তর্হিত। আদান-প্রদানের মধ্য থেকে মানবিক লক্ষণগুলো হারিয়ে গিয়ে বঞ্চনা, শোষণ, শঠতা ও আরও নানা নীচতা দেখা যায়। পর্যটকদের সঙ্গে স্থানীয়দের আচরণের প্রক্রিয়ায় প্রথম অনুভব খুশি, তারপর অনীহা, চূড়ান্ত বিরক্তি ও সবশেষে শত্রুতার মনোভাব।

বিশ্বায়নের বাতাসে উন্নতিশীল দেশগুলিতে উন্নততর প্রযুক্তির দ্রুত প্রবেশের সুবাদে পর্যটনের বাজার প্রসারিত হয়েছে। যাতায়াত ও দূরদূরান্তরের পর্যটক-নিবাসে থাকার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা যখন বোতাম-টেপা দূরত্বে, তখন পর্যটকের সংখ্যায় যে বান ডাকবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রযুক্তির আশীর্বাদে উন্মোচিত ভ্রমণের আরও একটি দিগন্ত। ঘরছাড়া না হয়েও দৃষ্টিসুখের উল্লাস। টিভি, ভিডিও, ইন্টারনেট-এর সৌজন্যে চার দেওয়ালের মধ্যে বিশ্বদর্শন। যে আয়েসি পর্যটক হোটেলের ঘরের জানলা দিয়ে সমুদ্রের ঢেউ গুণে, চলন্ত ট্রেনে জানলা দিয়ে পাহাড় দেখে, কিংবা ছুটন্ত গাড়ির কাঁচের আড়াল থেকে নদীর প্রবাহ দেখে পরিতৃপ্ত, তার অভিজ্ঞতার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় জীবজন্তু দেখে, ঘরে বসে টিভি-র রিমোট বা কম্পিউটারের মাউস টিপে দেশবিদেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য নিরীক্ষণ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে কার্যত কোনও তফাত নেই। উভয় ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট ফ্রেমে চিত্রার্পিত দৃশ্যের নিষ্ক্রিয় উপভোগ। উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতির পর্যটকেরা বিশেষ কোনও অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে না। লং-ড্রাইভে ট্যুরিস্ট যে রকম ছুটে বেড়ায় এক একটি জনপ্রিয় স্পট ছুঁয়ে ছুঁয়ে, উত্তর-পর্যটকরা তেমনই ঘরে বসে মর্জিমাফিক এক চ্যানেল থেকে অন্য চ্যানেলে, এক সাইট থেকে অন্য সাইটে সফর করে বেড়ায় পথশ্রমের বালাই না রেখে। উত্তর-পর্যটনের প্রভাব, আর যাই হোক, ট্যুরিস্ট স্পটের ওপর সরাসরি পড়ে না। কিন্তু মাস টুরিজম বা গণ-পর্যটনের প্লাবনে নয়নাভিরাম নিসর্গ কি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে তার খতিয়ান নেই। পশ্চিমের দেশগুলিতে সচেতনতা বাড়ছে। কিন্তু এদেশে গণ-পর্যটনের ক্রমবর্ধমান বাজার কী ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনছে তা নিয়ে বিশেষ রব ওঠেনি এখনও। প্রবল প্রতিযোগিতার বাজারে পর্যটন ব্যবসায়ীরা শান্ত নির্জনতাকে মূলধন করে টুরিস্টস্পট গড়ে তুলছে দ্রুত। দরজা খুলে দিচ্ছে ভোক্তাদের সামনে নানান উপচার সাজিয়ে। পর্যটকদের প্রলুব্ধ করার ফিকির খুঁজতে গিয়ে যে সব পন্থা অবলম্বন করছে তা কোনওভাবেই অনুমোদনযোগ্য নয়। সৈকতের হোটেলগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার বলি হয়ে চলেছে তটভূমি। হোটেলগুলি মালিকানা বিস্তার করছে সি-বিচের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে, যাতে প্রতিবেশী হোটেলের ট্যুরিস্টরা যথেচ্ছ বিচরণের সুযোগ না পায়। এভাবে সাগরতীরে অবাধ ভ্রমণে বাদ সাধছে

তারা। কোথাও বা জমজমাট বাজার। তার সঙ্গে শহরের মাছের বাজারের তফাত নেই। চিল্কায় টুরিস্টদের বিহারের জন্য যন্ত্রচালিত নৌকো ডলফিনদের সর্বনাশ ডেকে আনছে। সাতপাড়া, বালুগাঁও-এর জেলেরা শীত পড়লে ট্যুর অপারেটরের ভূমিকায় লমবার্ডিনি ইঞ্জিন লাগানো বড় বড় নৌকো নিয়ে নামে দু'পয়সা আয়ের জন্য। মেশিনের লম্বা প্রপেলারের আঘাতে মারা পড়ছে উড়িষ্যার এই ঐশ্বর্য। ২০০১-২০০২ সালের মাঝামাঝি এভাবে প্রাণ হারিয়েছে এগারোটি ডলফিন।[১৪]

বাঁধে ফাটল, পাহাড় কেটে হোটেল, লজ, পর্যটক পরিষেবার ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে পরিবেশের ক্ষতি নিয়ে নীতি নিয়ামক মহলে বিশেষ ভাবান্তর নেই। রোমান্টিক পর্যটক তাই আজও চায় শান্ত নির্জনতা ধ্বংস হওয়ার আগেই মনোরম জায়গাগুলি যথাসাধ্য ঘুরে আসতে। এ ক্ষেত্রে সিকিম রাজ্যের পেলিং একটি আদর্শ উদাহরণ। ১৯৯০ সালেও যে পেলিং ছিল শুধুই গুটি কয়েক পরিবার-অধ্যুষিত একটি নিঝুম গ্রাম, মাত্র কয়েকটি বছরের ব্যবধানে তার পরিচিতি জনপ্রিয়তম ট্যুরিস্টস্পট হিসাবে। একটি ছোট্ট জনপদে কত শত হোটেল ও পর্যটক নিবাসের ঠাঁই হতে পারে শুধু তা আবিষ্কারের জন্যই পর্যটক আকর্ষণের যোগ্য এই জায়গাটি। দীঘা জনপ্রিয় সমুদ্রতটই। অদূরে শঙ্করপুর বিস্তৃত তটভূমি, ঝাউবন ও নির্জনতা নিয়ে এই সেদিন অবধি ছিল রোমান্টিক পর্যটকের স্বপ্ন-সফর। অভিযাত্রীরা অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কার করে, ভ্রমণ ইতিহাসের আবিষ্কারকে মেলে ধরে, আর পর্যটন বাণিজ্যিক উদ্যোক্তাদের আবিষ্কৃত পৃথিবীটাকে রাংতায় মুড়ে বাজারে চালান করে।

শাটার-সুখী সফর

সমাজতাত্ত্বিক ডেভিড হর্ন-এর মতে ক্যামেরা ও পর্যটন হল বাস্তবকে সংস্থায়িত করার অনন্য দুটি আধুনিক পদ্ধতি। ঝুমপা লাহিড়ির 'ইন্টারপ্রেটার অব ম্যালাডিজ' গল্পে অনাবাসী ভারতীয় মি. দাস সপরিবার উড়িষ্যা সফরে ব্যস্ত। একটি ভাড়া গাড়িতে গাইড-নির্ভরতায় একের পর এক স্পট ঘুরছেন তাঁরা। দাসমশায়ের হাতে পেটমোটা টুরিস্ট গাইড, গলায় ঝুলন্ত দামি ক্যামেরা। শুধু এই বাহ্যিক আড়ম্বরের সুবাদেই তাঁদের টুরিস্ট বলে চেনা যায়। কথাবার্তায় তা বোঝার উপায় নেই। সফরকালীন তাদের যাবতীয় কথাবার্তা ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক। এক একটি স্পটে পৌঁছে দাসগিন্নি স্মারক হিসাবে কিছু একটা কিনে আবার গাড়িতে উঠে আসেন। আর মি. দাস তাঁর হাতের বইটিতে এক ঝলক নজর দিয়ে দ্রষ্টব্য সম্পর্কে তথ্য জেনে নিয়ে পারিবারিক ছবি তুলে চলেন ক্রমাগত। তাঁর যা কিছু দর্শন সবই ভিউ ফাইন্ডারের আলোয়, মহার্ঘ ক্যামেরার ফ্রেমের সীমায়িত বর্গক্ষেত্রে। কোণারকের সূর্যমন্দির তাঁর কাছে সযত্নে তোলা কিছু ফোটোগ্রাফ মাত্র। দাসমশাই আজকের শাটার-সুখী টুরিস্টদের অন্যতম প্রতিনিধি। ক্যামেরা তাদের সফরের অপরিহার্য অঙ্গ। বস্তুত দাস দম্পতি এক জটিল আধুনিক জীবনের সফরকারী। তাদের পর্যটক হিসাবে উপস্থাপন প্রকৃতপক্ষে এক বাহ্যিক বাস্তবতা। আটপৌরে, বৈষয়িক জীবনের বাইরে শারীরিকভাবে চলে যেতে পারাটা তাদের কাছে যত সহজ, মানসিকভাবে তার চেয়েও বেশি কঠিন। স্যামুয়েল বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকে ভ্লাদিমির-এস্ট্রাগনরা পরস্পরকে বলে— চলো যাওয়া যাক। কিন্তু তারা যায় না কোথাও, নিজেদের জীবনের বৃত্তে কেবলই ঘুরে মরে। 'যাত্রী' রচনায় রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবনাই সত্য হয়ে ওঠে 'স্টিমারের যাত্রী, রেলগাড়ির প্যাসেঞ্জার বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে আসে তাদের দেওয়ালগুলোর সূক্ষ্ম শরীর তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে।' আধুনিক ট্যুরিস্টের পরিবেশ বিচ্ছিন্নতার সবচেয়ে প্রকট প্রতীক বোধহয় তার কাঁধের ক্যামেরাটি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পর্যটন ও ফোটোগ্রাফি পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠতে থাকে। ১৮৯০ সাল নাগাদ কোডাক কোম্পানির সৌজন্যে ক্যামেরার জনপ্রিয়তা ট্যুরিস্টদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক মানুষ এক সর্বব্যাপ্ত দৃশ্যমুখর সমাজের বাসিন্দা। দৃশ্য-নির্ভরতায় তার সুখ। দূরদর্শনের প্রভাব সেই নির্ভরতাকে আরও বেশি নিশ্চয়তা দিয়েছে। মানুষ সংবাদ থেকে গানবাজনা সবই দেখতে অভ্যস্ত। যা কিছু ছবিতে লভ্য নয়, তাও গ্রাফিক্সে অনূদিত হয়ে সাধারণের সামনে হাজির। এই দৃশ্যমুখর যুগে পৌঁছে পর্যটনও শুধুই দৃশ্যকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত। তার সঙ্গে এক কালে জড়িয়ে থাকা মানসিক অনুষঙ্গ বিসর্জিতই বলা চলে। কোনও সদর্থক, স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া ব্যক্তির মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তার অভিজ্ঞতার-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সত্তার মধ্যে তফাৎ ঘটে। অভিজ্ঞতার ফলে ঘটে যায় অন্তর্গত পরিবর্তন। একজন প্রকৃত ভ্রমণকারীর মানসিকতায় যে পরিবর্তন প্রত্যাশিত, আজকের নিষ্ক্রিয় প্যাকেজ ট্যুরিস্টের কাছে তা নিতান্ত অবান্তর অনুভব। যে পর্যটক ছবি তোলার নেশাটিকেই প্রকৃত পর্যটন বলে মনে করে, নিজের চোখে তার পক্ষে কিছুই দেখা সম্ভব নয়। তার যা কিছু দ্রষ্টব্য সবই ক্যামেরার চোখে দেখা। ক্যামেরার লেন্স তার তরফে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে। সাগরবেলায় একালের পর্যটক সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখতে যতটা উৎসুক, তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী সেই দৃশ্যটি ক্যামেরায় ধরে রাখায়। বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে সে আনন্দ সঞ্চয় করে না, কুড়িয়ে চলে শুধু স্মৃতিচিহ্ন। তার সংগৃহীত ছবির অ্যালবাম, প্রকৃত প্রস্তাবে তার অভিজ্ঞতার বিকল্প।

পর্যটন সংস্থার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেওয়া সফরসূচি অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলিতে উপস্থিত হতে পারার সপ্রমাণ কৃতিত্বের দাবিদার হওয়া সম্ভব সাধের ক্যামেরাটি সঙ্গে থাকলে তবেই। আধুনিক ট্যুরিস্টের কাছে সফরের চেয়ে অনেক বেশি উপভোগ্য তার ব্যয়বহুল সফরের সামাজিক বিজ্ঞাপন। সেই কাজটি সমাধান হয় সযত্ন সংগৃহীত ছবির মাধ্যমে। ট্যুরিস্টের কাছে ফোটোগ্রাফি এবং পর্যটন পরস্পরের পরিপূরক। টুর কনডাক্টর তাকে যা কিছু দেখিয়ে চলে, সে সবের মধ্যেই সে হাতড়ে বেড়ায় ক্যামেরায় ধরে রাখার মতো বিষয়বস্তু। সে নিজেও স্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য দুই-ই। পাথরের গায়ে আঘাত করে ফিরে ফিরে আসা ঢেউ যেমন বন্য, বেপরোয়া প্রকৃতির রূপকল্প, আধুনিক ট্যুরিস্টেরও তেমনই রূপকল্প হল ক্যামেরা কাঁধে আগন্তুক। ভ্রমণকে অভিব্যক্ত করে চলেছে ফোটোগ্রাফি। সফরের পথে মাঝে মাঝে থেমে ছবি তোলা, আবার এগনো। অর্থাৎ ছবি তোলার জন্যই চলা এবং থামা। গাইডই তাকে নির্দেশ দেয় কোথায় কোথায় ছবি তুলতে হবে। পর্যটন প্রক্রিয়াটি সংস্কৃতি থেকে শিল্পে রূপান্তরিত হওয়ার পেছনে ফোটোগ্রাফির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানুষকে আরও বেশি করে এই শিল্পের ভোক্তা করে তোলার জন্য প্রচারমাধ্যম মূলত আলোকচিত্র নির্ভর। এইসব আকর্ষণীয় ভিস্যুয়াল টিভি, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নতুন করে গড়ে ওঠা পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে সম্ভাব্য ভোক্তাদের সামনে অনবরত হাজির করছে। সেই পথ ধরেই পর্যটন শিল্পের বিশ্বজোড়া বিস্তার। এ প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যেই: আমার মন ন্যাপশট বিলাসী মন নয়, সে চিত্রবিলাসী। **শেষ**

সূত্রনির্দেশ

২০. Masanobu Fukuoka, One Straw Revolution, The Other India Press, Goa, 1994, p18

২১. James Fisher, Sherpas, OUP, New Delhi, 1997, p118

২২. Bill Aitken, op. cit. p.41

২৩. Stelle & Yiannakis, op. cit. p.39

২৪. দি টেলিগ্রাফ, ৩০ নভেম্বর ২০০২

প্রবন্ধ

অন্ধকার আর আলোর গান : পাবলো নেরুদা

অভীক মজুমদার

১

'কবিতা পরিচয়'-এর পাতায় একটি কবিতার ব্যাখ্যা ঘিরে খুব উপভোগ্য এবং সারবান বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সময়ের দুই গুরুত্বপূর্ণ কবি, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় কবিতাটি সম্পর্কে লেখেন সুনীল (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩) আর সেই লেখা পড়ে ভিন্নমতের পথিক অলোকরঞ্জন চিঠি লেখেন পরের সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৭৩), আবার তারই জের টেনে আত্মপক্ষ সমর্থনের ভঙ্গিতে চতুর্থ সঙ্কলনে (শ্রাবণ ১৩৭৩) প্রত্যুত্তর দেন সুনীল। দীর্ঘ এই চাপান-উতোরের মধ্য থেকে একটি ছোট প্রসঙ্গ আমাদের নজরে পড়তে পারে। কবিতায় একটি পঙ্‌ক্তি ছিল 'গোপনে নিজেই আমি মাছ ধরাবার নাম করে/ডুবিয়ে দিয়েছি তাকে নিরিবিলি সাঁওতালি দিঘিতে।' এই পঙ্‌ক্তিটি সম্পর্কে অলোকরঞ্জন লিখেছিলেন, "...'মাছ' আমাদের ব্রতকল্পের একটি বিশেষ এষণা (Motif) যা অনিবার্যতই ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার রূপক। কবি এখানে রূপককে জীবন্ত করে তুলেছেন যা ইদানীন্তন কবিতায় বিরল।" এর উত্তরে বেশ তীব্রতা নিয়ে বলেন সুনীল, '...কবিতায় এক জায়গায় আছে নিরিবিলি সাঁওতালি দিঘিতে মাছ ধরার কথা। "মাছ" বলতে অলোকরঞ্জন ব্যাখ্যা করেছেন "আমাদের ব্রতকল্পের একটি বিশেষ এষণা যা অনিবার্যতই ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার রূপক।" শুধু এই কবিতাটির জন্যই নয়, সমগ্র বাংলা কবিতার আলোচনাতেই এ-প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরি যে, "মাছ" বলতেই "অনিবার্যতই" রূপক খোঁজা ঠিক কিনা। মাছ "ইন্দ্রিয়ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা"র সঙ্কেত, খ্রিস্টানদের গোপন চিহ্ন, বাংলাদেশে শুভকর্মের দূত, মেক্সিকোতে কি জানি না— এসবই ঠিক, কিন্তু একজন লোক চুপচাপ দিঘিতে ছিপ হাতে মাছ ধরতে যায় না, যে-মাছ কোনও রূপক বা প্রতীক নয়, নিছকই যে-মাছ রান্নাঘরে ভেজে ফেলার?...' এর আগেই ওই চিঠিতে সুনীল জানিয়েছেন, 'পাহাড় মানে এই, নদী মানে এই, জ্যোৎস্না বলতে কবি অমুক বুঝিয়েছেন— এসব কথাবার্তায় কবিতাকে খুবই খর্ব করা হয়; ভেসে আসে ক্লাশরুমের গন্ধ।'

এই যুযুধান মন্তব্যগুলির পাশাপাশি সাগরপারের কবি পাবলো নেরুদার (১২ জুলাই ১৯০৪—২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩) একটি কবিতা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করার। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে সেই কবিতা—

'আমার পতাকাটি নীল, তাতে আড় করে ধরা একটা মাছ, তাকে বেড়ি পরাচ্ছে আর খুলছে দুটি বাজুবন্ধ। শীতের সময়, যখন জোর হাওয়া দেয়, এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাগুলোতে কেউ যখন থাকে না, তখন সপাং-সপাং-করা চাবুকের মতো পতাকার আওয়াজটা বেশ লাগে, আর মাছটা আকাশে এমনভাবে সাঁতার দিতে থাকে যেন একেবারে জীয়ন্ত।

লোকে জিগ্যেস করে, তো মাছ কেন? তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার নাকি! আমি বলি, আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা হল মীনতন্ত্রের মন্ত্র, প্রাক্‌বৈদিক, জ্যোতিরাঙ্গিক, ভর্জিত, স্বভাবী, কাবাবিক, ভাজা মাছ।

— তো ব্যস!

— ব্যস।

কিন্তু চড়া শীতে, মাছটা নিয়ে সেই পতাকাটা দাপাতে দাপাতে উঠে গিয়ে ঠাণ্ডায়, হাওয়ায়, আকাশে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে।'

(পতাকা)

লক্ষণীয় যে অলোকরঞ্জন আর সুনীল 'প্রতীক' আর 'বাস্তব' দুই ভিন্ন অভিব্যক্তিকে দেখতে চাইছিলেন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হিসাবে। দুই বিরোধী অবস্থানকে কৌতুকের ভঙ্গিতে মিলিয়ে দিলেন নেরুদা, বাজুবন্ধের কোনও বেড়িতেই বাঁধা থাকল না ওই মাছ, জীবনের মতো সামগ্রিকতায় উড়তে থাকল আকাশে। নীল পতাকার মাছ আর সাঁওতালি দিঘির মাছ নিয়ে প্রতীকবাস্তবের তর্ক নয়, পাঠকের সামনে খুলে গেল একটা তৃতীয় পাঠের সম্ভাবনা, জীবন্ত বাস্তব আর কাব্যপ্রতীককে জড়িয়ে নেবার সম্ভাবনা। এমন আগ্রাসী উল্লাসে সব তলকে আলিঙ্গন করার আবেগেই নেরুদার কবিতা এবং কাব্যবোধ রঞ্জিত হয়ে থাকে, কাব্য উচ্চারণে তিনি সুনিপুণ কৌশলে হয়ে ওঠেন সমগ্রের প্রতিনিধি— প্রতীকে আর বাস্তবে।

২

ঠিক একই যুক্তিতে রবার্ট ফ্রস্টকে তুলোধোনা করেছিলেন নেরুদা। একটি ছোট নিবন্ধে তিনি ফ্রস্টের গদ্যসংকলন সম্পর্কে বলেন, 'আমি সর্বদা বিশ্বাস করে এসেছি, কবিদের কবিতা বিশ্লেষণ নির্ভেজাল কিছু ছাইভস্ম। সে সব ছাইয়ের গাদা দেখতে বেশ খুবসুরৎ, কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় দেখতে দেখতে উড়ে যাবে।' কেন এত খেপে উঠলেন নেরুদা? ফ্রস্ট লিখেছিলেন, 'আমার ব্যক্তিগত কথা হল, আমি বিক্ষোভ একদম পছন্দ করি না। ও সব যেখানেই প্রকাশিত হোক আমি খুব আস্তে সেই পৃষ্ঠাগুলো আলাদা করে সরিয়ে রাখি। যা আমি পছন্দ করি, তা হল বেদনা...। আমি জানি এসব আশা কোনওদিন মিটবে না, কিন্তু অন্তত যদি আমরা বিক্ষোভকে শুধু গদ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, অবশ্য গদ্য যদি এই বোঝা বইতে রাজি হয়, আর কবিতাকে ভারমুক্ত থাকতে দিই যাতে চোখভরা জল নিয়ে সে নিজের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারে।' এ সব কথা নেরুদাকে একেবারেই খুশি করতে পারেনি। সরাসরি তিনি লেখেন, 'আমি ওই মহৎ কবিকে প্রশ্ন করি, 'কিন্তু ফ্রস্ট, আমাদের চোখের জলে কাকে আমরা বন্দিত করব?' তারপর বলেন, 'আমি এক প্রতিবাদী মানুষ যার চোখ জলে ভেজা। আমি গদ্যকে আন্দোলন আর লড়াই এবং কবিতাকে বেদনাবিধুরতায় বন্দি করতে পারি না। আমার তো মনে হয় ওরা একই লক্ষ্যের সহযোগী হতে পারে।'

কান্না আর প্রতিবাদকে আবারও মিলিয়ে দেখতে চান নেরুদা, দেখতে চান সামগ্রিকতায়।

কবিতাতেও রয়েছে এই দৃষ্টিভঙ্গির অজস্র প্রমাণ—

(১) 'সোমবারগুলো মঙ্গলবারের সঙ্গে
এবং আস্ত একটা বছরের সঙ্গে
নিটোল সপ্তাহগুলো
মাছের জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে।'
(অসংখ্য নাম/অনুবাদ: শহীদ কাদরী)

(২) 'অনির্দিষ্ট দুই স্বচ্ছতার মাঝখানে
আমাদের জীবন কি সুড়ঙ্গ হবে না কোনওদিনও?
(প্রশ্নের খাতা থেকে/অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

(৩) 'আমাকে বলো, সব বলো, পরম্পরার পর পরম্পরায়,
একটার সঙ্গে একটার যোগসূত্র দেখিয়ে, প্রতিটি
ধাপের পর ধাপ,
... আর আমাকে কাঁদতে দাও
আমাকে দাও তোমার নৈঃশব্দ্য, জল, আশা
আমাকে দাও তোমার সংগ্রাম, লৌহ, আগ্নেয়গিরি
আমার দেহের সঙ্গে তোমাদের দেহ এসে যুক্ত হোক।
চম্বুকের মতো।'
(জাগো, আমার সঙ্গে/অনুবাদ: সিদ্ধেশ্বর সেন)

আসলে, যে-কবিতার কথা লেখেন নেরুদা সে-কবিতা সংযুক্তির, আত্মাকে ছুঁয়ে থেকে বহুজনের হয়ে ওঠার আপাত অসম্ভব প্রকল্প, সেখানে বিযুক্তি বা বিচ্ছিন্নতার কোনও প্রশ্রয় নেই, হয়ত সে কারণেই তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে আসে বিপুল, মহাকায়, অনিঃশেষ শক্তিধর প্রকৃতির কথা, মাটি-সমুদ্র-আকাশ,অরণ্যের প্রসঙ্গ-- আসলে জীবন, যে-জীবন আর জীবনীশক্তি সূর্য আর চাঁদ, জোয়ার আর ভাঁটা, মৃত্যু আর জীবন, বীজ আর বার্ধক্য, খনিগর্ভ আর আকাশ, সমুদ্র আর পর্বতচূড়া সব বৈপরীত্যকেই জড়িয়ে ধরেছে তীব্রতম আবেগে। নেরুদার কবিতা হয়াত তারই প্রতিবিম্বে, তারই অনুকরণে লিরিক আর এপিক, দুয়ের কোনওটিকেই ছাড়তে নারাজ, ফলে একদিকে 'মাচ্চু পিচ্চুর শিখর থেকে' লেখেন, আর অন্যদিকে 'স্মৃতি'। জীবনের সমারোহ আর প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের তুমুল উৎসব— আর বিপরীতে, তাকে বিনষ্ট করতে উদ্যত ক্ষমতা-র প্রতি ঘৃণা— এই হল নেরুদার কবিতার মূল আয়তন। তাঁর কবিতার মহাকাব্যিকতা গীতিকবিতার ব্যক্তিক নির্যাসে সমৃদ্ধ আর অন্যদিকে গীতিকবিতার সুরে মহাকাব্যের অতলান্ত মাত্রা।

৩

কেমন কবিতা লেখার স্বপ্ন দেখতেন নেরুদা? 'অশুচি কবিতার অভিমুখে' প্রবন্ধে জানিয়েছেন তিনি— 'দিন অথবা রাত্রির কোনও প্রহরে শান্ত হয়ে থাকা বস্তুপৃথিবীর দিকে মন দিয়ে তাকিয়ে থাকা ভালো।... ওদের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে ধরিত্রীর সঙ্গে মানুষের সংযোগ-সহযোগের ইতিবৃত্ত...। বস্তুর ব্যবহৃত উপরিতল, বস্তুর আবরণ যা মানুষের হাতের বহুযত্নে বানানো, বস্তুর অস্তিত্বভরা বাতাস, যা কখনো ট্র্যাজিক, কখনো বা করুণ— সে সামগ্রিকতা পৃথিবীর বাস্তবকে আশ্চর্য আকর্ষণীয় করে তোলে যাকে কোনওমতে অবন্দিত রাখা চলে না।' তারপর স্পষ্ট বলেন, 'সেই হোক আমাদের কাঙ্ক্ষিত কবিতা: হাতের চাপে যা ক্ষয়ে গেছে, যেন অ্যাসিডে পোড়া, ঘামে আর ধোঁয়ায় চোবানো, লিলি আর পেচ্ছাপের গন্ধে মাখামাখি, যা ছিটিয়ে পড়েছে আমাদের জীবনধারণের নানা বেসাতির ধাক্কায়, সে আইনি বা বেআইনি যেমনই হোক।' আর তারপর অংশযতি দিয়ে দিয়ে তিনি মানুষের, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা আর দিনগত অভিজ্ঞতার 'অশুচি' চালচিত্রের অনুপুঙ্খে খুঁজে পেতে চান কবিতাকে— নানা বৈপরীত্য, বিরোধ, পরস্পর যুধ্যমান বিন্দুকেই জাপটে ধরতে উন্মুখ তাঁর কবিতাভাবনা— এক কথায় সামগ্রিকতার সংশ্লেষ।

বারংবার তাঁর কবিতা এই দৃষ্টিভঙ্গির নির্ভরে তথাকথিত গৃহীত, স্বীকৃত, 'বামপন্থী' বা 'রাজনৈতিক' কবিতার চেনা ঘেরাটোপ সম্পূর্ণ ভেঙেচুরে দেয়। চেনা ঘেরাটোপ বলতে 'বামপন্থী' কবিতার জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া কিছু হাতে গোনা বিষয়। বাংলা 'প্রগতি সাহিত্য' জুড়েও একই দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়। কবিতার বিষয় হিসাবে প্রেম, প্রকৃতি, শারীরিকতা বা প্রায় তার কোনও চিহ্ন থাকলেই 'বিপ্লবী' সাহিত্যতাত্ত্বিকরা তৎক্ষণাৎ তাকে কড়াভাষায় নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন অথবা তাকে এককথায় নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বিদেশিসাহিত্যও খুব ব্যতিক্রম নয়। সে জন্য নেরুদার কবিতায় লক্ষণীয় বিষয় হল এত সংখ্যক 'প্রেমের কবিতা' অন্য কোনও 'বামপন্থী' কবি লিখেছেনে কি না সন্দেহ। অথচ সেই প্রেমের কবিতাই হয়ে ওঠে 'রাজনৈতিক' কবিতা। এ ক্ষেত্রেও নেরুদা দুই 'বিরুদ্ধ' প্রান্তকে স্বীয় ক্ষমতাবলে মিলিয়ে নিয়েছেন। প্রেমের কবিতাকে রাজনৈতিক কবিতা এবং রাজনীতিতে ব্যক্তি যৌনচেতনার আরোপ— শরীরী আকাঙ্ক্ষা আর সমাজবদলের আকাঙ্ক্ষাকে দক্ষ হাতে মিলিয়ে দেওয়া প্রমাণ করে যে বিচ্ছিন্নতা নয় সংযোগের সামগ্রিকতাই নেরুদার আগ্রহ। ব্যক্তিগত স্তরে বহু নারী এসেছে তাঁর জীবনে, একাধিক বিবাহসম্পর্কে বাঁধা পড়েছেন তিনি, মারুকা, দেলিয়া, মাতিলদে থেকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় স্ত্রী মাতিলদের ভাইঝি আলিসিয়া— নতুন নতুন প্রেমসম্পর্ক বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদের জ্বালানিকে যেন উশকে তুলেছে। নামহীন কবির লেখা হিসাবে 'ক্যাপ্টেনের কবিতাবলি' (১৯৫২) প্রকাশিত হয়েছিল নেপলস থেকে, তৎকালীন স্ত্রীর কাছে নতুন প্রেমের সংবাদ গোপন রাখতে। কিন্তু সেখানেও জানানো হয়েছিল এই প্রেমের কবিতাগুচ্ছে রয়েছে মাতিলদের প্রতি প্রেম আর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সমালোচনা। কত সহজে নেরুদা মিলিয়ে দিয়েছেন দুই ভিন্নমুখী অনুভূতি। হয়ত, জীবনের বিস্তীর্ণ আবেগ আর দৈনন্দিনের পরিচিত খুঁটিনাটি সহজ সাবলীলতায় মেলাতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কবিতা এত জনপ্রিয় হয়েছে। তাঁর 'কুড়িটি প্রেমের কবিতা আর একটি হতাশার গান' আজ পর্যন্ত স্পেনীয় ভাষাভাষী দুনিয়ায় বিক্রির হিসাবে বাইবেলের ঠিক পরেই। প্রেমসম্পর্কগুলি সম্পর্কে নেরুদার বক্তব্যও কিন্তু, পারস্পরিক ক্ষোভ, দ্বেষ, সন্দেহ নয়, খানিকটা জীবনউৎসব উদযাপনের মতো শোনায়—

'আসলে প্রেমের কোনো জন্ম হয় না
মৃত্যু হয় না— এক দীর্ঘতর নদী বহে যায়
শুধু জমি পাল্টায়, শুধু ঘাট পাল্টায়, ঠোঁট পাল্টায়...'
(প্রেমের সনেট থেকে একটি। অনুবাদ: সুবোধ সরকার')

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিনারী/পুরুষ নয়, প্রেমকে সার্বিক সামগ্রিক মানবিক অনুভূতি হিসাবে দেখতে চান নেরুদা।

৪

একই কথা বলা চলে তাঁর আলো আর অন্ধকার, দুই বহুব্যবহৃত কাব্য-এষণা প্রয়োগের ক্ষেত্রে। বাংলা কবিতায় তো বটেই, ইংরেজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় কবিতাতেও, বিশেষত রাজনৈতিক কবিতার ক্ষেত্রে আলো— অন্ধকারের বৈপরীত্য এবং আঁধারের বিরুদ্ধে আলোর জয় বহু পরিচিত এবং বহু ব্যবহৃত বনাম-বিদ্ধ প্রসঙ্গ। এই দুয়েরই সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে আলো অর্থে সদর্থকতা, উদ্ভাস, স্বপ্নপূরণ এবং উল্টোদিকে আঁধার অর্থে নঙর্থকতা বা ব্যর্থতা হিসাবে। সাম্প্রতিককালে উত্তরগঠনবাদী তাত্ত্বিক সমালোচকরা মনে করেন এর পেছনে স্বতঃই ক্রিয়াশীল আলোকপর্ব বা দীপন যুগের একমুখী প্রভাব। ইউরোপ মহাদেশ থেকে উপনিবেশগুলিতে বিশেষ রাজনৈতিকতার স্বার্থে এবং প্রণোদনায় এর বিকাশ। 'বামপন্থী' কবিতার মূলধারাও এ প্রসঙ্গে বহু সমালোচিত। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ নেরুদার কবিতায় আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি এই দুইয়ের চমকপ্রদ সহাবস্থান। আলো আর আঁধার, প্রকৃতির সমগ্র প্রেক্ষাপটের মতোই পরস্পর পরিপূরক হয়ে ওঠে তাঁর কবিতায়—

(১) 'রাত্রি আসে, সমস্ত নক্ষত্র-তারকাকে এককাট্টা ক'রে
যেন একটি পেয়ালা,
স্বপ্নে স্বপ্নে ডুবিয়ে দেয় মানুষকে...
আবার একটি দিনের জন্ম হয়।'
(দিনের আলোর সঙ্গে রাতের চাবি)

(২) 'শহর, লাল তারা, বলো মানুষকে আর সমুদ্রকে,
শহর, বন্ধ করো তোমার আলোর দ্যুতি, বন্ধ করো
তোমার শক্ত দরজা,
জেনে রাখো, শহর, তোমার স্মরণীয় শিরোমাল্য এখন
রক্তাক্ত
তলোয়ারের, গ্রহনক্ষত্রের পাশে রাত্রি উঠুক কেঁপে
তোমার চোখের কালো দীপ্তিতে।'
(স্তালিনগ্রাদের জন্য গান। অনুবাদ: রবিন পাল)

(৩) 'স্বাধীনতা ঝাঁকি দেয় রক্তমাখা সব ঘণ্টায়
আর তীব্র যাতনার এক ভীষণ শব্দ ঘোষণা করে দেয়
মানবজাতির রক্তে রাঙানো উষা।'
(বোলিবারের জন্য গান/অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

(৪) 'আর কিছু নয়
সত্যের সঙ্গে আমার চুক্তি
এ পৃথিবীর জন্য সঞ্চয় করবো আলো।'
(আর কিছু নয়)

হয়ত কোনও সাহিত্য বা সমাজতত্ত্বের প্রভাবে নয়, নেরুদা এই পঙ্‌ক্তিগুলি লিখছিলেন তাঁর স্বভাবজ সামগ্রিকতা— সন্ধানী

অবস্থান থেকে। একটি কবিতায় তাঁর প্রবণতার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাবে, 'সবকিছুই নকল করি আমি, পাহাড় নদী মেঘ, ঝাঁকাই আমার ঝর্নাকলম...'। প্রকৃতির উদাত্ত আদিম শক্তিমত্ত সত্তায় বিভেদবিচ্ছিন্নতা বলে কিছু নেই, আছে এক ঐক্যবদ্ধ অস্তিত্ব— নেরুদা স্পষ্টতই তাকে অনুসরণ করেছেন।

তবে দিন/রাত্রি, আলো/অন্ধকারের সবথেকে চমকপ্রদ ভারসাম্যরক্ষার চিহ্ন লক্ষ করা যাবে দুটি বক্তৃতায়। দুটির মধ্যে তিনদিনের মাত্র তফাত। প্রথমটি স্টকহোমে নোবেল পুরস্কার গ্রহণের ভোজসভায় আর দ্বিতীয়টি তাঁর নোবেল পুরস্কার গ্রহণের মঞ্চে উচ্চারিত।

(১) '... এবার ফিরব শাদা পৃষ্ঠার কাছে। শাদা পৃষ্ঠা সবসময়েই অপেক্ষা করছে কবিদের জন্য। তাদের অন্ধকার আর রক্ত দিয়ে পূর্ণ হবার জন্য। ঠিক এই কারণেই রক্ত আর অন্ধকার দিয়ে কবিতা তৈরি হয়, তৈরি হওয়া উচিত।' (১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১) (অনুবাদ : শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

(২) ''আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে, এক দুঃস্থ কিন্তু আশ্চর্য ধীমান কবি, সবার মধ্যে যাঁর ছিল সবথেকে গভীর মর্মবেদনা, এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: 'কোনো উষায় জ্বলন্ত ধৈর্যে সশস্ত্র হয়ে, আমরা গিয়ে পৌঁছবো আলো ঝলমল পরমনগরে।'... অবশেষে আমি সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে, মেহনতি জনতাকে, কবিকে বলতে চাই, সমগ্র ভবিষ্যৎ আলোকদ্রষ্টা র‍্যাঁবোর পঙ্‌ক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে: শুধু জ্বলন্ত ধৈর্য নিয়েই আমরা জয় করে নিতে পারব আলোকদীপ্ত সেই সুরম্য নগর যা মানবতাকে দেবে জ্যোতি, সমানাধিকার আর মর্যাদাবোধ।'' (১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১— নোবেল ভাষণ।)

বাঙালি পাঠকের কি এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে না জীবনানন্দের অমোঘ উচ্চারণটি— 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়'?

৫

কিন্তু প্রকৃতিসুলভ সামঞ্জস্যরক্ষার তাগিদে নেরুদা কি বহুলাংশে শমিত করে ফেলেছিলেন তাঁর প্রতিবাদী আবেগের উত্তুঙ্গ বিক্ষোভ? তেমন অবশ্য মনে হয় না। ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মৃত্যুর আগে তিনি লেখেন, 'চিলিবিপ্লবের গরিমা আর নিক্সননিধনের ডাক' (১৯৭৩)। আজকের পৃথিবীর ইরাক জুড়ে যখন অন্যায় আর অত্যাচারের তাণ্ডব, কোন নোবেলজয়ী কবি কোন আক্রমণকারী রাষ্ট্রনায়ককে হত্যার আহ্বান জানিয়ে কবিতা লিখেছেন আমার জানা নেই। হয়ত এমন কোনও নীরবতার মুহূর্ত লক্ষ করেই, বিদ্রূপে ফেটে পড়েছিলেন নেরুদা জরদ্‌গব কবিদের বিরুদ্ধে, আমাদের বিরুদ্ধে—

'কী করছ তোমরা, জিদ্‌পন্থীরা
বুদ্ধিজীবীরা, রিলকেপন্থীরা
অতীন্দ্রিয়বাদীরা, ছদ্ম অস্তিত্ববাদী
আফিমফুলের দল যারা আলো হয়ে থাকে
গোরস্থানে, ইউরোপমনা
ফ্যাশানে দোলা মৃতকল্পের দল...
কিছুই করছো না তোমরা বরং পালিয়ে বেড়াচ্ছ:
বিক্রি করছো ডাঁই হয়ে থাকা আবর্জনা,
খুঁজছো স্বর্গীয় চুল,
ভীতিসঞ্চারী গাছগাছালি, আঙুলের ভাঙাচোরা নখ
'শুদ্ধ কর্ম', 'যাদুর খেলা'...
(অভিযোগ করি/অনুবাদ: রবিন পাল)

৬

একটি আত্মজৈবনিক গদ্যে এবং একাধিক সাক্ষাৎকারে শৈশবের একটি অমলিন স্মৃতির কথা বলেছিলেন নেরুদা। নেরুদাদের বাড়ির পেছনে একটা বেড়া ছিল। সেই বেড়ার মধ্য থেকে একটি ছোট্ট হাত বেরিয়ে এসে নেরুদাকে একটি উপহার দিয়েছিল— খেলনার এক ভেড়া। ছোট্ট নেরুদাও বাড়ির মধ্যে ফিরে গিয়ে নিয়ে আসেন এমন একটা জিনিস যা তাঁর সর্বাধিক প্রিয়— পাইনের এক মোচা।— আর সেটা ফোকর গলিয়ে অন্য পাশে দিয়ে দেন। এ সম্পর্কে নেরুদার মন্তব্য ছিল, এই ঘটনাটা তাঁকে বুঝতে সাহায্য করে এই সত্য যে কেউ যদি মানুষকে কিছু দেয়, তা হলে এমন কিছু ফিরে পায়, যা আরও সুন্দর।

আমরা, পাঠকরা, একটু থমকে যাই। থমকে যাই বক্তব্যের সৌন্দর্যে। প্রথম প্রসঙ্গের পুনরবতারণা করে বলা চলে, এ মন্তব্যে মিশে গেছে বাস্তব অভিজ্ঞতা আর প্রতীকী তাৎপর্য। সুনীল নিশানে ভেজে ফেলার মাছ আর 'অ-লৌকিক' তাৎপর্যবাহী মাছ এভাবে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে থাকে, কোনও বিরোধিতা ছাড়াই। বাস্তব আর প্রতীকের সহাবস্থানে-সংযোগে গড়ে ওঠে তৃতীয় ভূখণ্ড। বাস্তব পেরিয়ে প্রতীকে নয় কিংবা প্রতীক সরিয়ে বাস্তবে নয়, প্রতীকে এবং বাস্তবে। নেরুদার কবিতার শক্তি এই ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত।

কয়েকটি জরুরি তথ্য জানিয়ে সাহায্য করেছেন তরুণ কবি এবং স্পেনীয় ভাষাবিদ শ্রীশুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রবন্ধ

সৈয়দ মুজতবা আলী : আহার, আসব ও তাম্রকূট

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

আহারাদি নিয়ে কথার শেষ নেই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক স্তরে বিষয়টি অবিরাম চর্চিত ও আলোচিত হয়ে চলেছে। প্রায় ৩৫ হাজার বছর আগে আলতামিরার গুহাচিত্রেও পাই আহারের ইশারা। সেই সব রেখাচিত্রের গুছনো একটা চেহারা নেই বটে কিন্তু শিকারির অস্ত্র ও ধারমান পশু আছে। পৃথিবীর যুদ্ধ-সন্ধি-মান-অভিমান বিপ্লববিদ্রোহে যে আহারের কারণেই তা তো জানিই। আজও আহার এই পৃথিবীতে সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দু। অন্নদান দত্তের বয়ানে জানতে পারি বিশ শতকের শেষের দিকে মহাচিনে কমিউনিস্ট জামানাতেও গা শিরশির করা দুর্ভিক্ষ হয় এবং অনেকের প্রাণ যায়। অন্নদান দত্তের কথা, যদি চিনে গণতন্ত্র থাকত, তা হলে এই দুর্দৈব ঠেকানো যেত। কারণ দুর্ভিক্ষের খবর পৃথিবীতে পৌঁছত, তাহলে সাহায্য আসত। কিন্তু সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রীয় সংবাদপত্র ব্যতীত অন্য খবরের কাগজ সেখানে নিষিদ্ধ। সেই সংবাদপত্র দুর্ভিক্ষের কথা বিশ্বকে জানতে দেয়নি। বাকি সংবাদমাধ্যমও রাষ্ট্রের কবজায়।

পৃথিবীর দিক মাত্র দশটি। আহারের কথা উঠলে তার দিকের হিসাব রাখা কঠিন। এর অনেক দিকই কালো, কিন্তু কিছু আবার অন্য রকমও। তাতে বীরত্ব, কবিতা, সহবৎ, শিল্প— কী নেই? অসম অঞ্চলের অধুনালুপ্ত একটি লোকগাথা বা গীতিকার কথা মনে পড়ছে। সেই লোক-গীতিকার নাম 'জন্ডিয়ার গীত।' তাতে চট্টগ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু দরিদ্র মানুষের সঙ্গে ইংরেজ শাসকের গেরিলা লড়াইয়ের একটা কাহিনি পাই। লড়াই লড়তে লড়তে চট্টগ্রামবাসীরা অসমে ঢুকে পড়েন এবং সেখানে পরাজিত হন। কাহিনির মূল এটাই। লড়াইটি শুরু হয়েছিল এক ভোজকে কেন্দ্র করে। জনৈক মান্যব্যক্তি তাঁর পুত্রের 'আকিকা' অনুষ্ঠানের দিন 'চট্টগ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেন।' 'আকিকা' অনুষ্ঠানটি বোধ হয় 'নামকরণ' সম্পর্কিত। বাদ ছিল সেখানকার তৎকালীন ইংরেজ ফৌজি ছোটসাহেব। তিনি তাতে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে সসৈন্যে এসে ভোজসভাটি লন্ডভন্ড করে দেন। সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে, শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে ইংরেজ তাড়ানোর লড়াই। এই লড়াই বা 'জাঙিয়ার গীত' এখানে আলোচ্য নয়। ভোজের একটু আভাস দেবার জন্য এত বলতে হল। সামান্য তার উল্লেখ করে প্রসঙ্গে ইতি টানব। ভোজের আয়োজন ছিল এই রকমঃ

চৌদ্দ বাঙ্গি কিনবায় হায়রে কইলাম সুন্দর।
চৌদ্দ জন বাবুর্চি আইনবায় পাউককার কারণ।।
চৌদ্দ বাঙ্গি চৌদ্দ ডেগে যে না ধরে আর।
সেইমতো দেখিয়া আনবায় কহি সারাংসার।।

আহারাদির চড়াগু করে ছেড়েছিলেন নবাব বাদশারাই। সে ফিরিস্তির মধ্যে ঢুকলে বেরিয়ে আসা কঠিন। আবদুল হালীম শরর-এর 'পুরোনো লাখনউ' গ্রন্থটি অনেকেই পড়েছেন। সেখানে তাঁরা দেখেছেন কী সে কাণ্ড। পোলাও আর বিরিয়ানির জাত-বেজাত, রুটির রকমারি আবিষ্কার, নেমতখানা-বাবুর্চিখানার কর্মীদের স্তরবিন্যাস ও আয়তন, খাদ্যকলার চর্চা ও নব নব সৃষ্টি, খাদ্য পরিবেশনের পরিচ্ছন্নতা ও শোভা, আবদারখানা— সব মিলিয়ে যেন মহাভারতকে হার মানায়। সেই তুলনায় হিন্দু রাজাদের ভোজন ছিল বেশ মাটো। ঘি, দুধ, লাড্ডুতেই শুরু শেষ। তার সঙ্গে কিছু ফল। বৈচিত্রের কোনও আবেগ চোখে পড়ে না। তবে মোগল বাদশাদের দেখাদেখি, তাঁদের সঙ্গে মেলামেশার দরুণ রাজস্থানের রাজারা নাকি মোগল কালচারের ন্যাওটা হয়ে পড়েছিলেন। তাতে ভোজনের চটক বা কালোয়াতি কতটা কী হয়েছিল সে বিষয় নিয়ে তেমন কোনও শরর-এর রচনা আমি অন্তত দেখিনি।

বাংলা সাহিত্যে আহারের উল্লেখ চর্যাপদ থেকেই শুরু। কম বেশি সেই ধারা এখনও চলেছে। রবীন্দ্রনাথের ঠাসবুনোন প্রেমের কবিতায়ও কী আশ্চর্য লিরিক হয়েই না খাদ্যের কথা অনায়াসে প্রবেশ নিয়েছেঃ

গদ্যজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো
পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়—
জেনো বাসনার সেরা বাসা রসনায়
... ...

শোভন হাতের সন্দেশ পাস্তোয়া
মাছ মাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।

শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী কতবার যে শ্রীকান্তকে পাত পেড়ে খাইয়েছে বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু খাদ্য বা আহার, সেই সঙ্গে পানীয়, ধুমপান ইত্যাদি নিয়ে বিহুলতা, প্রকৃত প্যাশান যাকে বলে, তা ছিল একমাত্র সৈয়দ মুজতবা আলীর। খাদ্য তাঁর রচনায় রাজসম্মান পেয়েছে, তিনি এই বিষয়ে কুতূবমিনার গড়েছেন। অনন্যসাধারণ ছিল সৈয়দ মুজতবা আলীর বৈদগ্ধ্য। এই বৈদগ্ধ্যকে রসের ভিয়েন করেছিলেন তিনি। বাঙালি পাঠক নতুন সাহিত্যের রাজ্য পেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, রসের মধ্যেই শুধু থেকে গেলেন বাঙালি, তাঁর বৈদগ্ধ্যে কেউ-ই তেমন নজর দিলেন না। বৈদগ্ধ্যের সমাদর হল না বলেই তাঁর মূল্যায়নও বাকি রয়ে গেছে। জানাই হয়নি রসের তলায় রাখা সাত রাজার ধন।

বলছিলাম তাঁর প্যাশান নিয়ে। লক্ষ করুন প্রথম বই 'দেশে-বিদেশে'। শুরুতেই এসে গেছে রান্নার অনুষঙ্গ। প্রথম পাতায় চার-পাঁচ লাইনের পর সেই 'গাঁক্‌গাঁক' করে ইংরিজি বলা, পাঠকের মনে না থাকার কথা নয়। প্রবাদের মতো হয়ে গেছে শব্দটা। গাঁক্‌গাঁক 'কাকে বলে?' 'ইংরাজি শব্দের প্রাণদেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবী ইংরাজি হয়' অর্থাৎ পয়লা সিলেবলে অ্যাকসেন্ট দেওয়া খারাপ, রান্নায় লঙ্কা ঠেসে দেওয়ার মতো— সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়'। রান্নার রাস্তাও যে তাঁর রচনায় অন্যতম রাজপথ হবে, এটা যেন প্রথম বইতেই গেয়ে রাখলেন। 'দেশে-বিদেশে' বাঙালির প্রাণহরণ করেছিল যখন কিস্তিতে কিস্তিতে ছাপা হচ্ছিল। আজও বাঙালি এই বইতে মজতে রাজি। শুধু এটি কেন, মুজতবার রচনাসমগ্রের বিক্রিও কম বলবে কে? এই শহরে শামিকাবাব খাননি এমন হিন্দু-মুসলমান কেউ আছেন কি? কাবাবটিকে আমি বুদ্ধিজীবী সুখাদ্য বলি, কেননা পানীয়ের সঙ্গে এটি রাজযোটক। কিন্তু শামিকাবাবের নামকরণ কি জানতে পারতাম যদি মুজতবা আলী না বলে দিতেন? পারস্যের একটি গ্রামের নাম শামি, সেখানে এটি আবিষ্কৃত হয়ে পুরুষানুক্রমে জিহ্বাকে আনন্দদান করে চলেছে। সেই 'উম্‌দা' গুকনো কোমল খাবারটি ভারতবর্ষেও আমাদের পুণ্যফলে আমরা নিয়ে আসতে পেরেছি। নামটি একটু কাব্য-ঘেঁষা। 'শামা' শব্দ উর্দু কবিতায় হর হামেসা চোখে পড়ে। অনেকে না জেনে হয়ত ভাবতে পারেন উক্ত 'শামা'র সঙ্গে 'শামি'র কোনও রকম রক্তের নয় মনের সম্পর্ক রয়েছে। তা নেই, কিন্তু কবি মির্জা গালিব কাবাব-রুটি রোজ, রোজার দিনেও খেতেন। শামি কাবাবও নিশ্চয় পরমানন্দে খেতেন অন্যান্য কাবাবের সঙ্গে, বলাই বাহুল্য।

'দেশে-বিদেশে'র কথা বলতে বলতে অনেকটাই প্যাচাল পাড়লাম। গাঁক্‌গাক তো জানলাম এবং রান্নার অনুষঙ্গও, আর? চলে আসুন দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়, পেয়ে যাবেন শিককাবাব ঢাকাই পরোটা, মুর্গা-মোসল্লম, আলু-গোস্ত, কপি-গোস্ত। এই গ্রন্থে কার্পেটে নক্‌শা-ফুলের কাজের মতো খানার কাজ রয়েছে। কাবুলে তাঁর চাকর অবদুর রহমান খানা সাজিয়ে রেখেছে টেবিলে 'ডাবর নয় ছোট-খাট গামলাভর্তি মাংসের কোরমা বা পেঁয়াজ-ঘিয়ের ঘন কাথে সেরখানেক দুম্বার মাংস, তার মাঝে মাঝে কিছু কিস্‌মিস লুকোচুরি খেলছে, এক কোণে একটি আলু অপাংক্তেয় হবার দুঃখে ডুবে মরার চেষ্টা করছে। আরেক প্লেটে গোটা আষ্টেক ফুল বোম্বাই সাইজের শামী কাবাব। বারকোশ পরিমাণ থালায় এক ঝুড়ি কোফ্‌তা পোলাও আর তার ওপর বসে আছে একটি আস্ত মুর্গি-রোস্ট।' এখানেই শেষ নয়। এবার এল একথালা ফালুদা, তারপর ডাবরে পেঁজা বরফের গুঁড়োর ভেতর বাগেবেলার আঙুর, তামাম আফগানিস্তানে মশহুর। তারপর সরঞ্জামসহ চা। 'পেয়ালায় ঢাললে অতি ফিকে হলদে রঙ দেখা যায়। সেই চায়ে দুধ দেওয়া হয় না। প্রথম পেয়ালায় চিনি দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পেয়ালায় তাও না।' সর্বশেষ আইটেম 'এক হাতে থলে ভর্তি বাদাম আর আখরোট, অন্য হাতে হাতুড়ী।' 'দেশে-বিদেশে' -এ জানতে পাই কাবুলিরা পান খান না।

এই যে বিসমিল্লা বলে খাদ্য নিয়ে শুরু হল, ধীরে ধীরে তা তাঁর অন্যান্য রচনায় কত বিচিত্র পথেই না 'নল' চালিয়েছে। কায়রো সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোথায় সাতকাহন করে পিরামিডের কথা বলবেন, তা নয়, মুজতবা পড়লেন রান্নার মশলা নিয়ে। অবাক হতে হয় মশলার ভূগোল, ইতিহাস জানতে জানতে। এ সবের তো কিছুই জানতাম না। কায়রোর মিশরি শিককাবাবে মশলার কঞ্জুসি থাকে, তাই স্বাদে সুখ পাওয়া যায় না। মশলার কথার গোড়াতেই মুজতবা আমাদের ওয়াকিফ্‌হাল করলেন, 'পৃথিবীতে কুল্লে দুই রকম রান্না হয়। মশলাযুক্ত এবং মশলা বর্জিত।' তারপর শুরু করলেন মশলার ঠিকুজিকুষ্টি, মশলার ভ্রমণবৃত্তান্ত। মশলা জন্মে প্রধানত ভারতবর্ষে, জাভায়, মালয়ে। ইউরোপে মশলা হয় না। তাই ইউরোপের রান্নায় মশলা দুর্লভ। তুর্ক পাঠানরা যখন ভারতবর্ষে এল তখন পশ্চিম এবং উত্তর ভারত নিরামিষ খেত। তুর্ক পাঠানরা মশলা-ছাড়া মাংস খেত। ভারতবর্ষে এসে 'মশলার সঙ্গে তাদের মাংস রান্নার কায়দা মিলিয়ে এক অপূর্ব রান্নার সৃষ্টি করল।' 'মোগল পাঠানরা এই রান্না আফগানিস্তানে তুর্কিস্তানে প্রচলিত করল। আস্তে আস্তে সেই রান্নাই তাবৎ মধ্যপ্রাচ্য ছেয়ে ফেলল।' খানদানি মুসলমানদের পক্ষে এই তথ্য মেনে নেওয়া কঠিন হবে। কিন্তু এটাই সত্যি। আরও আছে পাঠক! 'যত পশ্চিম পানে যাবেন, ততই মশলার মেকদার কমে আসবে।' আফগানিস্তানের রান্নায় যে হলুদ পাবেন

(কাবুলিরা বলে 'জরদ্ চোপ')। ইস্তাম্বুল অবধি সে হলুদ পৌঁছয়নি। তুর্করা বলকান জয় করে হাঙ্গেরি পেরিয়ে ভিয়ানার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। হাঙ্গেরির বিখ্যাত 'হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ' আসলে মোগলাই মাংসের ঝোল— কারণ এই তুর্করাই এবং তাদের নিয়ে যাওয়া রেসিপি, হলুদ। ভেনিসের খাদ্য 'ভিনসেট্ মিটে'র পোলাও, 'রিসোত্তো' ওই তুর্কদের রান্না দেখে তৈরি করা। গ্রিস দীর্ঘদিন তুর্কদের তাঁবেতে ছিল। 'পৃথিবীতে দ্বিতীয় উচ্চাঙ্গের রান্না হয় প্যারিসে কিন্তু মশলা অতি কম যদিও ইংরিজি রান্নার চেয়ে ঢের বেশি। এককালে তামাম ইউরোপ ফ্রান্সের নকল করত।... গ্রীস উভয় রান্নার সঙ্গম স্থল... যদি উত্তম আহারাদি করে কাটাতে চান...'।

জার্মানির একটি খাদ্য 'এস্পেরেগাস্'। মুজতবাকে এক বৃদ্ধা, ইহুদি, কাছে পেয়ে বললেন, 'এসপেরেগাস খাবেন— একটুখানি গলানো মাখনের সঙ্গে?' 'এসপেরেগাস মানুষে খায় পশ্চিম বাংলায় যে রকম আসল খাওয়া হয়ে গেলে টক খাওয়া হয়।' আসলে বৃদ্ধা জানতেন খাদ্যটা মুজতবার অতি প্রিয়, দিলেই খাবেন, আগে পরে বাছবিচার করবেন না। 'ভারতবর্ষে এসপেরেগাস আসে টিনে করে— তাতে সত্যিকারের সোয়াদ পাওয়া যায় না।' এবার শুনুন, 'সুইস খানা বেজায় পুষ্টিকর, তবু একটুখানি ভোঁতা।'

'জিনীভার লেকের পাড়... লেকের মাছ খেতে চমৎকার
বাপ রে সে কি বিরাট মাছ উদর আভ্যময়
মুখে দিলে মাখন যেন উদর ঠাণ্ডা হয়।

প্রাগ শহর। 'বড় হোটেল। সেখানে 'আ লা কার্তে' অন্তত এক শ' পদ রান্না হয়। তিন শ' রকমের মদ মজুদ আছে।' রাশানদের প্রিয় সরে মাখানো বর্শ স্যুপ।

আহারের সঙ্গে স্যালাড মুজতবার অতি প্রিয় জুটি। স্যালাড নিয়ে তাঁর রচনাকে গবেষণা বললেই মানায়। সবটা লিখতে গেলে অনেক। সামান্য সুলুকসন্ধান দিয়ে রাখছি। 'স্যালাড বললে দেশে বিদেশে প্রধানত লেটিস (ইংরিজিতে বানান lettuce কিন্তু উচ্চারণ লেটিস) স্যালাডই বোঝায়।' 'মাছভাজা যেমন বেশি আগে তৈরি করে রাখা হয় না। স্যালাডও তেমনি খেতে বসার যত অল্পক্ষণ আগে করা যায় ততই ভাল। তা না হলে পাতাগুলি নেতিয়ে একাকার হয়ে যায়।' স্যালাড বিলিতি পদ। তাতে অলিভ অয়েল ভিনিগার এবং আরও বিলিতি বস্তু লাগে। মজুতবা সে সবের বিকল্প দিয়েছেন বাঙালিদের জন্য। তিনি বলেছেন ছাড়ুন বিলিতি আদিখ্যেতা। স্রেফ সর্ষের তেল লেবুর রস আর স্যালাড পাতা— ব্যাস স্যালাড তৈরি। 'প্রশ্নটা, কতখানি পেঁয়াজ, টমাটো, শসা তেল নেবুর রস দেবে? এর উত্তর দেওয়া কঠিন। মনে রাখবেন লেটিস পাতাই হবে প্রধান জিনিস, সেই যেন সব জিনিসের ওপর প্রাধান্য করে... খাবার সময় লেটিস পাতা যেন আর পাঁচটা জিনিসের চাপে আপন স্বাদ না হারায়।' স্যালাড অন্য পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে খেতে হয়। এর ব্যত্যয়ও যে হয় না তা নয়। শুধুমাত্র স্যালাড— এক ও একমাত্র স্যালাড যদি চান তাহলে তাতে থাকবে মাংস, ডিম এবং মায়োনেজ। মায়োনেজ তৈরি ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার, বড্ড খুঁটিনাটি। বাজারে, তৈরি মায়োনেজ, বোতলে পাওয়া যায়। সেট কিনে নেওয়াই ভাল।

কাবুলিরা কিন্তু অতশত স্যালাডে নেই। তাঁরা এক ঠোঙা লটিস পাতা 'মধুতে গুত্তা' মেরে খেয়ে পরম তৃপ্তি পান। মুজতবা লেটিসের ব্যাপারে তথ্য দিয়েছেন, 'এদেশে লটিস ফলাতে জানেন অল্প লোকই... লটিস যেন বড্ড বেশি প্রাণবন্ত না হয়। তাকে যেন খানিকটে জীবন্মৃত রাখা হয়। লটিস পাতা পান ও তামাক পাতার মতই বড় ডেলিকেট লাজুক কোমল প্রাণ।' মুজতবা ভেবেছিলেন, 'বরজের মতো কোনও একটা ব্যবস্থা করে দেখলে হয়।' স্যালড বৃত্তান্ত শেষ করেছেন এই বলে, '...পাঠিকাদের সাবধান করে দিচ্ছি, স্যালাড এমন কিছু সুখাদ্য নয়।' ডাকাবুকো মুজতবা আলীও বাঙালির রসনাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না? বোধ হয় মনে পড়ে গিয়েছিল 'আপ্ রুচি খানা', তাঁর প্রিয় পদটা অন্যেরও প্রিয় হবে এমন কেন ভাববেন?

মুজতবা আলীর লেখায়, সিরিয়াস বিষয়ের মধ্যেও ঢুকে পড়ত আহারাদির রেফারেন্স। লিখছেন, বিমানে চলাফেরা যে কী অনাসৃষ্টি, এক হাত নিচ্ছেন পৃথিবীর তাবৎ বিমানে চড়ার ব্যবস্থাকে, সেখানে কোন ফোকর দিয়ে চলে এসেছে

'সোনা-মুগ সরু চাল সুপারি ও পান
ও হাঁড়িতে ঢাকা আছে দুই চারিখান
গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারকেল
দুই ভান্ড ভালো রাই-সরিষার তেল
আমসত্ত্ব আমচুর—'

আবার মহাপুরুষদের জীবনধারণ প্রণালী লিখতে গিয়ে সেখানে কত অসাধারণ তথ্য যেন গুরুত্বই পাচ্ছে না, পড়লেন কবিগুরুর চা পান নিয়ে। কোন লেখক লিখেছেন, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ চা পান করতেন না।' মুজতবা আলী 'বিস্ময়ে স্তম্ভিত'। 'আমি তাঁকে বহুবার চা খেতে দেখেছি, এ দেশী চা, যাকে সচরাচর ব্ল্যাক টি বলা হয়, উত্তম গোত্রবর্ণের অর্থাৎ, উজ্জ্বল সোনালী রঙের চা হলে তারিফ করতে শুনেছি।' চিন দেশ থেকে পাঠানো গ্রিন টি-র শেষ পাতাটুকুও রবীন্দ্রনাথ পড়ে থাকতে দিতেন না।

আফ্রিকার দিকে এবার 'নল' ঘুরিয়ে দেওয়া যাক। সোমালিয়ার জিবুটি বন্দর। কাফেতে ঢুকেছেন মুজতবা এক বন্ধুর সঙ্গে। সেখানে কাফেতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি। ওঁরা অর্ডার দিলেন 'নিম্বু পানি'। 'চুমুক দেবার জায়গায় গোটা আষ্টেক মাছি।'

'ওয়েটার দুটি চামর দিয়ে গেছে।' চামর দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। দৃশ্যটা ভাবুন পাঠক।

কাইরো, রাত এগারোটা। রান্নার খুশবাইয়ে রাস্তা ম-ম করছে, 'মনে হল চাট্টি খেয়ে যাই।' রেস্তোরাঁগুলি বেহদ্ নোংরা। তাতে কি? 'কালো গাই কি সাদা দুধ দেয় না?' 'আমরা টেবিল চেয়ার খেতে যাচ্ছি না, আমরা খেতে যাচ্ছি খানা।' এইসব সাতপাঁচের মধ্যে মুজতবা আলী এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে সমাসীন হলেন। 'পাশের টেবিলে দেখি একটা লোক দুটি শশা নিয়ে খেতে বসেছে।' 'যা থাকে কুলকপালে, আমি ওই শশাই খাব। এল দু'খানা শশা। কাঁটা দিয়ে একটু চাপ দিতেই বেরিয়ে এল পোলাও। সে পোলাওয়ের ভিতর আবার অতি ছোট ছোট মাংসের টুকরো টমাটোর কুচি এবং গুড়োনো পনীর... শশাটা সর্বশেষে ঘিয়ে ভেজে নিয়েছে... অপূর্ব এই চীজ... কী সোয়াদ... এরকম পাচেক্কে পাঁচ পদ আমি পৃথিবীতে কোথাও খাইনি।' তারপর খেলেন মিশরি সিম ভাজ, সেটাও নাকি অতুলনীয়। মিশরি খাবারের কথা যে লেখায় লিখছেন সেখানে এসে গেছে 'কপির সিঙারা'। এবার বাংলার পাইস হোটেলের মেনুঃ

মচ্ছ— চার আনা
মাঙ্গস— আট আনা
নিরামিষ— ছয় আনা ইত্যাদি।
'মাঙ্গস' মানে মাংস পাঠক বুঝতেই পারছেন।

পাইস হোটেলের কথা যখন এসেই গেল, এ বিষয়ে মুজতবা আলীর আর কিছু বলার আছে কি না, খোঁজ করলে পাবেন তাঁর একটি অসামান্য কীর্তি। তিনি প্রস্তাব দিচ্ছেন, 'আপনাতে আমাতে একটা বাঙালি রেস্তোরাঁ খুললে হয় না?' সেই রেস্তোরাঁর 'মেনু' যদি তাকিয়ে দেখেন তা হলে বুঝবেন কী সব বাঙালি পদ! খেতে দেওয়া হবে কাঁসা কিংবা পেতলের থালায়। সাদা কিংবা কালো পাথরের থালাও থাকতে পারে। শালপাতা, কলাপাতার ব্যবস্থাও থাকবে। ছুরি কাঁটা চামচ বাদ।

আহারাদিঃ আতপ, সেদ্ধ, লুচি, পরোটা, বাকর-খানী, ঘি-ভাত, পোলাও।

তেতোঃ উচ্ছে ভাজা, করলা সেদ্ধ, নলতে শাক

ডালঃ মুগ, ছোলা, মসুর, কলাই ইত্যাদি। ডালের সঙ্গে সজনের ডাঁটা, বড়িও চলে তেমন-তেমন ডাল রান্নায়, ডালে নারকেল।

ভাজাঃ নিরামিষ, আমিষ, ডিম। আলু, পটল, বেগুন, কুমড়ো, অমলেট, ডিমভাজা, মাছভাজা (ইলিশ, রুই, পুঁটি, পোনা)

ছেঁচকি— ছোঁকা-ছক্কা-চচ্চড়ি-লাবড়া

করে করে আসবেন মাছ মাংস। ডালনা, ঝোল, কালিয়া, মালাই সহযোগে ডাবের ভিতর, কলাপাতায় পেঁচিয়ে, দমে দিয়ে, সরষে মেখে— খোদার মালুম কোথায় গিয়ে পৌঁছব।... এক্সট্রা অনুচ্ছেদটি ভুলবেন না। তাতে থাকবে কাঁচা লঙ্কা, চাটনি (ধনে, পুদিনা), আচার, আম জারক নেবু ইত্যাদি এবং কাসুন্দি।

ইলিশ মাছের নামে বাঙালি উতলা, বিশেষ করে পদ্মা পারের বাঙাল। শ্রীহট্টের মুজতবা আলীও বাদ যান না। তাই লিখলেন, 'ইলিশ খেয়ে যে প্রাণ দেয় সে তো শহীদ—মার্টার!'

বাঙালির তাজমহল রসগোল্লা। মুজতবা আলীর 'রসগোল্লা' শীর্ষক রচনাটি পড়ুন আর একবার। সে রচনার বিষয়ে বলার দুঃসাহস আমার নেই। উদ্ধৃতি দেব কোন জায়গাটা। তাতে রসের হানি ঘটবে চতুর্গুণ। এই রচনা থেকে দুটি লাইনই বোধ হয় উদ্ধৃত করা যায়ঃ

রসের গোলক, এত রস কেন তুমি ধরেছিলে হায়।
ইতালির দেশ ধর্ম ভুলিয়া লুটাইল তব পায়।

এই রসগোল্লা নিয়ে ইটালির ভেনিস বন্দরে ব্যাপার ঘটেছিল বলে 'মুজতবা আলী জানিয়েছেন।

আহারাদি নিয়ে মুজতবার জাদুগরি বলতে গেলে, অর্থাৎ খুঁটিয়ে বলতে গেলে একটা গবেষণা পেপার হয়ে যাবে। আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই সেই কর্মে, পাঠকও 'পেপার' জানতে পারলে আতঙ্কে লেখাটি ছুঁয়েও দেখবেন না। সুতরাং আহারপর্ব— এখানে শেষ করে পানীয়ের একটু খোঁজখবর করা যাক। মুজতবা আলী তার হালহকিকতেরও সবিস্তারে খবর রাখতেন। পানীয়ের কথারম্ভ শ্যাম্পেন দিয়ে করাই হবে বোধ হয় অভিজাত। 'শ্যাম্পেন মদ নয়? বিলক্ষণ! শ্যাম্পেনে আছে প্রায় পনেরো অংশ মাদকদ্রব্য বা এলকহল।' শ্যাম্পেনের বুদবুদ পেটে গিয়ে খোঁচা দেয় বলে চট্ করে নেশা হয়। শ্যাম্পেন জানলাম। মুজতবা আলী আরও জানাচ্ছেন, ইউরোপের শতকরা ৮৫ জন নেশা করে বিয়ার খেয়ে, মাতাল হয়। আঙুর পচিয়ে যে সুরা তৈরি হয় তার নাম ওয়াইন। বিয়ারে ৪ থেকে ৬ পারসেন্ট এলকহল থাকে— বাকিটা জল। ওয়াইনের পার্সেন্টেজ দশ থেকে পনেরো। ওয়াইন মানুষকে চিন্তাশীল ও অপেক্ষাকৃত বিমর্ষ করে তোলে। পৃথিবীর সবচেয়ে ভাল ওয়াইন হয় ফ্রান্সে। সেই ওয়াইনের একটার নাম ক্ল্যারেট। মনে পড়ে গেল অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে এই ক্ল্যারেটের উল্লেখ পেয়েছি। জার্মানির বিখ্যাত ওয়াইন রাইন ও মোজেল। হাঙ্গেরির ওয়াইন টকাই, ইতালির কিয়ান্তি। জাপানের সাকে ও চিনের চু। পচাই হয় যে পদ্ধতিতে সেটা ফারমেন্টেড বস্তু। চোলাইয়ের নাম স্পিরিটিস। ওয়াইনকে চোলাই করলে হয় ব্র্যান্ডি। অর্থাৎ ব্রান্ড করা বা পোড়ানো হয়েছে। একমাত্র ফরাসি দেশের ব্রান্ডিকেই বলা হয় কন্যাক (Cognac)। বার্লি পচিয়ে বিয়ার,

সেই বিয়ার চোলাই করলে হুইস্কি। তাড়ি চোলাই করলে যে বস্তুটি হয় তার নাম এরেক। এরেকে ষাট পার্সেন্ট এলকহল, ডবল ডিসস্টিল্ড করলে সেই এরেকে আশী ভাগ এলকহল। বাদশা জাহাঙ্গির নির্জলা খেতেন। আখ থেকে 'রাম'। জামাকার রাম বিশ্ববিখ্যাত। মুজতবা আলীর ধারণা আমরা চেষ্টা করলে জামাকার 'রাম'-কে ঘায়েল করতে পারি। এরকম আরও খবর দিয়েছেন আলীসাহেব। বিস্তর। রাশিয়ান একটি মদের নাম ড্যাভৃক্কো। জিনের সঙ্গে জেনিপার মেশানো হয়, তাই একটু আলাদা খুশবু। এবার দু'য়েকটা খাস খবর, যা সংগ্রহ করেছি মুজতবা আলীর লেখা থেকে, এখানে তুলে দিচ্ছি

১। আমের রস ফারমেন্ট করে খেতেন মির্জা গালিব।
২। ফরাসি দেশের মদ আবর্স্যাত নিয়মিত কিছুদিন খেলে মানুষ হয় পাগল হয়ে যায়, না হয় আত্মহত্যা করে।
৩। তাড়ি সবচেয়ে কম ক্ষতি করে, প্রায় করেই না। এটা ওয়াইন পর্যায়ে পড়ে।
৪। বিয়ারে নেশা হয় না এ বড় মারাত্মক ভুল ধারণা।
৫। এ দেশে আঙুর পাওয়া যায় না, এখানে ব্র্যান্ডিতে ডাইলুটেড এলকহল ও সিন্থেটিক সেন্ট মেশানো হয়। এটা মারাত্মক।
৬। বৈদিক, বৌদ্ধ ও গুপ্তযুগে ভারতবর্ষে মদ, জুয়া চালু ছিল। এটা যে কীভাবে গেল মুজতবা আলীও জানতে পারেননি।

আসবাবদির কথা এখানে শেষ করছি। এবার ধূমপানের বিষয়ে মুজতবা আলীর কথা শোনা যাক। তিনি কাইরোতে ফর্সি হুঁকোতে তামাক খাওয়া দিয়ে ধূমপনের কথা শুরু করেছেন, 'আমাদের ফর্সী কেমন যেন একটু 'নাজুক', মোলায়েম হয়— এদের যেন একটু 'গেঁইয়া।' কিন্তু কাইরোতে তামাক এল কীভাবে? ও বস্তু তো এখানে হয় না? তাও সবিস্তারে জানিয়েছেন মুজতবা আলী। শুরু করেছেন এইভাবে 'ভালো তামাক জন্মায় তিন দেশে। আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে, গ্রীসের মেসেডোন অঞ্চলে এবং রুশের কৃষ্ণসাগরের পারে পারে।' তুর্কীরা এই তামাক মিশরে নিয়ে আসে। মিশরিগণ সেই তামাক দিয়ে যে 'সুগন্ধি ইজিপসিয়ান সিগারেট' তৈরি করল তা আজও 'ভুবনবিখ্যাত'। এই বিদ্যেটি আর কারও জানা নেই— পুরোপুরি মিশরের মতো জানা নেই। মুজতবা আলী এই ব্যাপারে আরও বহু কথা লিখেছেন— এমন নিটোল জ্ঞান এককেটি বিষয়ে যে পড়তে পড়তে বিস্ময় জাগে।

আহার, পান এবং সিগারেট বা তামাক নিয়ে যতটুকু না বললেই নয়, ততটুকুই বলার চেষ্টা করেছি। বেশিটাই আমার লেখার বাইরে ওঁর রচনাতেই রয়ে গেল।

শেষে মুজতবা আলীরই একটি গল্প বলে ইতি টানব। বুদ্ধ স্নব ইংরেজ ফরাসি ভাষা জানে না, খেতে গেছে ফরাসিদেশের রেস্তোরাঁয়। মেনুকার্ড পড়তে পারে না। আঙুল দিয়ে মেনুতে দেখিয়ে দিল প্রথম পদ। এল সুপ। এবার মেনুর মধ্যিখানে আঙুল রাখল অন্য পদে। ভাবল নিশ্চিত কোনও খাবার আসবে। 'ও হরি, ফের এল স্যুপ... হটেনটন গোত্রের ইংরেজ জানবে কি করে বিদগ্ধ ফরাসি জাত মেনুতে নিদেন ত্রিশ রকমের স্যাপ রাখে।' এদিকে ইংরেজের পকেটে টান পড়েছে। ইংরেজ ভাবল সর্বশেষ আইটেমটা নিশ্চয় পুডিং-মুডিং হবে। সেখানে আঙুল রাখল ইংরেজ। 'এল টুথ-পেক্-খড়কে। বুঝুন ঠ্যালা।'

চতুরঙ্গ-এর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে মে-২০০৫-য়ে

দপ্তরে যোগাযোগের সময় : মঙ্গল আর শুক্রবার বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা

ছোট গল্প

কাঁটা

নন্দ চৌধুরী

প্রথমে তারের উপর ঠুক করে একটি শব্দ— ছোট হাতুড়ির মাপা ওজনের ঘা। তারের মাথাটা চেপটে একটু চওড়া হল। তারপর উখোর দক্ষ টানে সেই চ্যাপটানো অংশে তৈরি হল একটু গলুই। উখোর গোল বাঁট দিয়ে তারের মাথাটা চেপে হাতের টানে ডাইসের ভেতর তারটা ঘুরিয়ে আনতেই তৈরি হল নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের লুপ। তারপর ডাঁটির শেষপ্রান্তে উখোর টান পড়ে আর একবার। এবার হল একটি খাঁজ। ব্যস, এবার মূল তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেই তৈরি হয়ে গেল একটি কাঁটা— শহরের শিক্ষিত লোকেরা বলেন বঁড়শি।

একটা খোড়ো চালায় হাফমোড়ায় বসে প্রদীপ গভীর মনোযোগ দিয়ে তারাপদর সুদক্ষ শিল্পকর্ম দেখছিল। সে একটি নতুন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সাপ্তাহিকের সাংবাদিক। পত্রিকার মালিক ধনবান— অভিজ্ঞও। একটি বড় কাগজের সাব-এডিটর ছিলেন বহুদিন। এখন মাইনে অবশ্য বেশি নয়। তবে কিছু প্রাথমিক অভিজ্ঞতা প্রয়োজন প্রদীপের। মেসো এখানকার শিক্ষক। সুতরাং প্রদীপের খাওয়া থাকার চিন্তা নেই। এই ডেরাটাকে কেন্দ্র করে সারা অঞ্চলের বিবরণ সংগ্রহ করে সে। নিয়োগকর্তার নির্দেশ এ রকমই। পঞ্চায়েত-উত্তর গ্রাম বাংলার পরিবর্তনটা ধরতে চান তিনি। তাঁর আশা কলকাতার পাঠক ব্যাপারটা ভাল খাবে।

এখানে আসার পর প্রদীপ আবিষ্কার করেছে যে বি ডি ও তার পূর্ব পরিচিত। ছোট ভাইয়ের বন্ধু। সুতরাং সে এখানেও 'প্রদীপদা'। এখানের অনুসন্ধানের কাজে তিনি প্রদীপের খুঁটি। এই ব্রাহ্মস্পর্শে তার এখানকার দিনগুলি ভালই কাটছে। এখানকার মাটি ও মানুষের সঙ্গে ক্রমে তার পরিচয় গভীর হচ্ছে। সম্প্রতি ঘোরাঘুরির সুবিধার জন্য সে একটি নতুন সাইকেল কিনেছে। বি ডি ও-র সৌজন্যে এখানকার সকল পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে তার পরিচয়ও হয়ে গেছে। সে নিজে হুগলি জেলার মানুষ। জন্ম থেকে প্রথম যৌবন অনেকগুলো বছর কেটেছে সেখানে। ইতিহাস নিয়ে এম এ করেছে বর্ধমান থেকে। পরীক্ষার রেজাল্ট মোটামুটি। কিন্তু সাবজেক্টটা সে সত্যি ভালবাসে। পরীক্ষার বাঁধাধরা পথের বাইরে নানা জিজ্ঞাসা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় নানা কৌতূহলী বিপথে। তাই অন্য কোনও চাকরির চেষ্টায় বৃথা সময় না কাটিয়ে সে প্রথম সুযোগেই ঢুকে পড়েছে কাগজে। সাংবাদিকতার একটা ব্রিফ কোর্স করা ছিল। এইবার এসেছে কর্মক্ষেত্রে— এই রুক্ষ অচেনা অঞ্চলে।

হুগলির প্রায় সর্বত্র ধান, আলু আর নানা শাকসবজির অঢেল চাষ। জমি কখনও ফাঁকা পড়ে থাকে না। জলের অভাব সেখানে সমস্যা নয়— বরং উল্টো। ডি ভি সি বেশি জল ছাড়লে ফসল ডুবে যায়। কিন্তু এখানকার ব্যাপারই আলাদা। এই জানুয়ারি মাস, সদ্য ধান কাটা হয়েছে। এখন থেকে একরের পর একর জমি পড়ে রইল ফাঁকা। মাটি রসহীন। চওড়া কপালে একফোঁটা টিপের মতো শূন্য প্রান্তরে কোথাও একটা ছোট পুকুর। তার জল নেমে গেছে গর্তে। সেখান থেকে হাঁড়িতে জল ভরে ঘাড়ে বয়ে এনে কদাচিৎ কোনও উদ্যোগী চাষি দু'এক কাঠা উচ্ছে নয়ত টমেটোর চাষ করে।

অতীতে এখানকার মানুষ কৃষির এই দৈন্যটা পুষিয়ে নিত নানা রকম শিল্পকাজ দিয়ে। বিচিত্র এবং বিস্তৃত সব শিল্প। কালের অনিবার্য সঙ্ঘাতে তার অনেকটাই এখন লুপ্ত। এখনও কোথাও কোথাও পড়ে আছে সেই অতীতের সাক্ষী কিছু শিল্পের জীর্ণ কঙ্কাল। প্রদীপ শুনেছিল পঞ্চায়েতি সরকার নাকি সেই কঙ্কালে আবার প্রাণ সঞ্চারের সাধনায় লিপ্ত। ওদের পত্রিকা এই সব উদ্যোগের বিস্তৃত বিবরণ ছাপতে আগ্রহী। সুতরাং কাজ করতে চাইলে এখানে কাজের অভাব নেই। তবে এখানে কাজ করার অসুবিধেও খুব। একটা প্রাচীন মন্দির দেখিয়ে যদি কোনও বৃদ্ধকে প্রশ্ন করেন— দাদু, এই মন্দিরটা সম্পর্কে কিছু জানেন? তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবেন। তারপর হয়ত অপ্রস্তুত ক্ষীণ কণ্ঠে বলবেন, আমরা তো চিরকাল এমনই দেখছি। লোকে বলে, এ মন্দির স্বয়ং বিশ্বকর্মার বানানো। হতাশ হয়ে যদি কোনও শিক্ষিত মানুষকে, শিক্ষক-অধ্যাপকও হতে পারে, জিজ্ঞাসা করেন, দেখবেন এর বেশি আর কিছুই জানা যাবে না। সবাইকার মধ্যে যেন কেমন একটা আত্মতৃপ্তভাব। কোনও কৌতূহল নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। নিজের নিজের অবস্থান আঁকড়ে থিতু হয়ে থাকতেই যেন ভালবাসে সকলে।

ব্লকের অধীনে সরকারি লাইব্রেরি আছে একটা। কর্মচারী আছে। বইও কম নেই। বছর বছর বই কেনাও হয়। আপনার যদি কোনও বই প্রয়োজন হয়, জানতে চান অমুক বইটি পাওয়া যাবে কি না, আপনাকে শুনতে হবে— ভিতরে খুঁজে দেখুন। বুঝুন মজা! খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা কি সম্ভব!

যাই হোক, তবুও প্রদীপের কাজ এগোচ্ছে মন্দ নয়। দু'একটা রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। সম্পাদক প্রশংসাও করেছেন। উৎসাহ দিয়ে বলেছেন আরও লেখা পাঠাতে। আপাতত এই হল প্রদীপের বর্তমান। এর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করেছে সে ভবিষ্যতের দিকে। বি ডি ও সাহেব অর্থাৎ চিরন্তনও তাকে উৎসাহ দেয়। বলে, একটু যত্ন নিয়ে খুঁজে দেখুন। এখানে ইতিহাসের খনি আছে বুঝলেন— সোনার খনি! কলকাতার মানুষ সে সব কথা কমই জানে। আপনি সেই না-জানা কথা আপনার লেখার মধ্যে তুলে ধরুন। দেখবেন মানুষ নতুনত্বের স্বাদ পাবে। তারা আগ্রহী হয়ে উঠবে।

এই রকম খুঁজতে খুঁজতেই প্রদীপ এসে পড়েছিল তারাপদর কাছে। পঞ্চায়েতের নানা বিভাগের নীতি নির্ধারণ এবং কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য আজকাল এক একজন কর্মসম্পাদক আছেন। শিল্প বিষয়ক দপ্তরের চারুবাবু তাকে এই বঁড়শি শিল্পের ব্যাপারটা বলেছিলেন একদিন। প্রদীপ কৌতূহল দেখাতে তাকে এনে হাজির করেছিলেন তারাপদর চালাঘরে। বলেছিলেন— ও তারু, এঁর নাম প্রদীপবাবু। কলকাতার মস্ত কাগজের সাংবাদিক আমাদের এখানকার কুটিরশিল্প সম্পর্কে লিখছেন। বি ডি ও সাহেবের বন্ধুও বটেন। সব কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে দিও এঁকে। কোনও অসুবিধা না হয় দেখো।

তারাপদ খাতির করেছিল খুব। স্থানীয় কামারদের বানানো লোহার বেড়ি দেওয়া বেঁটে মোড়ার পিঠটা গামছা দিয়ে ভাল করে মুছে এগিয়ে দিয়েছিল বসতে। মাজা কাঁসার গেলাসে পরিষ্কার টলটলে জল আর রেকাবিতে দুটি গুড়ের বাতাসা এগিয়ে দিয়েছিল সপ্রতিভভঙ্গিতে। ও জলের দেশের মানুষ। সেখানকার মাছ ধরার ব্যাপারটা মূলত জাল দিয়ে। বঁড়শি সে দেখেনি তা নয়। কিন্তু এসব নিয়ে এতদিন তার কোনও কৌতূহল ছিল না। তাই সে জিজ্ঞাসা করেছিল— এখন তো শীতকাল। এখন বড়শি লোকে কেনে? আমাদের ওদিকে দেখতাম শ্রাবণ ভাদ্রে লোকেরা ছিপে মাছ ধরত।

তারাপদর হাত যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। টুপ টুপ করে প্রতি ৮/১০ সেকেন্ড অন্তর এক একটি কাঁটা বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে পড়ে আর তার মুখ কথা বলে যায়। মাথা নেড়ে সংক্ষেপে সে জানায়, সারা বছরই কাঁটা বিক্রি হয় স্যার। এখান থেকে কাঁটা কিনে নিয়ে যাবে মহাজন। সেখানে এসব কাঁটায় 'পান' দেওয়া হবে। তারপর যাবে কলকাতায় পাইকারের আড়তে। সেখান থেকে নানা দেশ-বিদেশে চালান যাবে। 'পান' দেয়ার ব্যাপারটা সে নিজেই ব্যাখ্যা করে দেয় প্রদীপকে— ব্যাপারটা আসলে 'টেম্পারিং' আর কি! খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে প্রদীপ বলে— সত্যি?

বলে কী লোকটা! এই সামান্য মাছ ধরার কাঁটা, সে নাকি আবার দেশ-বিদেশে চালান যায়! তারাপদ প্রদীপের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। বলে— হ্যাঁ স্যার, সবই সত্যি কথা। এই কাঁটাব্যবসা দেখছেন তো, এখানকার এই ব্যবসা একশো বছরের পুরনো। ওই যে গ্রামে ঢুকতেই দোতলা দালানটা, যার সামনে দিয়ে বড় রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে ওইটে রঞ্জনদাদুর বাড়ি। এখানকার সবচেয়ে বড় মহাজন ছিলেন উনারা। কলকাতা থেকে দামোদর পেরিয়ে পাইকারের লোক আসত ওঁর বাড়ি। সে সব অনেক বিত্তান্ত স্যার।

কৌতূহলী প্রদীপ কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিল চারুবাবুকেও। তিনি এ অঞ্চলের মানুষ এবং পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। এখানের পাঁচজন যতটুকু জানে তিনিও প্রায় ততটুকুই জানেন। ফলে প্রদীপের সব কৌতূহল মেটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি প্রদীপকে তমালবাবুর হদিশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, উনিও একজন লেখক বটেন। কিছু খোঁজ-টোজ রাখেন শুনেছি। স্কুল ম্যাগাজিনে এই কাঁটা নিয়ে কীসব লিখেছিলেন একবার। তবে লোক হিসেবে সুবিধার নয় মোটেই। ইচ্ছে হলে দেখা করতে পারেন তার সঙ্গে।

প্রদীপের আগ্রহ তখন তুঙ্গে। একদিন ভয়ে ভয়ে তমালবাবুর কাছে গিয়েও হাজির হয়েছিল। প্রদীপের পরিচয় এবং কৌতূহলের খাঁটিত্বের প্রমাণ পেয়ে তাকে বসিয়েছিল তার ঘরে এবং 'কাঁটা' সম্পর্কে এমন এমন কথা শুনিয়েছিল যে, তার গায়ে সত্যি সত্যি কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।

— এ বিষয়ে কী নাকি লেখা একটা বেরিয়েছিল আপনার?

— চারুবাবু বলেছে বুঝি?

— তা ছাড়া? আপনার কাছে আগে এলে অনেক লাভ হত দেখছি।

— আগে চা খান। তারপর সে সব দেখছি। লেখা একটা নয়, বেশ কয়েকটা আছে এ বিষয়ে। এখানে এসব ব্যাপারে বিশেষ কেউ খোঁজ রাখে না। তবু চারুবাবুর একটা লেখার কথা মনে আছে এই যথেষ্ট।

স্কুল ম্যাগাজিন ছাড়াও স্থানীয় এবং কলকাতার বেশ কিছু সাময়িক পত্রিকায় এই বঁড়শিশিল্পের বিবরণ, তার বিপুল সম্ভাবনা, বড়শি কারিগরদের উপর মহাজন-পাইকারদের মিলিত শোষণ এসব অনেক কথাই লিখেছেন তিনি। ভেবেছিলেন পঞ্চায়েত কর্তারা হয়ত ক্রমে কিছু ব্যবস্থা করবেন। তাদের

পেছনে পেছনে ঘুরেওছেন অনেক। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না দেখে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। প্রদীপ খুশি হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তমালকে দাদা বানিয়ে দেয়। বলে— তমালদা, এগুলো আমাকে কিন্তু একবার পড়তে দিতে হবে। আমি তো মশায় এতদিন অন্ধকারেই হাতড়াচ্ছিলাম। এদিকে আপনি তো কাজ অনেক দূর এগিয়ে রেখেছেন। আমি মাঝে মাঝে আসব কিন্তু আপনার কাছে।

— আসবেন। তবে আমার সঙ্গে বেশি মেলামেশাটা হয়ত চারুবাবু পছন্দ করবেন না।

তমাল সম্পর্কে চারুবাবুর মন্তব্যটা চকিতে মনে পড়ল প্রদীপের। কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো সেটা চেপে গিয়ে তমালকেই প্রশ্ন করল— কেন বলুন তো? তমাল মৃদু হেসে বলল— সেটা ওনাকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

সে রাত্রিটা প্রদীপের প্রায় কেটেছিল নির্ঘুম। তমালের লেখার গভীরতা, তথ্য সংগ্রহের নিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অসাধারণ। সকালেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল মেসোকে— তমালবাবুকে চেনেন আপনি?

— চিনি। পার্টি-ফার্টি করত এক সময়। পরে বোধহয় নকশালদের সঙ্গে জুটেছিল। তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে নাকি?

— হ্যাঁ

— ও। তা লোকে বলে ওর উপর নাকি পুলিসের রেগুলার নজর আছে। কাজেই... চারুবাবুর মন্তব্যটার অর্থ এখন পরিষ্কার হয়ে যায়। মেসোর সঙ্গে বিতর্ক এড়াতে সে বলে বুঝেছি। পরদিন তারাপদর বাড়িতে গিয়ে আবার মোড়ায় বসল প্রদীপ। এখন সে বঁড়শি শিল্প সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। তারাপদ উবু হয়ে বসে বসে কাঁটা কাটে। প্রদীপ তার সঙ্গে টুকটাক গল্প করে। — এ লাইনে আপনার কতদিন হল?

— কত বছর? দাঁড়ান, হিসেব করি। আমার বয়স হল ধরুন ছেচল্লিশ। ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছিলাম। তখন আমার বয়স পনেরো-ষোল। ইস্কুলে পড়ার সময়েই কাজ শিখি। ছুটি ছাটায় বসে যেতাম বাবার পাশে। তারপর লেখাপড়ার পাট চুকতে চাষের সময়টুকু বাদ দিয়ে এটাই তো বিত্তি।

— আপনার বাবাও এ কাজ করতেন?

— আমাদের পূর্বপুরুষের আসল ব্যবসা ছিল কামারশাল। শুধু আমাদের নয়, গাঁয়ে অনেকের ঘরেই কামারশাল ছিল।

— এত কামারশালে কাজ জুটত? গ্রামটা অবশ্য আপনাদের বড় বটে, তবু...?

সে সব একটা ইতিহাস। তমালের লেখায় এর সামান্য আভাস ছিল। বাকিটা প্রদীপ খুঁজে বার করেছে আস্তে আস্তে বেশ কিছু দিনের চেষ্টায়। এখানকার কর্মকাররা ছিল বিখ্যাত। তাদের কাছে কাজের বরাতআসত বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূমের সুদূর অঞ্চল থেকে। কাস্তে, কোদাল ইত্যাদি কৃষিযন্ত্র তো ছিলই, তা ছাড়া ছিল ছুরি, ছোরা, তরোয়াল— এসব অস্ত্রশস্ত্র। এক একজন কর্মকার ছিল এ কাজের স্পেশালিস্ট। রাজা-রাজড়া জমিদারদের কাছ থেকে বরাত আসত তাদের কাছে। এদেরই একটা সম্প্রদায় ছিল, যারা লাল গিরিপাথর, কাঠকয়লা আর চুণা পাথর গালিয়ে লোহা বার করত। তা থেকে তৈরি হত নানারকম ইস্পাত। সেই ইস্পাত থেকে তৈরি হত কামান আর নানা অস্ত্র। লোহা গলানোর সময় যে 'স্ল্যাগ' তৈরি হত, তার দু'একটা পরিত্যক্ত গাদা প্রদীপকে দেখিয়েছে তারাপদ। দুর্গাপুরের আধুনিক কারখানায় যে স্ল্যাগ তৈরি হয় এগুলো তারই মতো। শুধু টুকরোগুলোর সাইজ ছোট আর বেশ চকচকে।

একদিন চিরন্তনকেও এসব গল্প বলেছে প্রদীপ। সে শুধু মগ্ন হয়ে শুনেছে। বছর ঘুরে গেল তার এখানে আসা। কিন্তু তার কাজের এত চাপ যে কিছুই ঘোরা হয়নি। কিছুই সেভাবে দেখা হয়নি। প্রদীপকে বলল— একদিন যাব আপনার সঙ্গে দেখতে।

চিরন্তন হঠাৎ বলে— এখানে সরকারি ফিশিং হুক প্রজেক্ট আছে একটা। সেটা দেখেছেন আপনি?

প্রদীপ বলে— শুনেছি। এখনও যাওয়া হয়নি।

— একবার দেখে আসুন দেখি। কাছেই। এখন অবশ্য বন্ধ আছে। কীরকম দেখলেন বলবেন।

— আচ্ছা যাব। তমালদাকেও পারলে নিয়ে যাব। এ সব ব্যাপারে অনেক খবর রাখেন উনি।

চিরন্তন কৌতূহলী গলায় বলে— তমালদা কে?

— ও, ওঁর কথাটা তোমাকে বলা হয়নি। উনি একজন ছুপা-রুস্তম। চমৎকার লেখেন। অনেক পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছে দেখলাম। একটু আত্মভোলা গোছের লোক।

— তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং। একদিন বাসায় নিয়ে আসুন। চা খেতে খেতে আলাপ করা যাবে।

— বলব।

প্রদীপ তার রিপোর্ট লেখা শুরু করে দিয়েছে। আজ তারাপদর বাড়ি আর একবার যেতে হবে। কত যে জানার আছে! যত জানছে তত কৌতূহল বাড়ছে। ক'দিন যাতায়াতের ফলে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে তারাপদর পরিবারের সঙ্গে। তার বউ এখন স্বচ্ছন্দে কথা বলে তার সঙ্গে ঘোমটা খুলেই। তারাপদর দাদা নিরাপদ। সে পরিবারের চাষবাস দেখে। তাকে দাওয়ায় বসে তামাক খেতে কখনও কখনও দেখেছে প্রদীপ। তারাপদর থেকে বয়সে অন্তত দশ বছরের বড় হবে। গোটা

চার-পাঁচ ছেলেমেয়ে নানা বয়সের। নিরাপদর বউকে কিন্তু কোনও দিন দেখেনি প্রদীপ। স্বাভাবিক কৌতূহল থাকলেও এসব পারিবারিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয়নি। একটা কথা শুধু জিজ্ঞাসা না করেও বেশ বোঝা যায় যে এরা বেশ গরিব।

সকালে কনকনে ঠান্ডাটা কাটতেই বেরিয়ে পড়েছিল সে। তারাপদর বাড়িতে যখন পৌঁছল, তখন মিঠে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। সাইকেল রেখে সেই চালাঘরে নির্দিষ্ট মোড়াটিতে বসে হাঁক দেয়— কই তারাপদবাবু!

কাঁটা কাটবার চালা থেকে মূল বসতবাটিটা একটু দূরে। তারাপদর বউ বেরিয়ে আসে। বলে— উনি তো আজ নেই।

— সে কী! কোথায়?

— বাইরে গেছে।

— এ বেলা ফিরবে?

— না তো। ফিরতে রাত হবে। নাও ফিরতে পারে আজ।

প্রদীপ হতাশ হয়ে বলে, এই রে কী হবে তাহলে? আমার যে কতকগুলো জিনিস জানবার আর্জেন্ট দরকার ছিল।

মহিলা একটু ইতস্তত করে বলেন— বসুন। দেখি আমি বলতে পারি কি-না। প্রদীপ অভ্যাস মতো চালা ঘরে বসে। মহিলা হাতের ইশারায় তাকে বারান্দাটা দেখিয়ে বলে— ওখানে নয়, এখানে আসুন। প্রদীপ খোলা বারান্দায় পেতে দেওয়া একটি আসনে বসে।

— একটু চা করি।

— আবার চা কেন? আপনাকে বিব্রত করা।

— বসুন। এই তো দু'মিনিটের ব্যাপার।

বারান্দার অর্ধেকটা বাঁশের চাঁচ দিয়ে ঢাকা। বাইরে থেকে দেখা যায় না। প্রদীপ দেখল এখানেই রান্নার ব্যবস্থা। একটা কাঠের টেবিলে ওভেন বসিয়ে এল পি জি গ্যাস জ্বলছে। প্রদীপ ভাবে, এদের যতটা গরিব ভেবেছিল ততটা নয় তা হলে।

দু'মিনিটের মধ্যেই হাতে গরম চা ধরিয়ে দিয়ে মহিলার জিজ্ঞাসা— কী জানতে চাইছিলেন বলুন। দেখি আমি পারি কি-না।

— আচ্ছা বঁড়শির এক একটা অংশের কী নাম যেন। আমি জানতাম। ভুলে গেছি। লেখাটা শুরু করেছি। অংশগুলো ছবি এঁকে দেখাতে হবে।

মহিলা ঘরের ভিতর ঢুকে যান। একটি খাতা আর একটি পেনসিল নিয়ে ফিরে আসেন। খাতাটা প্রদীপের সামনে পেতে উবু হয়ে বসে পেনসিলের একটি মাত্র দক্ষ টানে চমৎকার বঁড়শির ছবি এঁকে ফেলেন। প্রদীপ তাঁর মুখের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

— আরে, আপনি এমন চমৎকার ছবি আঁকেন! লেখাপড়াও জানেন নিশ্চয়?

— হ্যাঁ, ওই ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিলাম, গরলগাছা স্কুলে।

— গরল গাছা? ডানকুনির কাছে? হুগলি জেলায়?

— হ্যাঁ তো।

— আরে গরলগাছা আমার মামার বাড়ি। আমার বাড়ি খানাকুল।

— ও, তাই আপনার কথার টান হুগলি জেলার মতো। আমি সেই দিনই বলেছিলাম ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে যে আপনার বাড়ি হুগলি জেলা কিনা। যাক কতদিন পর বাপের বাড়ির মানুষ দেখলাম।

— গরলগাছা আপনার বাপের বাড়ি?

— না। আমার মা মারা যায় আমাকে খুব ছোট রেখে। বাবা আবার বিয়ে করে। তখন মামারা এসে আমাকে নিয়ে যায়। সেখানেই বড় হয়েছি। তারাই বিয়ে দিয়েছে।

— শেষ পর্যন্ত এমন সুন্দর হুগলি জেলা থেকে এই ব্রহ্মডাঙায়।

মহিলা মৃদু হাসে। বলে, মানিয়ে নিতে জানলে সবই সুন্দর, প্রদীপবাবু। প্রসঙ্গ পাল্টে প্রদীপ বলে— ছেলেমেয়েরা? স্কুলে নাকি?

— আমার ননদের মেয়ের বিয়ে। ওঁরা দু'ভাই আর ছেলেমেয়েরা সকলে গেছে। ভাসুরপো দোকান করে। সে দুপুরে খেতে আসবে। তারপর শাশুড়ি আছে। তাই আমার যাওয়া হল না।

— ও, ভোজটা তাহলে আপনারই বাদ গেল। আচ্ছা, আর একটা কথা। নিরাপদবাবুর স্ত্রী নেই?

— না। তিনি মারা গেছেন একটি ছেলে একটি মেয়ে রেখে। ছেলের কথা তো বললাম। মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে।

— আহা। তারপর ছবিটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলে, আচ্ছা, বঁড়শি দু'একটা আমাকে দিতে পারবেন? আজই কলকাতা যাব। সঙ্গে নিয়ে যেতাম।

— তা তো পারব না প্রদীপবাবু। কাঁটা আমাদের ঘরে রাখা বারণ। কাঁটা হয়ে গেলে মহাজনদের কাছে গচ্ছিত করে দিয়ে আসেন উনি।

প্রদীপ বিস্মিত হয়। এমন কথা তো কারুর কাছে শোনেনি সে। তমালদাও কখনও বলেনি। রহস্যের গন্ধ পেয়ে তার সাংবাদিক মন উলসে ওঠে। বলে— এ রকম নিয়ম কেন এর?

এই আপনার কাছে কথাটা প্রথম শুনলাম। এর কারণ কী?

— নিয়ম মানে, এটা অবশ্য শুধু আমাদের ঘরের নিয়ম। অন্যদের নয়। প্রদীপের কৌতূহল আরও তীব্র হয়। বলে, কিন্তু এ রকম নিয়ম কেন? মহিলা চুপ করে থাকেন।

— বলার কোনও বাধা আছে?

মহিলার অবস্থা দেখার মতো। তার কথা যেন পেট থেকে এসে গলায় আটকে আছে। তার মনের অবস্থা প্রদীপ কী করে বুঝবে। যে কথাটা কোনও দিন কাউকে প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণা এতকাল ভোগ করেছে, আজ বাপের বাড়ির মানুষকেও যদি সে কথাটা খোলসা করে বলতে পারে তবে মনটা খানিক হালকা হয়। কিন্তু এত দিনকার অনভ্যাস আর সঙ্কোচ যেন গলা টিপে ধরেছে তার। প্রদীপ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার মুখের দিকে। মুখে কাপড়ের আঁচল গুঁজে যেন সে আটকে রেখেছে কথার স্রোতকে। হঠাৎ ফোঁপানো কান্না গোপন করতে সে দৌড়ে উঠে যায় দুটো ঘরের মাঝখানের সিঁড়ি বেয়ে দু'তালার কোঠায়। প্রদীপ হতভম্ব বসে থাকে। থেমে থেমে তার কানে আসে চাপা ফোঁপানোর শব্দ। মিনিট দশেক পর নিজেকে সামলে চোখমুখ মুছে নেমে আসে সে। প্রদীপকে বলে, এ দিকটায় আসুন। এ ঘরে শাশুড়ি শুয়ে আছে। শয্যাশায়ী অসুস্থ— কানেও শোনে না অবশ্য। তবু বিশ্বাস নেই।

বারান্দার অপর প্রান্তে লাঙ্গল কোঁদাল দড়ি দড়া নানা হাবিজাবি। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচাবার জন্য এদিকটাও বাঁশের চাঁচ দিয়ে ঘেরা। ফলে বাইরে থেকে আড়াল। প্রদীপকে ইশারায় যেতে বলে সেখানে।

— আমার বিয়ে হয়েছে প্রায় পঁচিশ বছর। নতুন বউ হয়ে এসেছি সেই মাসকতক। আমার বড় জা আমাকে হাতে ধরে এখানকার মতো কাজকর্ম শিখিয়ে দিচ্ছে। হালকা কাজকর্ম দু'একটা করি। বেশি কিছু করতে গেলে বলত, সারা জীবন তো রইল ছোট। অনেক কাজ করতে হবে। এখন একটু হালকা থাক। আমাদের দেখছেন তো, গরিবানি সংসার। আমার মামা বাড়িও গরিব ছিল। কিন্তু এরা তার চেয়েও ছিল অনেক গরিব। পুরুষ মানুষদের আর শাশুড়ির পাতে ভাত জোটাতে শেষ পর্যন্ত আমাদের দু'বউয়ের থালায় এক এক দিন আধপেটা বই জুটত না। আমার জা আমাকে ভাত তুলে দিত তার থেকেই। বলত, ছোট, তোর এখন বাড়নসার বয়স। এখন থেকে পেটমরা হয়ে গেলে বাচ্চা বিয়োতে গিয়ে মরে যাবি যে। একদিকে খেতাম, একদিকে চোখের জল মুছতাম। ভাত খেয়ে পেট ভরত না যেদিন, জা সেদিন পেট-আঁচলে খানিক মুড়ি নিয়ে চলে যেত ওই পাশের আমবাগানে। শাশুড়ি আগাম খেয়ে ঘুমুত দুপুরে। তবু জা আমাকে পাহারায় রেখে যেত। বলত, শাশুড়ি ঘুম ভেঙে জিজ্ঞাসা করলে বলবি— দিদি ঘাট বসতে গেছে।

একদিন কী কালগ্রহ। শ্রাবণ মাসের দিন। ভিজে ভিজে আবহাওয়া ছিল। বাড়িতে কেউ নেই। দু'ভাই গেছে চাষে। ঘরে ছেলে বলতে ওই ভাসুর পো। বছর চারেকের। আর মেয়েটি বছর দুই। তারা ঘুমুচ্ছে। আমিও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

এদিকে শাশুড়ি কখন উঠেছে ঘুম থেকে। বাগানের দিকে গেছে। বাগানে নজর পড়েছে জা'কে। আমতলায় দাঁড়িয়ে কী যেন চিবোচ্ছে। তখনকার দিন। খেতে দিতে পারুক, না পারুক শাশুড়িদের দাপট অফুরন্ত। তক্ষুনি গিয়ে তাকে টেনে এনেছে চুলের মুঠি ধরে। পাড়ার একটা ছেলেকে পাঠিয়েছে ভাসুরকে ডেকে আনতে। তারপর কী হল বুঝতেই পারছেন। আস্ত একটা লাঠি ভাঙল আমার জায়ের পিঠে। পাড়ার দু'চারজন তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল তাই রক্ষা।

আমার মুখ শুকিয়ে এতটুকু। এমন কাণ্ড জীবনে দেখিনি। আমার জা চুপচাপ পড়ে রইল অনেকক্ষণ। আমার সাহস হল না তার কাছে যেতে। তারপর এক সময় নিজেই উঠল সে। মেয়েকে দুধ খাওয়াল। বিকেলে পুকুরে গেল। রাতে রান্না করল। সকলকে খাবার সাজিয়ে দিয়ে ছেলেকে, মেয়েকে ঘুম পাড়াল। আমাকেও খাবার দিয়ে বলল— খেয়েদেয়ে তুই শুগে যা। আমি একটু সেঁক দিয়ে তারপর খাব। কথা কাটাকাটি করতেও ভয় লাগছিল আমার। তবু কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারলাম না।

বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে গেল। জেগে রইলাম আমরা দু'জন। নিজের হাতে সেঁক দিলাম তার পিঠের কালশিটেগুলোতে। তারপর খেতে বসলাম। এই ঘর তখন হয়নি। একটা ছোট চারচালা আলোবাতাসহীন ঘর ছিল। এক কোণে রান্না হত। ডিবরির আলোতেও সাদা ভাত ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। খাওয়ার পর আমি দু'টো থালা তুলে এঁটো বাসনের কাছে রেখে হাত ধুয়ে শুতে গেলাম। ও দেখলাম, এঁটো হাতে চুপ করে বসে আছে অন্য দিকে তাকিয়ে। বুঝলাম, ও কাঁদছে। কাঁদুক। আমি ওকে আর বিরক্ত করলাম না।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল অমানুষিক চিৎকারে। ধড়মড় করে উঠে দেখি ও পাশে নেই। বাইরে এসে দেখি আমার জা উঠানে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে এক একবার অমানুষিক চিৎকার করছে, আর তার সারা শরীর বেঁকে যাচ্ছে মাঝধরা কাঁটার মতো।

তখন এ গ্রামে বা পাশাপাশি তেমন ডাক্তার ছিল না। একজন পাশ না করা কম্পাউন্ডার ছিল। সে অল্পস্বল্প কিছু হলে

ওষুধ দিত। শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

তখন এখানে রাতেভিতে কোনও যানবাহন পাওয়া সহজ ছিল না। এদিকে দুর্গাপুর, ওদিকে বাঁকুড়া— দু'টোই অনেক দূর। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। শাশুড়ি বলল, ভর দুপুরে আমবাগানে খোলা চুলে ঘুরে বেড়ানো... আমি বলছি এ পেত্নির কাজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। কথায় কথা বাড়ে, তাই হয়ত শাশুড়ি মুড়ি খাওয়ার কথাটা বেমালুম চেপে গেল এটা কিন্তু আমি সেই বয়সেই বুঝতে পারলাম।

শাশুড়ির কথাটা নিয়ে তখন আলোচনা হতে লাগল। সকাল হওয়ার আগে যখন অন্য কোনও পথ নেই— তাই চেষ্টা করতে দোষ কী এ রকম মনোভাব নিয়ে ওঝাকে ডেকে আনা হল। সে এসে এমন কাণ্ড-কারখানা জুড়ল যে আমি চোখে দেখতে পারছিলাম না। ভাসুরকে দেখলাম দাওয়ার এক ধারে বসে আছে হাঁটুতে মুখ গুঁজে। আমিও একা বিছানায় গিয়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলাম। সকাল হওয়ার আগেই আমার জা মারা গেল।

তখনও পঞ্চায়েত-টঞ্চায়েত হয়নি। গ্রামের মোড়লদের কথাই মান্য। সকালে রঞ্জনদাদু এলেন। তিনিই তখন গ্রামের মাথা। সবই শুনেছিলেন তিনি। তবু একবার শাশুড়িকে একবার ভাসুরকে জিজ্ঞাসা করলেন— কী হয়েছিল? সব শুনে বললেন, রাতে যে থালাটায় ভাত খেয়েছিল সেটা কোথায়?

সব এঁটো-কাটা তখনও তেমনই জমা। আমি দিদির থালাটা এনে দিলাম। দেখলাম একমুঠো ভাত তখনও পড়ে আছে। আর দিনের আলোয় দেখা গেল ভাতময় বিজ বিজ করছে ছোট ছোট মাছের কাঁটা। উনি মিনিট পাঁচেক ধরে উল্টেপাল্টে দেখলেন ভাতগুলো। নিজের মনেই বললেন— হুঁম্। ভাসুরকে ডেকে বললেন— তাড়াতাড়ি লাশ জ্বালিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে বলবি— অম্বলশূল ছিল অনেক দিন থেকে। সেই থেকেই কে জানে কী হয়েছে জানি না। এর বেশি যেন কেউ কিছু না বলে— খর্দার। দেখল সবাই, বুঝল সবাই। কিন্তু কেউ কিছু বলল না। নির্বিঘ্নে শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। ভাসুরকে আবার বিয়ে করার জন্য বলেছিল সবাই। তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। এই হল বিত্তান্ত। কিন্তু প্রদীপবাবু...।

প্রদীপ ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল। বলল— কোনও চিন্তা নেই। আমি ভগবানের নামে শপথ করছি আমার কাছ থেকে এ কথা কেউ কখনও জানবে না।

কলকাতা যাওয়া উঠল মাথায়। সকালে শোনা ঘটনাটা তার মস্তিষ্কে তখনও টগবগ করে ফুটছে। দু'টি নাকে মুখে গুঁজে প্রদীপ ছুটল তমালের বাড়ি।

— আচ্ছা তমালদা, আপনি বড়শি শিল্পীদের মজুরির যে রেট লিখেছেন, সেটা কি এখন বেড়েছে? আগের থেকে ওদের অবস্থা তো এখন একটু ভাল, নাকি? তমাল গভীর দৃষ্টিতে প্রদীপের দিকে তাকায়। বলে— আগে বসুন দেখি। হল কী আপনার?

— না, আপনি বলুন না, প্লিজ!

তমাল বলে— আপনি যা বলছেন, ঘটনা তার উল্টো। টাকার অঙ্কে হয়ত মজুরি কিছু বেড়েছে, কিন্তু বাজার দরটা তুলনা করে দেখুন। তাতে দেখবেন প্রকৃত মজুরি বরং কমে গেছে। যাদের অবস্থা ভাল হয়েছে, দেখুন গিয়ে তাদের অন্য কোনও আয় আছে।

প্রদীপ খুব ভেঙে পড়া গলায় বলে, কী হবে তা হলে? সকলের মজুরি বাড়ছে, এরাই শুধু পড়ে থাকবে অন্ধকারে?

তমাল ওর দিকে হিমশীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বলে— আপনি তো খুব আবেগে চলেন দেখছি। নয়ত দেখতেন, যারা নিজেরা সংগঠিত তারা নানা কায়দায় নিজেদের পাওনা বাড়িয়ে নিয়েছে। অসংগঠিতদের কোনও উন্নত হয়নি। বরং সকলের পাওনা মেটাতে গিয়ে তাদের পিঠ বেঁকে যাচ্ছে।

— আপনারা থাকতে কোনও উপায় হবে না?

তমাল মুচকি হাসে। বলে— এখানকার বি ডি ও তো আপনার বন্ধু। ওঁকে বলুন না— এদের মজুরি বাড়িয়ে দিতে।

প্রদীপ হঠাৎ বলে— বাই দি বাই, চিরন্তন আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছে চায়ের।

— আমাকে? কেন? কবে?

— যে কোনও দিন। চলুন না, আজই বিকেলে। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

বিকালে চিরন্তন আজ একটু হালকা মেজাজে ছিল— যা প্রায়দিন থাকে না। হয় সদরে মিটিং, নয় কোনও ইনসপেকশন টিম, নিদেন গুচ্ছের ফাইল বগলে বাসায় বসে হিজিবিজি কাটতে হয় তাকে। প্রদীপ গল্প করতে এসে প্রায় বিরক্ত হয়ে উঠে পালায়। আজ দু'জনকেই খুশি মনে আহ্বান করে চিরন্তন।

আলাপ জমে উঠল। তমালের লেখা নিয়ে কথা শুরু হল।

— প্রদীপদার কাছে আপনার লেখার প্রশংসা শুনেছি। এখনও লেখেন রোজ?

—আগে লিখতাম। এখন লিখে কোনও কাজ হয় না দেখে ছেড়ে দিয়েছি।

—আমার কলেজ জীবনে কিছু কিছু লেখা ছাপা হয়েছিল। এখন তো চাকরির চাপ। তবু লেখকদের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসি।

তমাল বলে— কোন কলেজে পড়তেন?

—মেদিনীপুর কলেজ।

—বাড়ি টাউনেই?

—না, ইনটিরিয়রে। হোস্টেলে থাকতাম।

—কোন ইয়ারের ব্যাচ?

—এইট্টি।

তারপর লেখাপড়ার কথা আসে। সে আমলের ছাত্র আন্দোলনের কথা আসে। ক্রমে সময় বয়ে যায়। প্রদীপ অধৈর্য হয়ে ওঠে। তার মাথায় তখনও ঘুরছে 'কাঁটা' এবং সকালের সেই গল্পটা। সে বলে— তমালবাবু, সেই বঁড়শি শিল্পের উন্নতি নিয়ে কী বলছিলেন বলুন না চিরন্তনকে। ও আমার ভাইয়ের মতো। কিছু করার থাকলে নিশ্চয় করবে।

তমাল যেন একটু বিরক্ত। অনেক ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে এখন দরকচা মেরে গেছে। বলে— আচ্ছা চিরন্তনবাবু, এই ভদ্রলোক এত সেন্টিমেন্টাল হলে সাংবাদিকের কাজ করবেন কী করে বলুন তো? স্টার্ন ফ্যাক্ট নিয়ে আপনার কাজ, কল্পনায় ভাসলে চলবে!

প্রদীপকে অপ্রতিভ হয়ে যেতে দেখে চিরন্তন বলে— না না তমালবাবু উনি খুবই বাস্তববাদী মানুষ। আসলে এই ব্যাপারটা নিয়ে উনি— জেনুইনলি ভাবছেন। তা আপনি বলুন না। আমাদের তো বুঝতে পারছেন, কতকগুলো ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে কাজ করতে হয়। তবু আমাদের ফ্যামিলি বরাবর সোস্যালিস্ট আউটলুকের ফ্যামিলি। আমার ঠাকুর্দা স্বাধীনতা সংগ্রামে জেল খেটেছেন। যদি কিছু করতে পারি নিশ্চয় করব।

তমাল মৃদু হাসল। তারপর বলল— আপনি মথুর বাগের নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিলক্ষণ।

— উনি এ অঞ্চলে লেফট আন্দোলনের ফাউন্ডার। স্বাধীনতার আগে থেকেই কাজ করতেন। লেট সিক্সটিজে রাজনীতিতে আমার আদৌ দীক্ষা দেন তিনিই। লেফটিস্ট হলেও এ অঞ্চলে তিনি ছিলেন সর্বজনমান্য। এই কাঁটার ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম মাথা ঘামান তিনিই। আপনি কি জানেন দেশে প্রায় সাড়ে ছ'শো কোটি টাকার বিজনেস হয় ফিশিং-হুকের? সমুদ্রে মাছধরা যত বাড়ছে, এই ব্যবসার চাহিদাও তত বাড়ছে। অথচ সব রকম সুবিধা থাকতেও এ অঞ্চল তার সামান্য একটা ছিটেফোঁটার বেশি পায় না। তা হলে ব্যাপারটার কত গুরুত্ব— বুঝতে পারছেন তো?

চিরন্তন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে। বলে— সত্যিই এত কথা তো জানতাম না।

তমাল বলে— ফ্রন্ট সরকার আসার পর মথুরদার অনুরোধেই শিল্পমন্ত্রী এখানে একটা ছোট ফিশিং হুক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বসান। এসব জানেন আপনি?

— শুনেছি। ফাইলও আছে কয়েকটা। কিন্তু খুব ডিটেলস জানার সুযোগ হয়নি।

— এই প্রোজেক্টটার মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাজন আর পাইকারদের শোষণ থেকে বঁড়শি শিল্পীদের বাঁচানো। কিন্তু হল কই!

চিরন্তন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। বলে— আই সি!

তমাল বলে চলে— আপনি কাজ করতে চাইছেন তো? আপনাকে প্রথম একটা টাস্ক দিচ্ছি। আপনার ব্লকে ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আছে, অফিসার আছে, কমিটি আছে। তাদের তো মাঝে মাঝে মিটিংও হয় শুনেছি। আপনি একটু ইনভেস্টিগেট করুন না। প্রোজেক্ট চালু হওয়ার পর মাত্র পাঁচ বছরেই সব কিছু মুখ থুবড়ে পড়ল কেন? সরকারের দেওয়া লক্ষ লক্ষ টাকাই বা গেল কোথায়?

প্রদীপের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চিরন্তনের হাত জড়িয়ে ধরে বলল— প্লিজ চিরন্তন, কিছু একটা কর।

গেজেটেড অফিসারের গ্র্যাভিটি চিরন্তনের গলায়। বলে— আচ্ছা নেকস্ট মিটিংয়ে আমি ব্যাপারটা তুলছি।

প্রদীপ বলে— আচ্ছা, সে মিটিংয়েও তমালদাকে ডাকা যায় না? চিরন্তন হেসে বলে— তা কী করে হয়?

তারপর অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কমিটিরি মিটিংয়ের পর মিটিং হয়েছে। ফিশিং হুক প্রোজেক্ট নিয়ে কোনও দিন কোনও কথা উঠেছিল কি না কেউ জানে না। চিরন্তন বদলি হয়েছে কলকাতায় উচ্চতর দায়িত্বে। সে অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিল এ জন্য। তার স্ত্রী কলকাতায় শিক্ষিকা। এখন কলেজে অধ্যাপিকা হওয়ার চেষ্টা করছে। প্রদীপও প্রমোশন পেয়েছে। তার মাইনে বেড়েছে। পত্রিকার কলকাতা দপ্তরেই তার কাজ এখন। তমাল লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছে। সে সারাদিন শুধু বই পড়ে। আর তারাপদ তেমনই উবু হয়ে বসে হেঁটমুখে কাঁটা কাটে। নিরাপদ সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার দাওয়ায় বসে হুঁকো খায় আর উদাস চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন ভাবে।

এ দিকে দামোদরের বাঁধের গর্ভে সংস্কারের অভাবে পলিমাটি জমে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। বিশেষজ্ঞরা নাকি বলেছেন, এ রকম চললে নদী চিরকালের মতো তার নাব্যতা হারাবে।

প্রবন্ধ

বর্ণপরিচয়-এর দেড়শো বছর

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত 'বর্ণপরিচয়' পুস্তিকার প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৬২ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ। খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের হিসাবে ১৮৫৫-র এপ্রিল। তখন বিদ্যাসাগর মশায় (১৮২০-১৮৯১) -এর বয়স পঁয়তিরিশ বছর এবং তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতা করছেন। এরই মধ্যে তিনি রচনা করেছেন বোধোদয়, ঋজুপাঠের তিনটি ভাগ, ব্যাকরণ কৌমুদির প্রথম তিনটি ভাগ, শকুন্তলা এবং আরও কয়েকখানি বই।

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের মাত্র দু'মাস পরেই ১ আষাঢ় বেরোয় তার পরের খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ। ইতিমধ্যে ১৮৫৫-র ১ মে ঈশ্বরচন্দ্রকে সরকার থেকে দক্ষিণবঙ্গের সহকারী স্কুল ইনসপেক্টর পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। এটি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বের অতিরিক্ত। আর এ জন্য অধ্যক্ষের বেতনের ৩০০ টাকার উপর আরও ২০০ টাকা বেতন বেড়েছিল। বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাবার পথে পালকিতে বসে তিনি দ্বিতীয় ভাগের পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন বলে কথিত আছে।

এর আগে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'সংস্কৃত প্রেস' নামে মুদ্রণালয়। এই ছাপাখানা বসাবার কাজে বিদ্যাসাগরের সহযোগী ছিলেন তাঁরই বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার। এই মদনমোহন ছিলেন সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী এবং পরবর্তী সময়ে সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই সহকর্মী। ১৮৪৯- এর মে মাসে কলকাতায় জন ওয়াটার বেথুনের উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' যেটি ১৮৫১-তে প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পর তাঁরই নামানুসারে বেথুন স্কুল নাম গ্রহণ করে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ওই স্কুলের সম্পাদকের পদে বৃত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এই বিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল যে গুটিকয়েক ছাত্রী নিয়ে তার মধ্যে দ'জন ছিলেন মদনমোহনের দুই শিশুকন্যা। ওই সময় মদনমোহন বিশেষ করে ওই স্কুলের ছাত্রীদের কথা ভেবেই লিখলেন 'এতদ্দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ' বাংলা প্রথম পাঠ 'শিশুশিক্ষা'। এই পুস্তিকার প্রথম ভাগ তাঁদেরই সংস্কৃত প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে। মদনমোহন রচিত এর পরের দুটি খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ বার হয় পরের বছর ১৮৫০-এ। ছাপা হয়েছিল সংস্কৃত যন্ত্রেই। এই শিশুশিক্ষার চতুর্থ ভাগ- যেটি তার 'বোধোদয়' উপনামেই বেশি পরিচিত- লিখেছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর। পঞ্চম ভাগের নাম 'নীতিবোধ', রচয়িতা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মদনমোহনের শিশুশিক্ষা-র প্রথম খণ্ড দুটি নবীন পড়ুয়াদের কাছে খুবই আদরণীয় হয়েছিল। সেই সময়ে আর যে দুটি বাংলা প্রাইমার খুব চলত সেগুলি হল 'শিশুবোধক' আর 'বাল্যশিক্ষা'। 'পূর্ব্ব বাংলার স্কুল-ইনসপেক্টর ও ঢাকা শিক্ষাকমিটির অনুমত্যানুসারে' রামসুন্দর বসাক-কৃত বাল্যশিক্ষা প্রধানত পূর্ব বঙ্গেই প্রচলিত ছিল। এই বইটির কিছু চাহিদা বোধ হয় আজও আছে, কলকাতার পুস্তক ব্যবসায়ীরা এখনও এটি ছেপে থাকেন।

বাংলা ভাষাশিক্ষার প্রথম পাঠ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ করে বন্ধু মদনমোহনের বই দু'খানি যখন খুবই জনপ্রিয়, সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন আবার নতুন বই লেখায় হাত দিতে হল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে এই ঘটনায় যে, মদনমোহনের শিশুশিক্ষার কথা এখনকার বাঙালি প্রায় ভুলেই গেছে কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগ (বই-এর আসল নাম যে 'বর্ণপরিচয়' সে-কথা অনেকেরই খেয়াল থাকে না) আজও বাঙালি প্রথম পড়ুয়ার অনেকের কাছেই অবশ্য পাঠ্য হিসাবে রয়ে গেছে।

এ দেশে ইউরোপীয় ধাঁচে প্রাথমিক শিক্ষার ইস্কুল গড়ে তোলা এবং ছাপাখানা আসার সঙ্গেই বাংলা প্রাইমার লেখার তোড়জোড় শুরু হয়। সে কাজে প্রথম উদ্যোগী হন মিশনারিরাই। শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৬-য় ছাপা হয় 'লিপিধারা' নামে বাংলা প্রাইমার। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ১৮১৮-য় প্রকাশ করেন জেমস স্টুয়ার্ট রচিত 'বর্ণমালা'। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বার হয় ঈশ্বরচন্দ্র বসুর 'শব্দসার'। এটিই সম্ভবত বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা প্রাইমার। এরপর হিন্দু কলেজ পাঠশালার জন্য 'শিশু সেবধি' আর তত্ত্ববোধিনী সভার পাঠশালার জন্য অন্যতর এক 'বর্ণমালা' রচিত হয়। এই ধারাতেই এসেছিল মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'।

মদনমোহনের আগে পর্যন্ত প্রায় সবকটি বাংলা প্রথমপাঠেই আগে ব্যঞ্জনবর্ণ শিখিয়ে তারপর স্বরবর্ণ শেখানো হয়েছে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যেও এই রীতির সমর্থন মেলে। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অভয়ামঙ্গল প্রভৃতিতে প্রধান চরিত্রের শিক্ষারম্ভের বর্ণনায় ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে অক্ষরজ্ঞান শুরুর কথা বলা হয়েছে। এমনকী ১৮২৫-এ প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা গদ্যপুস্তক 'নববাবু বিলাস'-এর 'অথ গুরুমহাশয়ের নিকটে বাবুদিগের বিদ্যাভ্যাসরীতি' অধ্যায়ে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের বর্ণমালা শেখানোর সূত্রপাত হয়েছে 'চতুস্ত্রিংশদক্ষর' অর্থাৎ চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে।

এখন কলকাতায় ছাপা যে বাল্যশিক্ষা পুস্তিকা পাওয়া যায় তাতে প্রথমে স্বরবর্ণ ও পরে ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে অক্ষর পরিচয় করানো হয়েছে দেখা যায়। এই বই-এ তারপর আ-কার ই-কার ইত্যাদি বর্ণযোজনা শেখানোর কতকগুলি পাঠ দেওয়া হয়েছে। এরপর আছে চারটি সংক্ষিপ্ত গদ্যপাঠ। তারপরেই শুরু হয়েছে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের বানান শেখানো। ক্রমটা এইরকম— য-ফলা, র ফলা, ল-ফলা, ব-ফলা, ণ-ফলা, ন-ফলা, ম-ফলা, রেফ। প্রতিটি ফলা-যোগের দৃষ্টান্ত শব্দাবলির তলায় প্রয়োগবাক্যসহ গদ্যপাঠও দেওয়া হয়েছে। যে সব ব্যঞ্জনের দুটি বা তিনটি মিলে যুক্তাক্ষর গঠিত হলে আকারভেদ হয় তাদের জন্যও দুটি আলাদা পাঠ রয়েছে। এরপর ন-টি চরণে রামায়ণ এবং সাতটি চরণে মহাভারতের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া আছে পশু, শস্য, বৃক্ষ, ফুল, পক্ষী, বস্ত্র, মৎস্য, বাদ্যযন্ত্র, ফল— এ সবের নাম সম্বন্ধে দু'চার পঙ্‌ক্তি করে পদ্য। আরও আছে বাংলা, মুসলমানি ও ইংরেজি সাত বার ও বারো মাসের নাম। দশ দিক, ছয় ঋতু, তিথি ও পক্ষ ইত্যাদিও আছে। বারো পঙ্‌ক্তির 'প্রভাত বর্ণনা' (পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল), ছয় পঙ্‌ক্তির 'বড় কে?' (আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়) আর 'সময়' নামে ছ'লাইনের একটি পদ্য আছে। আর আছে তিনটি গদ্যপাঠ— 'কাক ও জলের কলসী', 'মা ও ছেলে', 'পড়ার সময় গোল করিও না'। বই শেষ হয়েছে 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া' শিরোনামে একটি সচিত্র পাঠ দিয়ে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা চল্লিশ।

মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা'-তেই প্রথম বাংলা প্রাইমারকে অসংযুক্ত বর্ণ আর সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের জন্য দুটি ভাগে আলাদা আলাদা বই করতে দেখা গেল। প্রথম ভাগে অক্ষর পরিচয় করাতে তিনি আগে স্বরবর্ণ শিখিয়ে তারপর ব্যঞ্জনবর্ণ শিখিয়েছেন। তারপর সরল বর্ণযোজনার উদাহরণ। পরের পাঠে দেখানো হয়েছে কার-চিহ্ন যোগে ব্যঞ্জনের চোহারা (ক+া > কা, ক+ ই > কি ইত্যাদি, এরপর আছে একে একে আ-কার ই-কার প্রভৃতি যোগে শব্দগঠন করে এক একটি পাঠ। এই পাঠগুলি পদ্যছন্দে গাঁথা। যেমন, 'পাত পাড়/ভাত বাড়', 'মণি হারা/ফণি পারা', নুন খাই/গুণ গাই'...। বানান শেখাতে শব্দ তালিকা না দিয়ে শুধু বাক্যের মধ্যেই তার প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। এরপর দুই থেকে পাঁচটি শব্দ সহযোগে ছোট ছোট বাক্যের কতকগুলি পাঠ আছে। তারপরে কয়েকটি ঈষৎ বড় পাঠ। সেগুলি দু'তিন অনুচ্ছেদে ভাগ করা। 'প্রভাত বর্ণন'-এর পদ্যপাঠ দিয়ে বই শেষ হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা আঠাশ।

শিশুশিক্ষা-র দ্বিতীয়ভাগে যুক্তবর্ণ শেখানো হয়েছে। এখানেও ফলা-যোগ শেখাতে বাক্যের আশ্রয়ই নেওয়া হয়েছে। আর তাতে আছে ছন্দের দোলা। যেমন— 'পাঠ্য পুঁথি হাতে কর/জাড্য দোষ পরিহর', 'বিদ্যাধন আছে যার/সকলি সুসাধ্য তার'। দুই ও তিন ব্যঞ্জনের যুক্তাক্ষর শেখানোর পর আছে একটি গদ্যপাঠ যার শিরোনাম 'মাধবের সদ্ব্যবহার'। তারপর আছে সপ্তবার, দ্বাদশ মাস ও ছয় ঋতুর নাম। এরপর ক্রমান্বয়ে ছ'টি ঋতুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনার গদ্যপাঠ দিয়ে বই শেষ হয়েছে। এ বই-এর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা কুড়ি।

মদনমোহনের শিশুশিক্ষা-র দুটি ভাগ ১৮৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশের পাঁচ বছরের মাথায় প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় পুস্তিকার দুটি ভাগের সার্বিক পরিকল্পনা ও পাঠপ্রণালীতে ব্যাপক পরিবর্তন ও উৎকর্ষ লক্ষ করা যায়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের কথা। এটি বিদ্যাসাগরের অসামান্য কৃতিত্ব। এর আগে পর্যন্ত বাংলা বর্ণমালা বিন্যস্ত ছিল ষোলো স্বর আর চৌত্রিশ ব্যঞ্জনে—

অ	আ	ই	ঈ	
উ	ঊ	ঋ	ৠ	
ঌ	ৡ	এ	ঐ	
ও	ঔ	অং	অঃ	
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	
শ	ষ	স	হ	ক্ষ

বিদ্যাসাগর স্বরবর্ণ থেকে দীর্ঘ-ঋ ও দীর্ঘ-ঌ তুলে দিলেন এবং অনুস্বার ও বিসর্গকে নিয়ে গেলেন ব্যঞ্জনের শেষদিকে। ব্যঞ্জনের শেষ বর্ণ ক্ষ যেহেতু ক্ আর ষ-এর মিলনে গঠিত যুক্তবর্ণ তাই সেটিকে ব্যঞ্জনের তালিকা থেকে বর্জন করলেন। নতুন পাঁচটি বর্ণ যোগ করলেন— ড় ঢ় য় ং ৎ। এ বিষয়ে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপন'-এ বিদ্যাসাগরের ঘোষণা—

বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষায় দীর্ঘ ৠ কার ও দীর্ঘ ৡ কারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ওই দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও

বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না, এ জন্য, ওই দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে ড়, ঢ়, য়, হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত, এই নিমিত্ত, উহারাও স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ; এ জন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এর কুড়ি বছর পরে ষাটতম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এ আবার জানালেন—

বাঙ্গালা ভাষায় তকারের ত, ৎ এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে, দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড তকার। ঈষৎ, জগৎ, প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময়, খণ্ড তকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার শেষভাগে তকারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।

বিদ্যাসাগরের এই সংস্করণের ফলে ১২ স্বর আর ৪০ ব্যঞ্জন নিয়ে বাংলা বর্ণমালার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২। বর্ণমালার এই বিন্যাসই তারপর থেকে এতদিন ধরে প্রচলিত হয়ে এসেছে। তবে সম্প্রতি স্বরবর্ণের তালিকা থেকে অনাবশ্যক বর্ণ ঌ (লি) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ থেকে অন্তঃস্থ ব (বর্গীয় ব-এর সঙ্গে অভিন্ন আকৃতি হওয়ার কারণে) বর্গটি বাদ দেওয়ায় বাংলা বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা ৫০-এ নেমে এসেছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সহজ পাঠ প্রথম ভাগে বর্ণপরিচয়ের শেষ ছড়ায় ক্ষ এই যুক্ত বর্ণটির উল্লেখ করেছেন। তাঁর শৈশবে পাঠ শুরু হয়েছিল যে বই দিয়ে সেখানে বর্ণমালায় ক্ষ-এর উপস্থিতি তাঁর স্মৃতিতে গেঁথে গিয়েছিল বলেই অমনটা ঘটেছে বলে মনে হয়।

খুদে পড়ুয়াদের কীভাবে ঠিকমতো পড়ানো দরকার তা নিয়ে দুটি নির্দেশ দিয়েছেনে বিদ্যাসাগর মশায়। সেগুলি আছে প্রথম ভাগের ষাটতম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে— ১. শিক্ষার্থীরা অনেক সময় অ আ বর্ণ দুটিকে স্বরের অ স্বরের আ বলে থাকে। তারা যাতে সেরকম না বলে 'কেবল অ, আ এইরূপ বলে। তদুপ উপদেশ দেওয়া অবশ্যক।' ২. কর, খল, ঘট, জল, পথ, রস, বন— এইসব শব্দের উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত, আবার ছোট বড় ভাল ঘৃত তুপ মৃগ ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ অকারান্ত। অথচ অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায় এই তফাতটুকু ঘেয়াল না করার ফলে ব্যঞ্জনান্ত শব্দও অকারান্তভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তাই, 'বর্ণযোজনার উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি অকারান্ত উচ্চারিত হয়, উহাদের পার্শ্বদেশে এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে* তদ্রূপ চিহ্ন নাই, উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবে।'

পাঠদান রীতি নিয়ে এরকম আর একটি নির্দেশ আছে দ্বিতীয়ভাগে। সেখানে 'বিজ্ঞাপন'-এ বলে দিয়েছেন—

সংযুক্তবর্ণের উদাহরণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়েরা বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, গুরু, শিষ্য, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক। এবং শিক্ষা বিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক।

যুক্তবর্ণ সমন্বিত শব্দের উচ্চারণ ও বানান শেখাতে শব্দ তালিকা দেওয়ার পর যেসব গদ্যপাঠ আছে সেগুলি কীভাবে পড়াতে হবে তা-ও বলে দেওয়া হয়েছে—

অল্পবয়স্ক বালকদিকের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয় এরূপ বিষয় লইয়া, ঐ সকল পাঠ, অতি সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে। শিক্ষক মহাশয়েরা উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য স্ব স্ব ছাত্রদিগকে হৃদয়গম করাইয়া দিবেন।

বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগে পূর্বাপর পাঠের বিন্যাস এবং শব্দচয়নে বিদ্যাসাগর মশায় যেন প্রতি পদে শিশুশিক্ষার্থীদের কথা মনে রেখে এগিয়েছেন। পড়ুয়ার ভাষার আঙিনায় প্রবেশ ঘটছে এই দুটি বইকে অবলম্বন করে। তাই এগুলিকে যেমন তাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে তেমনই লক্ষ রাখতে হবে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের প্রতিও। সেই ভাবেই তিনি পাঠদান প্রক্রিয়ায় শিশুমনস্তত্ত্বসম্মত একটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। এখানেও বিদ্যাসাগর নতুন ধারার প্রবর্তক। এতদিন যেভাবে প্রাইমার লেখা হয়েছে তার থেকে বর্ণপরিচয় একেবারে স্বতন্ত্র ধাঁচের।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। তা হল— এখন বাজারে যে সব প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ পাওয়া যায় সেখানে বিভিন্ন পাঠে বিন্যস্ত শব্দাবলিতে বিদ্যাসাগরপ্রত্ন নারায়ণচন্দ্রের হাত আছে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৩০০ বঙ্গাব্দের সংস্করণে নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'যেখানে যেরূপ পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন আবশ্যক মনে করিয়াছেন', সেই ভাবে বর্ণপরিচয়ের দুটি খণ্ডই 'আদ্যোপান্ত সংশোধন' করেছিলেন। আজকের শিশুরা সেই বই-ই পড়ে থাকে।

বিদ্যাসাগর মশায় প্রথম ভাগে বর্ণযোজনা বা বানান শেখাতে গিয়ে দৃষ্টান্তশব্দ বেছেছেন অতি সতর্কভাবে। আ-কার, ই-কার এসব যোগের বানানের উদাহরণে তিনি শুধুই দুই আর তিন অক্ষরের শব্দ দিয়েছেন। আসলে বাংলায় এরকম দুই ও তিন অক্ষরের শব্দেরই প্রাধান্য। অবশ্য মিশ্র উদাহরণ দেওয়ার সময় বিদ্যাসাগর ওই দুই ও তিন অক্ষরের শব্দের সঙ্গে চার ও পাঁচ অক্ষরের শব্দ চয়ন করতে ভোলেননি। সুনির্বাচিত ওইসব শব্দ বারংবার অভ্যাস করার মধ্য দিয়েই বানান রপ্ত করিয়ে নেওয়ার

পদ্ধতিটিকে তিনি গ্রহণীয়বোধ করেছিলেন। সত্যি বলতে কী, এই ড্রিলিং পদ্ধতি বানান শেখার পক্ষে খুবই ফলপ্রদ।

বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম ভাগে একটি সুপরিকল্পিত প্রণালীতে বর্ণযোজনা শেখানোর পর দুটি মাত্র শব্দযোগে আটটি পাঠ রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যেও আছে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা। প্রথমে বিশেষণ-বিশেষ্য (বড় গাছ), তারপর বিশেষ্য-ক্রিয়া (পথ ছাড় কথা কয়), প্রশ্নবোধক (কি পড়), অনুজ্ঞাবাচক (বাহিরে যাও) সংক্ষিপ্ত বাক্য এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন কালবোধক (আমি যাইব, আমরা যাইতেছি, তাহারা আসিতেছে) বাক্য। এরপর ক্রমে তিন থেকে পাঁচ বা ছয় শব্দ নিয়ে তৈরি সরল বাক্য। পাঁচটি ছোট পাঠ (১৪ থেকে ১৮) ঘটনাভিত্তিক। এই গল্পমূলক পাঠের কেন্দ্রে আছে ঠিক মতো পাঠাভ্যাসের প্রয়োজনের প্রতি উপদেশ। গোপাল আর রাখালকে নিয়ে শেষ দুটি পাঠ বেশ বিস্তৃত। একজন সুবোধ এবং সকলের ভালবাসার পাত্র ও বালকদের অনুসরণীয়; অন্যজন তার বিপরীত আর তাই কেউ তাকে ভালবাসে না, কোনও বালকেরই তার মতো হওয়া উচিত নয় কারণ তা হলে 'সে লেখাপড়া শিখিতে পারিবে না'। উনিশ ও কুড়ি নম্বরের শেষের এই দুটি পাঠে বেশ কিছু বড় বাক্য আছে, তবে সেগুলি যাতে ঠিকমতো পড়তে পারা যায়, সে জন্য যথেষ্ট যতিচিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

প্রথম ভাগ যেমন অসংযুক্ত বর্ণের বানান শেখাবার বই, তেমনই দ্বিতীয় ভাগে শেখানো হয়েছে সংযুক্ত বর্ণের রূপ আর যুক্তব্যঞ্জনযোগে গঠিত বানান। শিশু মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ রেখে সুচারুভাবে সে কাজ সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর। শুরু হয়েছে য-ফলা দিয়ে। তারপর একে একে র-ফলা, ল-ফলা, ব-ফলা, ণ-ফলা, ন-ফলা ও ম-ফলার পর রেফ যোগে গঠিত শব্দের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এরপর এসেছে দুই, তিন ও চার বর্ণের মিশ্রসংযোগের উদাহরণ। প্রতিটি বর্ণসংযোগ শেখানোর পরেই একটি করে গদ্যপাঠ দেওয়া হয়েছে।

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের গোড়ার দিককার সংস্করণগুলিতে মদনমোহনের 'শিশুশিক্ষা' থেকে কিছু পাঠ নেওয়া হয়েছিল। পরে সেগুলি বর্জিত হয়। প্রথম প্রকাশের একুশ বছর পরে দ্বিতীয়ভাগের বাষট্টিতম সংস্করণে এক সংক্ষিপ্ত 'বিজ্ঞাপন'-এ জানানো হয়: 'এই সংস্করণে, কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত এবং চারটি নতুন পাঠ সংকলিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা নিষ্কাশিত হইয়াছে।' এতদিনে বইখানি একান্তভাবে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব রচনা হয়ে উঠল।

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ে আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। তাঁর সমকালে প্রচলিত 'বালাশিক্ষা'-য় 'দিলে বিধি মিলে নিধি/দৈব বাণী বৈধ জানি', কিংবা 'শিশুশিক্ষা'-র 'বেদ ছাড়ে খেদ বাড়ে', 'ধর্মপথের পান্থ হও', 'ব্রহ্মোপাসনা করা সকলেরই উচিত' এমত সব বাক্য থাকলেও তাঁর রচনায় এ ধরনের কোনও কথাই ঠাঁই পায়নি। চলতি হাওয়ার পাখী তিনি ছিলেন না। ব্রাহ্মণ পরিবারের এই পণ্ডিত ব্যক্তিটির সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে এর মধ্যে। তিনি বুঝেছিলেন নবীন শিক্ষার্থীর কাছে এসব বিষয়ের উপস্থাপনা নিতান্তই অনাবশ্যক।

বিদ্যাসাগরের জীবিতকালের মধ্যে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ অবধি যে-হিসাব পাওয়া যায় তাতে প্রথমভাগের সংস্করণ হয়েছিল ১৫২টি। আর দ্বিতীয়ভাগের ১৪০টি। এ থেকেই এই প্রাইমারের জনপ্রিয়তা বুঝতে পারা যায়। পরিকল্পনা ও বিন্যাসের উৎকর্ষের দরুন বিদ্যাসাগরের বই-এর চাহিদা স্বভাবতই আর সব প্রাইমারকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এমনকী মিশনারিরাও তাঁদের স্কুলে অ-খ্রিস্টান রচিত এই বইকে পাঠ্য করেছিলেন।

বাঙালি শিশুর পরম সৌভাগ্য যে তাদের মাতৃভাষায় বিদ্যালাভের প্রথম সোপানটি গড়ে দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ যিনি একাধারে মহান শিক্ষাব্রতী ও অনন্য গদ্যশিল্পী। তাঁর বই-এ পদ্য নেই, কিন্তু আছে অন্তর্লীন ছন্দের স্পন্দন। প্রথম ভাগের অষ্টম পাঠের 'জল পড়িতেছে। পাতা নড়িতেছে।' পঙ্‌ক্তি দুটিই হয়ত রবীন্দ্রনাথের কাছে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'-তে রূপান্তরিত হয়ে আদি কবির কবিতায় পরিণত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়-এর পর প্রথমপাঠের যে বইখানি শিশুমন জয় করতে পেরেছিল সেটি হল যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি'। এ বই-এ বাংলা বর্ণমালা নিয়ে ছড়া 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে...' আজও অনেকের মুখস্থ। ছবিতে আর ছড়ায় গাঁথা বইটিতে নতুনত্ব ছিল।

'বর্ণপরিচয়' প্রথম প্রকাশের ঠিক পঁচাত্তর বছর পরে ছেপে বেরোয় রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'। বিশ্বকবির দীর্ঘদিনের ভাবনা থেকে উৎসারিত এবং নন্দলাল বসুর চিত্রভূষিত ওই বই পরিকল্পনা ও বিন্যাসের দিক দিয়ে বিদ্যাসাগরের বই-এর থেকে একেবারে অন্য ধাঁচের। দু'জনের দুটি করে প্রাইমারই আজ পাশাপাশি বাঙালি খুদে পড়ুয়াদের হাতে হাতে ফেরে। বর্ণপরিচয় প্রকাশের দেড়শো বছরের সঙ্গে সঙ্গে সহজ পাঠ পুস্তিকাদুটিরও পঁচাত্তর বছর হবে।

সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি :

এই লেখায় ব্যবহৃত অনেক তথ্য নেওয়া হয়েছে এইসব সূত্র থেকে: ১. শিশুশিক্ষা: মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত— ড. আশিস খাস্তগীর, পুস্তক বিপণি। ২. শিক্ষাসার থেকে বর্ণপরিচয়— সমাজের সঙ্গে শিশুপাঠের পরিবর্তন— বিনয়ভূষণ রায় (আকাদেমি পত্রিকা, মে ১৯৯৪)। ৩. বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (গোপাল হালদার সম্পাদিত)— প্রথম খণ্ড, নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি কলকাতা। ৪. বাল্যশিক্ষা (রামসুন্দর বসাক)— সীতানাথ আদর্শ লাইব্রেরি, কলকাতা-৯। ৫. বর্ণ পরিচয়: প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ— দেবসাহিত্য কুটির প্রাঃ লিঃ।

আতাউর রহমান সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞাত কিছু তথ্য

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল স্টুডেন্টস ফেডারেশন (১৮নং মির্জাপুর স্ট্রিট) নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত হয়েছিল। নিষিদ্ধ হয়েছিল অন্যান্য কিছু জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠনও। এইসব সংগঠনের নেতৃস্থানীয়রা মিলে ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে একটি মিটিং ডেকেছিল নতুন একটি ছাত্র সংগঠন তৈরির উদ্দেশ্যে। কারণ তখন কলকাতায় ছাত্র আন্দোলনের যে জোয়ার বইছিল তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা জরুরি হয়ে উঠেছিল। এই মিটিং থেকেই তৈরি হয় ইউনাইটেড স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন নামে নতুন সংগঠন। সর্বসম্মতিক্রমে যার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন হুমায়ুন কবির এবং দুই ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আতাউর রহমান।

১৯৪৪ সালে বেঙ্গল প্রভিনসিয়াল স্টুডেন্টস ফেডারেশনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে আতাউর রহমান এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হয়েছিলেন। তা ছাড়া অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য হিসাবেও তাঁর তৎকালীন ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই সময় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে পালিত হয় ভিয়েতনাম দিবস। এই কর্মসূচি রূপায়ণে অন্যান্যদের সঙ্গে আতাউর রহমান পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

তা ছাড়া সেই সময় যাঁদের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দিদের মুক্তির দাবিতে এবং ঐতিহাসিক রশিদ আলি দিবস পালন নিয়ে ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রপথিক ছিলেন আতাউর রহমান। এই উত্তাল সময়ে 'স্বরাজ' নামে যে দৈনিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তার একজিকিউটিভ ডিরেক্টর ছিলেন আতাউর রহমান। এই দৈনিকটির রবিবাসরীয় সংস্করণের ম্যাগাজিন সেকশনের দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন তখনও অখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশকে। 'স্বরাজ' দৈনিকটি প্রকাশের কিছুকাল ব্যবধানে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী (ইংরাজিতে বলা হত Premier) আবুল কাশেম ফজলুল হকের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'নবযুগ' পত্রিকা। এই পত্রিকাটির প্রকাশক এবং চিফ একজিকিউটিভ ছিলেন আতাউর রহমান। 'নবযুগ' বের হত লোয়ার সার্কুলার রোড থেকে। এই ঠিকানাই ছিল আতাউর রহমানের তখনকার বাসস্থান। যে বাসস্থানটি ছিল তৎকালীন স্বাধীনতাসংগ্রামী বিভিন্ন দলের ও ছাত্র সংগঠনের নেতাদের আশ্রয়স্থল। গোপনে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা করার এবং কখনও কখনও আত্মগোপন করার ঘাঁটিও ছিল এই বাসস্থানটিই।

আতাউর রহমান যখন পুরোদমে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকা পরিচালনা করছেন সেই সময়েই মূলত তাঁরই উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'ইন্ডিয়া' নামে একটি ইংরাজি মাসিক পত্রিকা। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার মতো এই পত্রিকাটিতেও প্রকাশক হিসাবে তাঁর এবং সম্পাদক হিসাবে হুমায়ুন কবিরের নাম ছাপা হত। এই পত্রিকাটির তখনকার উপদেষ্টামণ্ডলীতে ছিলেন ইউসুফ মেহের আলি, মিনু মাসানির মতো খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবীগণ।

এই ধরনের পত্র-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত থাকার সময়েই আতাউর রহমান দিলীপকুমার গুপ্তের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন একটি প্রকাশন সংস্থার, নাম— গুপ্ত রহমান প্রকাশনী। এই সংস্থা থেকেই প্রকাশিত হয় জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তারার তিমির'। যে-কবিতাগ্রন্থটি সাহস করে প্রকাশ করার মতো প্রকাশক সেই সময় দুর্লভ ছিল। এই প্রকাশনী থেকে ছাপা হয়েছিল অন্যান্য আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। গুপ্ত রহমান প্রকাশনী যখন এ ধরনের প্রকাশনার কাজে ব্যস্ত তখনও কিন্তু চালু ছিল দিলীপকুমার গুপ্তের বিখ্যাত সিগনেট প্রেস। মুদ্রণশিল্পে নতুন অধ্যায় সূচনাকারী এই সিগনেট প্রেস চালু থাকা সত্ত্বেও আতাউর রহমানের সঙ্গে নতুন প্রকাশন সংস্থা খুলতে সম্মত হওয়াটা দিলীপকুমার গুপ্তের গভীর বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন।

গুপ্ত-রহমান প্রকাশনী ছাড়াও চতুরঙ্গ পত্রিকার প্রকাশক হিসাবে আতাউর রহমান চালু করেছিলেন আর একটি প্রকাশন সংস্থা। যার নাম ছিল চতুরঙ্গ প্রকাশনী। এইখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল যুবনাশ্বের (মণীশ ঘটক) 'পটলডাঙার পাঁচালী'।

• হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে মহাজাতি সদনে সম্ভবত প্রথমবার যে অল ইন্ডিয়া রাইটার্স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল তারও মুখ্য সংগঠক ছিলেন আতাউর রহমান। এই লেখক সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু।

১৯৫৭ সালে কলকাতায় সর্বপ্রথম বালুচরি শাড়ি এবং অন্যান্য হস্তশিল্পের যে প্রকাশ্য প্রদর্শনী হয় তার সাংগঠনিক কমিটির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন আতাউর রহমান। এই বর্ণাঢ্য প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেছিলেন জওহরলাল নেহরু।

আতাউর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হাউস নির্মাণের। যেখানে বিশেষ করে কলকাতায় পড়তে আশা এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীরা থাকার সুযোগ পাবে। বিদেশি অধ্যাপক এবং গবেষকদেরও থাকার বন্দোবস্ত থাকবে সেই হাউসে। একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি এ কাজ শুরুও করেছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হাউসের নিজস্ব বাড়ি নির্মাণের জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশান্সের তরফে হ্যারিংটন স্ট্রিটে তিনি প্রায় দু'বিঘা জায়গা সংগ্রহও করেছিলেন। ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হাউসের ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানে অট্টালিকা নির্মাণ আতাউর রহমানের জীবদ্দশায় সম্ভব হয়নি। জায়গাটিতে অতি সম্প্রতি একটি অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। মূলত আতাউর রহমানের উদ্যোগে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির কথা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নিশ্চয়ই জানা আছে। সেই প্রকল্প যদি বর্তমান অট্টালিকায় বাস্তবায়িত হয় তা হলে আমাদের সংস্কৃতিমনস্ক বিদ্যোৎসাহী মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই আতাউর রহমানের অপূর্ণ স্বপ্ন এবং অসমাপ্ত উদ্যোগের কথা স্মরণে রেখে কোনওভাবে তাঁর একটু স্মৃতিরক্ষার বন্দোবস্ত করবেন।

[আতাউর রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু নীহাররঞ্জন চক্রবর্তীর মৌখিক স্মৃতিচারণ থেকে অনুলিখন। মৌখিক স্মৃতিচারণটির এই অনুলিখনটির সঙ্গে প্রকাশিত হল আতাউর রহমানকে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি পত্র। পত্রটি পঞ্চাশের দশকে কলকাতার বুদ্ধিজীবীসমাজে আতাউর রহমানের অবস্থান, ব্যক্তিগতজীবন এবং তৎকালীন সমাজভাবনার কিছুটা আভাস বহন করে। পত্রটি আমরা পেয়েছি আতাউর রহমানের দৌহিত্র জায়ান রহমান এবং দৌহিত্রী জোরা রহমানের সৌজন্যে।

সম্পাদক-চতুরঙ্গ]

প্রীতিভাজনেষু,

আতোয়ার, চিঠি পেলুম। 'চতুরঙ্গ' তা হোলে এখনও বের হয় নি! আমিই না হয় নানা ধাক্কায় বে-রঙ হয়ে পড়ে আছি, আপনি তো আর রঙ-ছুট হয়ে যান নি, তা হোলে 'চতুরঙ্গ' বের হোলো না কেন? আমি টাকার টানাটানিতে এমন নাজেহাল যে লিখতে বসাও অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এবারে সব কিছু বন্ধ করে বেণেগিরিতে হাত পাকাতে হবে। কপালে এ দুর্ভোগও ছিলো! আমার শরীরও ভালো নেই। দুনিয়ার যত ক্লান্তি আমাকে যেন পেয়ে বসেছে। বুকুর সঙ্গে দেখা হোলো। দিব্যির আর চকলেটের কথা উঠলো। কেমন করে একজনের বুকে শক্তিশেল হেনেছিলো একটি ছোট্ট মেয়ে সে কথা শুনে আমরা কেউই চোখের জল রাখতে পারলুম না। মনের দুঃখে কবিতা লিখে ফেললুম:

শোনো, শোনো বলি আতোয়ার,
তোমার বক্ষে হেনেছিলো যে গো তলোয়ার,
সে নিঠুরাকে তুমি ভালো বেসেছিলে কি লাগি',
চোখে মুখে কালি ভরেছিলে তুমি রাত জাগি'।
আগেকার কালে কি দিয়ে প্রিয়ার ভুলাতো মন,
ঠিক জানা নাই, কালিদাসে তাই করি স্মরণ।
লোধ্র ফুলের রেণু ছিলো রুজ তখনকার,
কৌটয় ভরে রেণু দিত কবি প্রিয়ারে তার।
অধর রাঙাতে যতদূর জানি আছিলো পান,
প্রিয়ার হস্তে লীলাপদ্মটি কম্পমান।
এ যুগে প্রেমিক চকলেট দেয় প্রিয়ারে তার,
চকলেট-রঙ ঠোঁট, মনি মরি তার বাহার!
লীলা-কমলের জায়গা নিয়েছে vanity bag,
রূপের জায়গা রূপা লইয়াছে এই তো snag।
হেরেছো বলিয়া দুঃখ কোরো না, হাইই জিৎ।
কোণ্ডা কাবাবে মজবুত রাখো দেহের ভিৎ।।

'স্বাধীনতা' আমার শ্রাদ্ধ করছে জেনে খুশি হলুম। এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলকাতায় ফিরবো। ইতি

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

Neptune Court
Napean Sea Rd.
Bombay
13/12/52

শব্দের চলমান চিত্রমালা

অধৃষ্য কুমার

'In 1995, therefore, cinema completed just one hundred years of its life.... in all, we were thirty in number at Lyon. Thirty film makers coming from thirty different countries. In the absence of any factory after one hundred years, a somewhat of a fake structure was erected at the same place, and we, the thirty film makers, were instructed to come out at the call of the French Minister of Culture in the absence of Luis Lumiere, there was his grandson with his grand father's camera. ...At a specific time which probably was Lumier's time, hundred years ago, the minister shouted "start", and we, 'the thirty workers' rushed out, not quite smoothly though. ...I was with Youssef Chahine of Egypt and, perhaps Miguel Littin of chile (on whom Marquez wrote a book "Clandestine in Chile"). In our team all three of us walked faster than the others to touch Lumire's vintage camera.' (পৃঃ-৩০৬)

তাঁর স্মৃতিকথা "Always being born"-এর সব শেষ পরিচ্ছেদে সদ্য দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার প্রাপ্ত মৃণাল সেন এভাবেই এঁকেছেন সিনেমার শতবর্ষপূর্তির ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের ছবি। নিখুঁত ফ্রেমের পর ফ্রেমে আমাদের হাত ধরে যেন নিয়ে চললেন ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে, আমরাও প্রায় ছুঁয়ে দেখলাম লুই ল্যুমিয়েরের ১০০ বছরের পুরনো ক্যামেরা। এই পরিচ্ছেদের এবং "Always being born"-এরও শেষ হচ্ছে চার্লি চাপলিনকে নিয়ে লেখা ভেভিড রবিনসনের বহু আলোচিত বইয়ের একটি মর্মস্পর্শী মুহূর্ত দিয়ে 'He would sit for hours with Oona, holding hands and hardly exchanging a ward. "She is able to share that strange solitude of his', said his son" (পৃঃ-৩০৮)

মৃণাল সেন এর আগেও একাধিকবার নিজের সম্পর্কে, নিজেকে নিয়ে মুখ খুলেছেন, লিখেছেন। সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক একাধিক বই ইংরাজি এবং বাংলাতেও প্রকাশিত হয়েছে। "Alway being born" মৃণাল সেনের পূর্ণাঙ্গ আত্মচরিত না হলেও নিঃসন্দেহে এক দুর্লভ স্মৃতিচারণ। কলকাতায় বইটির উন্মোচন অনুষ্ঠানে মৃণাল সেন জানালেন, বইটি কোনও অর্থেই তাঁর পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী নয়। তাঁর জীবনের নানা ঘটনা, ঘাত প্রতিঘাতের গল্প মাত্র। কমবেশি প্রায় তিনশো পৃষ্ঠার বইটিতে আছে শুধু গল্প আর গল্প। অথবা একটাও গল্প নেই সবই রক্ত-মাংসের জীবন্ত চলমান ঘটনা।

বিংশ শতাব্দী জোড়া নানা ঘটনার টুকরো টুকরো ছবি এসেছে একটার সঙ্গে আর একটার আপাত-বিচ্ছিন্নতা নিয়ে। পড়ার সময় স্থান-কাল-পাত্রের এরকম অসমতল বিন্যাসে পাঠক কিছুটা বিহ্বল হলেও বই সরিয়ে চোখ বন্ধ করলেই চোখের সামনে সম্পূর্ণ অন্য জগৎ, একের পর এক ছবির ফ্রেম সাজিয়ে গাঁথা চলছে এক অপূর্ব অন্তহীন সেলুলয়েডের ভাষা। শব্দ দিয়ে ছবির ফ্রেমের পর ফ্রেম গেঁথে স্মৃতির জগৎকে এরকম চলমান চিত্রমালায় পাঠকের সামনে হাজির করা বোধহয় শুধু মৃণাল সেনের মতো চলচ্চিত্রকারের পক্ষেই সম্ভব।

বইয়ের শুরুতে কলকাতার সঙ্গে অথবা বলা উচিত 'ক্যালকাটার' সঙ্গে গভীর প্রণয়কাহিনি। ছোটবেলার পুরনো প্রেমিকার নাম বদলে 'কলকাতা' করে ফেলা মৃণাল সেনের যে একেবারেই পছন্দ নয় তা তিনি একাধিকবার জোর গলায় বলেছেন বহু সভাসমিতিতে। 'Kolkata' বললেই তাঁর 'K'-এর অনুষঙ্গে কোলাঘাট এবং তার সঙ্গে চকচকে রুপোলি ইলিশ মাছের ছবি ভেসে ওঠে। কৈশোর যৌবনের 'ক্যালকাটার' সব ছবির ফ্রেম হারিয়ে যায়। আসলে এই স্মৃতিকথা আপাদমস্তক সিনেমা আর কলকাতার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া একজন মানুষের আত্মকথা। একদিক থেকে দেখলে মৃণাল সেনের সমগ্র চলচ্চিত্র কর্মের বারো আনাই আত্মকথামূলক (Autobiographyical)।

যাঁর শরীর-মন সারাটা জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে 'ক্যালকাটা' শহরের সঙ্গে, যিনি অকপটে বলতে পারেন 'ক্যালকাটা মাই এলডোরাডো'। তাঁর সিংহভাগ ছবির নেপথ্যনায়কও যে

তাঁর শহর কলকাতা হবে— এটাই স্বাভাবিক। অবধারিতভাবেই বইটির প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'My city', 'কথাপুরুষের' কথা শুরু এভাবেই 'By accident a maker of films, I am what I am. My city mercilessly maligned and dangerously loved, in a way is a state of my mind.'- কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই— এত সহজে এত নির্মোহ হয়ে, অথচ সোজাসুজি নিজেকে নিজের প্রাণের শহরের সঙ্গে একাকার করে পাঠকের কাছে নিবেদন— এককথায় একেবারে সাচ্চা মৃণালসেনীয়। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল ভেনিসে 'একদিন আচনক'-এর প্রদর্শনীর শেষে এক দর্শকের প্রশ্নের উত্তরে। 'In the press meet at venice-89, the first question that I was to answer was very direct & simple, "To what extent is your film autobiographical?' I smiled, I ransacked myself, smiled again, and said, "To the extent it is yours."(পৃঃ ২৮০)।

বইটির প্রায় প্রতি পরিচ্ছেদেই ঘুরে ফিরে এসেছে— 'ক্যালকাটার' কথা। শেষ পর্যন্ত যে কোনও শিল্পসৃষ্টিই শিল্পীর একান্ত নিজস্ব। সার্থক শিল্পসৃষ্টি তখনই হয়ে ওঠে যখন তা 'নিজের' সঙ্গে 'চারপাশকে' কালোত্তীর্ণ করে মিলিয়ে দিতে পারে। সেই অর্থে গদার-এর সঙ্গে প্যারিসের, অ্যান্তোনিয়নির সঙ্গে রোমের, জ্যাঁ্যাবোর সঙ্গে বুদাপেস্টের সম্পর্কের মতোই মৃণাল সেনের শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক।

১৯৫৫-য় 'রাতভোর' দিয়ে শুরু করে ২০০২-য় 'আমার ভুবন'— নয় নয় করে তেত্রিশটি ছবি নির্মাণ করেছেন মৃণাল সেন। সতেরোটি পরিচ্ছেদে নানাভাবে ঘুরেফিরে প্রায় সবকটা ছবির প্রসঙ্গই এসেছে এই বইতে। লেখার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠকের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে দেওয়া। প্রাককথনে মৃণাল সেন রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করেই বলেছেন, 'সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।' কিন্তু নির্দিধায় বলা যায় এত স্বচ্ছন্দ, অথচ এত সহজ, এত গভীর অথচ এত বহুধাবিস্তৃত স্মৃতিকথা আমাদের দেশের চলচ্চিত্রকারদের কাছ থেকে বোধহয় আমরা এর আগে কখনও পাইনি। মৃণাল সেন বহুবার নানা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন তাঁর সিনেমার সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য বলতে খুব একটা কিছু গোছানো খাতাপত্তর নয়। তা নিয়ে তিনি কাজে নামেন না। তাঁর সব ছবির শুরুতেই একটা কাহিনিসূত্র থাকে— তারপর কাজ করতে করতে নিজেকে, দলবল, অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে সেটা পাল্টাতে থাকেন অনবরত। ছোট ছোট চিন্তাভাবনা— ছোট ছোট ছবি তাঁর মনের পর্দায় ফ্রেমের পর ফ্রেম সাজিয়ে নির্মাণ করেন অসাধারণ সব ছবি। বই লেখার শুরুও সেইভাবেই— সেই মৃণাল সেন ঘরানায়, অগোছালো অপঙ্‌ক্তি আটপৌরে ভাবে। 'As I began writing and simultaneously, continued my search for materials, the strongest of all that happened were fragments of latent memories that came to the surface with effortless grace, like in Ronald Colman's "Lost Horizon' directed by Frank Capra" (Preface IX).

একের পর এক পরিচ্ছেদে মৃণাল সেন তাঁর স্মৃতির ক্যানভাস সেঁটে সেঁটে পাঠকের জন্য তৈরি করেছেন এক অনায়াস চিত্রনাট্য। আত্মকথায় স্মৃতিতে ধরে রাখা মস্তিষ্কের চেতনার স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা ঘটনার পর ঘটনার জানলা খুলে যায় একে একে, তার অনেক কিছুই প্রমাণের কষ্টিপাথরে যাচাই করা সম্ভব নয়— মৃণাল সেন তা করেনওনি। প্রথম চারটি পরিচ্ছেদ পুরোটাই প্রায় স্মৃতি থেকে তুলে আনা চলমান চিত্রমালা। ১৯৬০-এর দশকে কলকাতায় ছাত্রমিছিলের পর আটকে থাকা পুলিস অফিসারের মুখে লুই আরাগঁর 'এলসা অ্যাট দি মিরর' শুনে ফরাসি চলচ্চিত্রকার লুই মাল-এর থ-হয়ে যাওয়া (পৃষ্ঠা-১০), অথবা সেই ১৯৩৮ সালে ফরিদপুরের মাঠে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বোসকে হিন্দুবিরোধী বলায়, কীভাবে গন্ডগোলের সূত্রপাত আর তার জেরে স্কুলের ইতিহাসের মাস্টারমশাই, যিনি নাটকে শিবাজির চরিত্রে অভিনয় করে আফজল খাঁ-রূপী মৃণাল সেনের মেজদাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন, তাঁর চকচকে টাকে ছাতার বাঁটের নিখুঁত আঘাত (পৃ-১৬))— এই সব গল্পের কি কোনও প্রমাণ হয়! নিখুঁত চিত্রনাট্যে প্রত্যেকটি দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আর মৃণাল সেনের ভাষা ধার করেই বলতে হয় 'delightfully under stated'। প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই এক একটি ঘটনার উল্লেখ। প্রতিটি ঘটনাই পরস্পর থেকে আপাত-বিচ্ছিন্ন। কোথাওই কোনও উচ্চকিত ঘোষণা নেই— অথচ সব ঘটনা তথা গল্পের পেছনেই নিশ্চিতভাবে রয়েছে অনেক না বলা কথা। ফরিদপুরের ঘটনা থেকে লুই মালের কলকাতা দর্শন— কোথায় যেন অদৃশ্য যোগ সূত্র— স্থান কালের পাঁচিল পেরিয়ে পাঠকের সামনে অপার বিস্ময়। হিরোসিমা-নাগাসাকির ঘটনা কুরোসাওয়ার মন্তব্য, নেহরুর 'Tryst with destiny', ঝড়ের বেগে ১৯৪৬-৪৭ থেকে ১৯৬৫-৬৬ হয়ে ১৯৮০। আবার ফিরে যাওয়া ফরিদপুরের ছোটবেলায় ছোট বোন রেবার মর্মান্তিক মৃত্যুতে। পাঠককে যেন হাতে ধরে টাইম মেশিনে ঘোরানো— কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। ব্যক্তিগত পারিবারিক স্মৃতিচারণার সঙ্গে সামাজিক ঘটনাগুলি যেন পরস্পর জাপটাজাপটি করে আছে।

আমার প্রজন্মের কলকাতার পাঠক যারা মৃণাল সেনের ভুবন

সোম পদাতিক ইন্টারভিউ-এর হাত ধরে সিনেমার ভাষা বুঝতে শিখেছি, যাদের কাছে ১৯৬৫-৬৬ থেকে পরবর্তী দশ-পনেরো বছরের কলকাতা শহর মানেই 'পদাতিক-কলকাতা ৭১'-এর শহর তাদের অনেকেরই ইতিমধ্যে জানা ছিল পদাতিক প্রসঙ্গে সমর সেনের মন্তব্য। সমর সেন এক কথায় পদাতিককে বাতিল করেছিলেন 'পুলিসের নোট বুক' বলে। পদাতিকের সেই অনবদ্য শেষ দৃশ্য যেখানে মায়ের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিসের চোখ এড়ানো পুত্র ধৃতিমান আর বাবা বিজন ভট্টাচার্য। বিজন ভট্টাচার্যের নিম্নস্বরে দৃঢ় অমোঘ ঘোষণা 'ধর্মঘট না করার মুচলেকায় সই করিনি'— ভারতীয় চলচ্চিত্রে এর থেকে ভাল কোনও রাজনৈতিক দৃশ্য নির্মিত হয়েছে বলে তো মনে হয় না। "I am twenty, for one thousand years I remain twenty"-এই শিরোনামের অধ্যায়ে পদাতিক প্রসঙ্গ আলোচনায় মৃণাল সেন লিখছেন... "Samar Sen formerly a brilliant urban poet, and lately, a hard core left-wing journalist, called it "the report of a policeman." Whatever it was, when making padatik, I was aware of the fact that the line between self criticism and slander is slender but unbreakable. Unbreakable, because of the growth of establishmentarianism even on the Left Front. And whatever I was, I knew, I was not a fencesitter."(পৃ-১১৫)

মৃণাল সেন যে 'Fence Sitter' ছিলেন না এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। চেতনা-চৈতন্য শরীর মন সব কিছু নিয়েই তিনি বামপন্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। অনেক টানাপোড়েন টালমাটাল ওঠা-নামায় বাম আন্দোলনের সঙ্গে নালে-ঝোলে নিজেকে শরিক করেছিলেন বলেই এত অনায়াসে 'self criticiusm'-এর মাঝের slender line প্রসঙ্গে সচেতন আর দায়বদ্ধ। "Always being born"-এর তিনশো পৃষ্ঠার প্রায় কোথাওই সেই দায়বদ্ধতার উচ্চকিত ঘোষণা নেই অথচ— প্রতিটি গল্প, দেশের অথবা বিদেশের চলচ্চিত্রোৎসবের, নিজের ছবি নির্মাণের নানা ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণে— সর্বত্রই কোথাও না কোথাও শব্দের পিছনে পিছনে ছায়ার মতো বামপন্থার, কমিউনিজমের সমাজতন্ত্রের স্বপ্নের সঙ্গে তাঁর মমত্ব— সহমর্মিতা অকপট। সেই সব স্বপ্ন যাদের সাময়িক বিলাস-মাত্র ছিল না তাঁদের সকলের সঙ্গেই স্বপ্নভঙ্গের রক্তক্ষরণে মৃণাল সেনও ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, বিচলিত— কিন্তু পক্ষ বদল করে গাল পাড়বার পাত্র মৃণালবাবু নন। শৈশব-কৈশোরে ফরিদপুরের বাড়ি— বাবার স্বদেশিদের হয়ে কোর্টে লড়াই— জসীমদার (জসীমউদ্দিন) স্মৃতিবিজড়িত সান্নিধ্য, সব পেরিয়ে কলকাতায় বামপন্থী কর্মকাণ্ডের থিয়েটার-গান-সিনেমার চত্বরে খুঁজে পাওয়া গেল গীতা সেনকে (তখন গীতা সোম)। নিজেকে নিয়ে উদোম মজা করতে যারপরনাই পারদর্শী মৃণাল সেন এক অসাধারণ ছবি এঁকেছেন কয়েক লাইনে। মৃণাল সেন, গীতা সেন— সিনেমা আর বাম রাজনীতি নিয়ে এর থেকে মিষ্টি অথচ গভীর, সংশয় আর প্রত্যয়ের মিলমিশ বোধহয় হতে পারে না। 'Long years ago..' অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না। বিয়ের আগে, নাটকের রিহার্সাল সেরে বাড়ি ফেরার পথে প্রায়শই মৃণাল পৌঁছে দিতে যেতেন গীতাকে। একদিনের ঘটনা, গীতাকে উপহার দেবেন বলে 'William Gallachar'-এর 'A case for communism' বইটা কিনেছেন। দু'জনে বালি ব্রিজ দিয়ে পাশাপাশি হাঁটছেন... 'As we came to the middle of the bridge, we stopped and stood close to the parapet. We looked beyond, we looked down... All was quiet on all fronts. Irresistable! Moments pass and the inevitable happened. I clasped her hand for the first time in my life and 'drew her closer.Instantly A Case for Communism slipped form my hand and dropped into the darkness below, the lively sound of water rising and folling continuously.' (পৃঃ-৬৩-৬৪)

১৯৬৫-তে 'আকাশ কুসুম'। এরপর আকাশ কুসুম তথা মৃণাল সেনের সিনেমার নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে অথবা বলা যায় সাধারণভাবে নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে স্টেটসম্যান কাগজে মাস দু'য়েক ধরে এক পত্রযুদ্ধে সামিল হয়েছিলেন মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায় আর আকাশ কুসুমের কাহিনিকার আশিষ বর্মণ। 'It was a wordy battle, signifying not much... But the edited version of the controversy involving just three of us featured in the special edition of a book, Les visiteurs le Cannes (The visitors at Cannes) published on the 45th anniversary at the festival at Cannes, in 1992 (পৃঃ-৭৩)— এই পত্রাবলি এই বইতে পরিশিষ্ট হিসাবে থাকলে মন্দ হত কি? মৃণাল সেন আর তাঁর ছবি কলকাতার পণ্ডিত নন্দনতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের কলমের মুখে পড়েছে মাঝেমধ্যেই। তবে মৃণালবাবু তাতে দমবার পাত্র নন। নিজের মতো করে জবাব দিয়েছেন তাঁর ছবির সপক্ষে। কখনও বা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বল ঠেলে দিয়েছেন সমালোচকদের কোর্টেই। কান-ভেনিস-বার্লিন-মস্কো-লন্ডন প্রায় সব চলচ্চিত্র উৎসবের গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিন্তু সাবধানেই নিজের মতামতও বলেছেন বিনীতভাবে।

কান-এ খারিজ দেখানোর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এক লম্বা আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।

'Realism'-এবং 'typage' নিয়ে আলোচনায় এসেছে— ডি সিকার 'বাই সাইকেল থিভস' থেকে আইজেনস্টাইন, গ্রিফিথ এমনকী চার্লস ডিকেন্সের রচনাপ্রসঙ্গও। শেষে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস-এর একটি চিঠির উল্লেখ এবং বিস্তারিত আলোচনা নিঃসন্দেহে সিনেমার পাঠকদের আগ্রহান্বিত করবে। মার্গারেট হার্কনেস নামে এক মহিলাকে লেখা এঙ্গেলসের চিঠিটি উদ্ধৃত করেছেন মৃণাল সেন— 'Realism, to my mind implies, besides truth of detail, the truthful reproduction of typical characters under typical circumstances...' (পৃঃ ২২৫) পুরো বইটার আকর্ষণীয় বিশেষত্ব বোধহয় লেখার ঢঙে— খুবই সাধারণ গল্পের মাঝে মাঝে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বিষয়ও জায়গা করে নিয়েছে শব্দের ফাঁকে ফাঁকে। কখনও চ্যাপলিন শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের বিবরণে কখনও বা সোলানাজ বা গ্রাব্রিয়েল মার্কোজ-এর সঙ্গে কথোপকথনে।

মৃণাল সেন বহু সময়েই বলেছেন যে— 'I don't have an archival flavour'। এই আত্মকথাও সেই অর্থে ইতিহাস চর্চার নথি হিসাবে হয়ত কাজে লাগবে না। কিন্তু এতগুলি বিষয়ে ঝড়ের বেগে বলে গেছেন এবং এত দ্রুততায় এক সময় থেকে অন্য সময়ে কলম ছুটিয়েছেন যা নিয়ে উৎসুক গবেষকরা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই মাথা ঘামাবেন।

বইটির আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না যদি না কয়েকটি বিষয় সবিনয়ে লেখকের কাছে নিবেদন করা যায়। ফরিদপুর থেকে কলকাতা আর তার পরের মৃণাল সেন হয়ে ওঠার বৃত্তান্তর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি, আই পি টি এ-সহ সামগ্রিক বাম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যে আত্মীয়তা এক সময় পর্যন্ত ছিল— সে সব গপ্পো থেকে 'Always being born'-এর পাঠকদের বঞ্চিত করা কি ইচ্ছাকৃত না অসাবধানতাবশত? সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যারা ১৯৬০-৭০ দশকে খাদ্য আন্দোলন-অঙ্গার-'কল্লোল'-লাঠি-গুলি-বোমা-বন্দুক-জেল-পুলিস-মুক্তাঞ্চল থেকে কলকাতা একাত্তর পদাতিক ইন্টারভিউ-এর সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি আমাদের অনেকের কাছেই মনে হয় মৃণাল সেন-সলিল চৌধুরিরা কোথায় যেন নিজেদের শেকড়কে অস্বীকার করতে চান। অথবা এমনটাও হতে পারে সংশয়ের যন্ত্রণায় তাঁরা হয়ত নিজেরাই ক্ষত-বিক্ষত। সহজ উত্তর সম্ভবত নেই। প্যারাডাইস কাফে থেকে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু মিত্র থেকে প্রশান্ত সান্যাল, বিজন ভট্টাচার্য থেকে সলিল চৌধুরি, উৎপল দত্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ থেকে পি. সুন্দরাইয়া— এমন অনেক মানুষ যাঁদের মুখোমুখি হওয়ার অনেক অনেক গল্প মৃণাল সেনের ঝুলিতে আছে, সে সব থেকে আমরা কেন বঞ্চিত হলাম বোঝা গেল না। নাকি ঠোঁটকাটা মৃণাল সেনও শেষমেশ বেশ সাবধানী হয়ে উঠলেন— অবশ্য এমনটাও হতে পারে সে সব উত্তরাধিকার তাঁর সিনেমা-নির্মাণে ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না? জানতে ইচ্ছে করে, মৃণাল সেন মানে নিশ্চিতভাবেই সিনেমা, সিনেমা এবং সিনেমা এ বিষয়ে কোনও কিন্তু না করেও বলা যায় মৃণাল সেনের জীবনেও সিনেমার বাইরের অন্য গল্পগুলো কি তা হলে হারিয়ে যাবে? একজন সামাজিক দায়বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অন্য সব ভূমিকা কি বাতিল? শান্তি আন্দোলন, ভারত সোভিয়েট সংস্কৃতি সমিতি, ৭০-এর দশকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, বন্দিমুক্তি কমিটি, পাঞ্জাব সংহতি কমিটি, আরোয়াল হত্যা তদন্ত কমিটি, পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বিরোধী ৬ আগস্ট কমিটি আরও কত আন্দোলন সংগঠনে সক্রিয়-দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন, সে সব গল্প থেকে পাঠকরা বাদ যাবে কেন? যাঁরা এইসব ক্ষেত্রে মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা জানেন তিনি কখনওই 'নৈবেদ্যের নাড়ু' সভাপতি ছিলেন না— সব কাজেই খুঁটিনাটির সঙ্গে জড়াতেন নিজেকে।

আর সিনেমার বাইরের সাংস্কৃতিক জগৎ— বিশেষত তাঁর নিজের শহর কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতের এমন কোনও আঙিনা নেই যেখানে মৃণাল সেন উপস্থিত নেই। সে সব গল্পই বা 'Always being born'-এ জায়গা পেল না কেন বোঝা গেল না।

কলকাতার বইমেলা-সাংস্কৃতিক উৎসবাদির কথা না হয় বাদই দিলাম। কান-ভেনিস বার্লিন-মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের পাশেই কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের উল্লেখ না হয় না-ই থাকল কিন্তু ১০—১৭ নভেম্বর কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব চলাকালীন গত দশ বছর ধরে আড্ডার কথা মৃণাল সেন কি ভুলে যেতে চান? নন্দনের দোতলায় মিগুয়েল লিটিন, আব্বাস কিরোদসোয়ামি, পল ককস, সান্দ্রো বালদোনা এইসব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র পরিচালক ছাড়াও লম্বা আড্ডা-জমাটি আলোচনায় মেতেছেন সৌমিত্র চ্যাটার্জি, তরুণ মজুমদার ছাড়াও আরও বয়ঃকনিষ্ঠ অনেকের সঙ্গে— সে সব গল্প পেলে কলকাতার পাঠকরা আরও খুশি হতেন বইকি। সব শেষে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের পার্লামেন্টে রাষ্ট্রপতি মনোনীত রাজ্যসভা সদস্য— সেখানেও তো অনেক গল্প। গুজরাট দাঙ্গা বিরোধী সংহতি কমিটির কাজে মেট্রো রেলে আশি বছর বয়সে কলেজ স্ট্রিটে সভায় যাওয়া থেকে শুরু করে আল আমিন মিশনের কর্মকাণ্ডে ঘরের আত্মীয়ের মতো জড়িয়ে পড়া— এ সব খবরে সিনেমা করিয়ে মৃণাল সেনের ভাবমূর্তি ম্লান হত না মোটেই।

বইটির উপস্থাপনা প্রায় নির্ভুল। ছাপার প্রশংসা করতেই হয়। তবে ছবিগুলির গুণগতমান এবং ছবিগুলির সাজানো অনেক

ভাল হতে পারত। সিগাল প্রকাশনার 'মন্তাজ'-এর ছবি এবং সাজানো থেকে যদি বর্তমান প্রকাশক আগে একটু দেখে বুঝে নিতেন। বইটির শেষে নাম এবং বিষয়ের সূচি নির্দেশিকা অবশ্যই জরুরি ছিল। আশা করা যায়, পরবর্তী সংস্করণে পরিশেষে সেই বিষয়তালিকা যুক্ত হবে।

মৃণাল সেনের "Always being born" প্রকাশিত হল ২০০৪ সালে। ঠিক বছর দশেক আগে ১৯৯৪ নাগাদ হাওয়ার্ড ফাস্টের আত্মজীবনী— "Being Red" প্রকাশিত হয়েছিল। আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী-সংগঠক এবং এক সময়ে সারা দুনিয়ার বাম-কর্মীদের প্রায় অবশ্যপাঠ্য সব উপন্যাসের লেখক হাওয়ার্ড ফাস্ট "Being Red"-এ তাঁর কমিউনিস্ট হওয়ার কারণে আমেরিকান রাষ্ট্রের হাতে বছরের পর বছর হেনস্থা হওয়ার বিবরণ লিখেছেন। আবার জীবনের শেষ দিকে কমিউনিস্টদের কাছেও অচ্ছুত হয়ে প্রায় একাকী জীবন কাটিয়েছেন। "Always being born" পড়তে গিয়ে অনবরতই "Being Red"এর কথা মনে আসে— কোথায় যেন একটা অদৃশ্য আত্মীয়তা, 'I am twenty. For one thousand years I remain twenty' পরিচ্ছেদে (পৃ ৭৪) মৃণাল সেন বলেছেন তাঁর ছবির নায়কের মতোই তিনিও হাজার বছর ধরে কুড়ি বছর বয়সেই থাকতে চান— চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে যদি সত্যিই আবার কুড়ি বছর বয়স ফিরে পান আর বালি ব্রিজের ওপর প্রেমিকার ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে হাত থেকে 'A case for communism' খসে পড়ে গঙ্গার জলে তখন ক্যামেরা কি A Case for communism কে follow করতে করতে গঙ্গার ঢেউয়ের আওয়াজে হারিয়ে যাবে নাকি মৃণাল সেনের মুখের ওপর এসে ফ্রিজ করে যাবে? মৃণাল সেন বলছেন 'always question your conclusions?

Always being born— Mrinal Sen
(A Memoir)/ Stellar Publisher Pvt. Ltd./
New Delhi /395.00

চল্লিশের সংস্কৃতির রূপরেখা

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

'রেনেসাঁস' শব্দটি শুনলেই যাদের হাত কোমরে রাখা রিভলবারে চলে যায়, তাদের সামনে কুতোভয়ে বলি বছর দশ-বারো আগে কলকাতার একটি চণ্ডাল পত্রিকায় 'চল্লিশের দশক ঃ অন্য এক রেনেসাঁস' নামে একটি নিবন্ধ লিখে বলতে চেয়েছিলাম - বাংলার সংস্কৃতিতে কার্যত বইছে দুটি প্রধান ধারা। একটির জন্ম উনিশ শতকে, অন্যটির— বিশ শতকের চল্লিশের দশকে। প্রথমটি ছিল ধনবাদী সভ্যতার সংস্পর্শ বা সঙ্ঘর্ষজাত। আর দ্বিতীয়টির উজ্জীবনী উপাদান মার্কসবাদ। উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সমান্তরালে চল্লিশের দশকে সূচিত নবতর একটি সাংস্কৃতিক চেতনার স্বতন্ত্র ধারা আজও সর্বক্ষেত্রে দৃশ্যমান। কার্যত এই দুটি ধারার টানাপোড়েন দিয়েই বোনা হচ্ছে বঙ্গ সংস্কৃতির পরিধেয়।

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়ের 'শিল্প নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে' বইটি হাতে আসায় বুকে একটু বল পেলাম। চল্লিশের দশক বঙ্গ সংস্কৃতিতে যে নতুন ধরনের বিবেক কম্পিত সামাজিক মানবতাবাদের সূচনা করেছিল তা বাঙ্ময় হয়ে আছে এই গ্রন্থটিতে। টানা কোনও বই নয়। লিখতে পারে জানতে পারলে নানা পত্রিকা যেমন তাদের নানান প্রকল্পে, স্মারক পরিকল্পনায়, জরুরি প্রয়োজনে জবরদস্ত উপরোধে কিছু লেখা লিখিয়ে নেয় সেইরকম আর কি।

কী আছে বইটিতে? কী নিয়ে লেখা সব? আছে গান ও গানের তাৎক্ষণিক রূপ ও তার চিরস্মরণীয় স্মৃতি নিয়ে খান চার-পাঁচ লেখা। থিয়েটার ও থিয়েটারের ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেশ কয়েকটি রচনা, কবিতা ইত্যাদি নিয়ে গোটা তিনেক। অন্তত ন'জন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের পরিচয়-পরিচিতি। দলিত সাহিত্য ও কালো মানুষের নিয়ে দুটি লেখা, দুটি পুস্তকের রিভিউ, সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও শিল্পীর স্বাধীনতা বিষয়ক খান তিনেক রচনা। মোট একত্রিশ। এতরকম বিক্ষিপ্ত লেখা, যাদের উপলক্ষ ও উৎস কার্যত এক নয়, প্রসঙ্গ মিলহীন, পরিবেশন পাত্র ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন- তাদের নিয়ে খিচুড়ি হতে পারে, বই হয় কী করে? প্রকাশক রাজি ছিলেন বলে? বইটির জবাবদিহি করতে গিয়ে লেখক আনমনে বয়ে যাওয়া একটি নদীর কথা বলেছেন। যার কিছুটা দেখা যায়, অনেকটাই থাকে নীল পাহাড়ের অন্তরালে। 'কিন্তু সেখানেও আছে নদী। ওই নদীটি যেন আমার সব ভাবনার উৎস, আমার অনুভূতি।' এবার ফিরে আসি সেই চল্লিশের সংস্কৃতির কথায়, আচমকা যে প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম এই লেখা। মার্কসবাদের উজ্জীবনী উৎস থেকে বঙ্গসংস্কৃতিতে এই নদীটিই জন্ম নিয়েছিল চল্লিশের দশকে। গ্রন্থকার পঞ্চাশে ছুঁয়েছিলেন তার সলিলধারা। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর ছুঁয়ে যার আনমনে বয়ে যাওয়া কখনও থামেনি। নানা চড়াই-

উতরাই পেরিয়ে— নানা মানুষের প্রত্যয় আর প্রত্যহের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে সেই নদী। সেই ঘাটে পাড়ি দেয় ঈশ্বরী পাটনী। নদীতে ভাসে গানের নৌকা, থিয়েটারের ছই, লাফিয়ে ওঠে কবিতার শুশুক। সেই স্রোতে দাঁড় বায় ঋত্বিক ঘটক, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফুলের মশাল নিয়ে ঝাঁপ দেয় কেয়া চক্রবর্তী; সেই স্রোতে দেখা হয় চিত্তরঞ্জন ঘোষ, শ্যামল ঘোষ, প্রতুল লাহিড়ির সঙ্গে। হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসেন রণেশ দাশগুপ্ত, হালে হাত রাখেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুঃখ রাতের যাত্রী হয়ে আসেন সুলেখা সান্যাল, সুভাষ মুখুজ্জে, পূর্ণেন্দু পত্রী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

জ্যোতিপ্রকাশের বয়স তখন উত্তীয়কে ছোঁয় ছোঁয়, পঞ্চাশের মনুমেন্ট ময়দান। তার মনে পড়ে কে যেন কাঠ কাঠ গলায় ঘোষণা করেন এখন গান গাইবেন সুচিত্রা মিত্র। লাল শালু দিয়ে ঘেরা গোল মঞ্চে এসে দাঁড়ান সুচিত্রা মিত্র। 'লাল পাড় সাদা শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে তিনি এক হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোনটা ধরলেন। মুখটা সামান্য যেন ওপরে তুললেন। মঞ্চ শান্ত হয়ে গেল। জনসভা স্তব্ধ হয়ে গেল। হাজার হাজার চোখ তাঁর মুখে। সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ, সেই চিবুক, সেই গলা, চাপা কপালের ওপর টান টান ঘন কালো চুল, সেই ছিপছিপে চেহারা যে দেখেনি, সে জানেই না লাবণ্যময়ী কাকে বলে, কাকে বলা যায় রূপবতী। তারপর তিনি গান ধরলেন। তাঁর মতই নিরাভরণ গান। একেবারে খালি গলায় তিনি গেয়ে উঠলেন, রবীন্দ্রনাথের এক অসাধারণ গান। এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা, হাতে হাতে ধর গো। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শোনা সেই গান এখনও কানে বাজে। গানের টানে তিনি যখন চড়ায় গেয়ে ওঠেন, ওই উঠেছে শঙ্খ বেজে, তখন সহস্র মানুষের কান যেন শঙ্খধ্বনিতে উজ্জীবিত আহ্বান শোনে। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে পূজার অর্ঘ্য সাজাবার আহ্বান'.... (আর দেরি নয়)। তো এই হচ্ছে লেখার বিষয়। এই হচ্ছে তার ধরন।

পারফরমিং আর্ট হিসাবে থিয়েটারের গুরুত্ব সমাজ বদলে বিশ্বাসী মানুষদের একটু বেশিই ছিল। ছিল বলেই রাজা সাজার ঘর থেকে তাকে বের করে এনেছিলেন আই. পি. টি এর লোকেরা। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র মিলে বানিয়েছিলেন 'নবান্ন'। মন্বন্তরের মতো সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা করতে সে বরাবর লড়াই করেছে। 'সাম্প্রদায়িকতা ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ' নামক একটি লেখায় জ্যোতিপ্রকাশ সালতামামি দিয়ে দেখিয়েছেন নব্বই এর দশকেও তার সেই লড়াই জারি আছে। গানের মতো থিয়েটারের সঙ্গেও লেখকের সম্পর্ক যে খুবই অন্তরঙ্গ তার প্রমাণ সাজানো আছে অনেকগুলি লেখায়। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে 'শতাব্দীর শেষ নায়ক' অজিতেশ, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, শ্যামল ঘোষ, কেয়া চক্রবর্তী, প্রতুল লাহিড়ি সম্পর্কে স্মৃতিতর্পণমূলক লেখাগুলি ম্যাগনেটের মতো টানে। এসব লেখা শুধু কলমে কালি থাকলে হয় না। আরও কিছু থাকা দরকার।

চল্লিশের সংস্কৃতি কি সব দায় দায়িত্ব ঠিক-ঠাক পালন করতে পেরেছিল? দক্ষদিনের সব গান কি তার কণ্ঠে উঠে এসেছে? মন্বন্তর-দাঙ্গায় হয়ত সে উত্তীর্ণ, কিন্তু দেশভাগ— উদ্বাস্তর শেকল ছেঁড়া সঙ্কট? সেভাবে কেন বাস্তহারার গান গাওয়া হয়নি তারই একটা তন্নতন্ন বিষণ্ণতা জড়ানো অন্বেষণ আছে 'কেন সে গান হয়নি গাওয়া' রচনায়। লিখেছেন 'এই না পারার পেছনে নিশ্চয় একটি নয়, অনেক কারণ আছে। তারই একটি কি চল্লিশের দশকের শেষ দিকে গৃহীত কমিউনিষ্ট রাজনীতির নতুন লাইন? বিপ্লবের লাইন?' বুঝতে পারা যায়, চল্লিশের আত্মীয়-স্বজনদের ফটোয় ও ফলকে লাল গোলাপ দিতেই তিনি আসেননি, নিজেদের কৃতকর্ম ও বিবেকের গায়ে ছ্যাঁকা দিতেও তিনি অকুতোভয়। ঠিক এইখানেই নিহিত রয়েছে বইটার আসল জোর। আমাকে যদি বইটার কোনও বিকল্প নাম ঠাউরাতে দিত আমি নাম দিতাম— 'চল্লিশের সংস্কৃতি: ফিরে দেখা।'

চল্লিশের সংস্কৃতি পঞ্চাশেও যেমন ছিল, ষাটে তেমন ছিল না— থাকা সম্ভব নয়। একান্নবর্তী পরিবার তখন ভেতরের চাপে এমাথা ওমাথা চিড়ে যাচ্ছে। সত্তর। সে তো আগুনের দশক। নানা বিভাজন ও বিচ্যুতির গল্পে, অনেক বিনষ্টির ইতিকথায় নোটবই ভরে যায়। আশি-নব্বই অনেক আগুনই তখন আঙরা। নব্বই-এ এসে চল্লিশের আমূল বিশ্বস্ত লেখককে লিখতে হয় 'সেই গায়ক, পিট সিগার'। খুবই তাৎক্ষণিক একটি লেখা। গান শুনে যারা ঘাড়-মাথা নেড়ে ফিরে এসেছিল তাদের চোখের উপর চাবুক চালিয়ে দেন যেন। 'তেত্রিশ বছর পর পিট সিগার যখন আবার কলকাতায় এলেন কলকাতা তখন একেবারে অপ্রস্তুত। অথচ কমিউনিস্টরা, বামপন্থীরা আগের চেয়ে কত সংগঠিত, কত শক্তিশালী। কত পঞ্চায়েত, কত পুরসভা, কত রাজ্য সরকার চালাচ্ছে তারা। কত টাকা, কত গাড়ি, কত কম্পিউটার, কত ফ্যাক্স, কত সেলুলার ফোন তাদের। তবু আমরা অপ্রস্তুত।' জ্যোতিপ্রকাশ লিখেছেন— 'ভয়ঙ্কর একটা ভয় হয়। নজরুল মঞ্চে, কলা মন্দিরে বা যাদুঘরের(!) হলে গাইতে গাইতে কথা বলতে বলতে হঠাৎ যদি তাঁর মনে পড়ে যায়, কোথাও দেখতে না পেয়ে হঠাৎ যদি তিনি জানতে চান, কোথায় গেল লাল টুকটুকে সেই শালুটা? কোথায় গেল সেই মানুষগুলো এবং শুকনো ভাঙাচোরা মুখে তাদের সেই উজ্জ্বল চোখগুলো? যদি গেয়ে ওঠেন 'হোয়ার হ্যাভ অল দ্য ফ্লাওয়ার্স গন?.... ওহ হোয়েন উইল উই এভার লার্ন?' কী জবাব দেবে কলকাতা?' রণেশ

দাশগুপ্ত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতির সন্ন্যাসীদের নিয়ে জ্যোতিপ্রকাশ ছড়িয়ে লিখেছেন। সম্ভবত নতুন প্রজন্মের তরুণদের জানিয়ে দেবার জন্য— কদের হাতে ছিল চল্লিশের মশাল দেখে নাও। হাতে নয়, ফুলের মশাল থাকত এদের বুক পকেটের নীচে। গোর্কির ডানকোর মতো কর্মঠ হৃৎপিণ্ডটাই ওরা মশাল করে তুলেছিলেন। তার আলোয় দপ দপ করত ওদের চারপাশ। কমিউনিস্টদের ভ্রাতৃঘাতী আত্মহননের খেলা জীবিতকালেই লিজেন্ড হয়ে ওঠা দীপেন্দ্রনাথকে প্রায় অর্ধমৃগু মুক করে রেখেছিল। 'শোকমিছিলে' দীপেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'শ্মশানে দেখা হবে।' জ্যোতিপ্রকাশ বুকের স্নায়ু ছেঁড়া ভাষায় লিখেছেন, 'শ্মশানেও দেখা হয়নি একই আন্দোলনের ভিন্ন হাঁড়ি কমরেডদের। ষাটের শেষে সত্তরের গোড়ায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল শ্মশানও।'এই দীপেন্দ্রনাথের লেখা 'বিবাহবার্ষিকী'তেই তো এক পার্টির হোলটাইমার বলে উঠেছিল— 'বিশ্বস্ত পার্টিসদস্য নিশ্চয় হয়েছি কিন্তু কমিউনিস্ট কবে যে হব?' প্রদর্শনপ্রিয় সংখ্যার বিস্ফারিত মিছিলে কিন্তু হারিয়ে গেছে সেই আন্তরিক আর্তি, যা একসময়কার মণিমোহনদের হাতের নয়, বুকের পতাকায় কেঁপে কেঁপে উঠত।

প্রভূত যত্নে বিপুল তথ্য সাজিয়ে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে 'দলিত সাহিত্যের কথা' নামে যে লেখাটি তিনি তৈরি করেছেন, কিছু মূল লেখার ভাষান্তর অনুষঙ্গ হিসাবে সাজিয়ে দিলেই একটা আলাদা মনোগ্রাহী বই হয়ে যেতে পারত। 'প্রকৃত শিক্ষিত' গোপাল হালদার ও বিরল প্রজাতির 'Marxologist' ধূর্জটিপ্রসাদ লেখা দুটি স্বতন্ত্র মহিমায় আসীন।

'শোনা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে একবার পার্টি সেলে গালমন্দ শুনতে হয়, ভর্ৎসনার প্রস্তাবও পাশ হয়ে যায়। পোস্টার মারতে যে স্কোয়াড বেরিয়েছিল তাতে তিনি আসেননি নির্দেশ সত্ত্বেও।.... মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কি একা? বোধহীন, স্নেহহীন যান্ত্রিক শাসনে নষ্ট হয়ে গেছে কত সম্ভাবনা। কতজন ফিরে গেছে অভিমানে, বিরক্তিতে, স্বেচ্ছা নির্বাসনে। সৃষ্টিছাড়া শাস্তির সেই অন্ধকারে। কত শিল্পী মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে ভুল পথে। বিকৃত পথে। এখন নিন্দিত তারা। হয়ত বা নিন্দারই উপযুক্ত তাঁরা... কার নিন্দা করো তুমি? ওই হাত যখন কেঁপে উঠেছিল দুর্বল হতে হতে; তখন তুমি কি তাকে টেনে নিয়ছিলে বুকে? আশ্রয়, প্রশ্রয় দিয়েছিলে স্নেহে শ্রদ্ধায়? উৎসাহ দিয়েছিলে প্রকৃত সৃষ্টির কাজে?' (শিল্পীর স্বাধীনতা, শিল্পীর অঙ্গীকার) কোনও সংস্কৃতিতে মাতৃত্বের এই বৎসল হৃদয়ের টানাটানি পড়ে গেলে অনেক সোনার ধান ঝরে যায়, ঘটে যায় অনেক গহন ক্ষতি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আমি এক হোমিওপ্যাথ কম্পাউন্ডারের কথা জানি যে সত্তরের দশকে মাইনে নেই এমন একটি স্কুলে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল ঝোলা ব্যাগে সুভাষ মুখুজ্জের কবিতার বই পুরে। তখন তার জিভে নাচত এই ছন্দিত উচ্চারণ—

দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে
সাতটি রঙের ঘোড়ায় চাপায় জিন
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি লাল টুকটুকে দিন।

আহা, সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়! তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে ঠিক লেখাটা কে লিখতে পারেন? জুয়ায় হেরে যাওয়া পঞ্চ পাণ্ডবের মতো কারা যেন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন সেদিন, লুটপাট হয়ে গেল তাঁর মরণোত্তর দেহ। তৎক্ষণাৎ সুবোধ সরকার চাকু দিয়ে একটা লেখা লিখেছিলেন মনে পড়ছে। শঙ্খ ঘোষের 'দলছুট' কবিতাটা পড়ে মনে হয় তিনিও না লিখে পারেননি। ঠিক এমনই একটি দাগা দেওয়া লেখা সুভাষ নিজে লিখেছিলেন নীহাররঞ্জন রায়ের মৃত্যুর পর। প্রত্যাখ্যান ও অপসরণের মধ্যে কোথাও কি একটা নিভৃ নিভৃ সত্যি ছিল? সেই অন্বেষণের পরও জ্যোতিপ্রকাশ লিখেছেন, 'খুব জানতে ইচ্ছে করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মারা গেলে প্রমোদবাবু যদি বেঁচে থাকতেন কী লিখতেন? কী লিখতে পারতেন?' (যত দূরেই যাই)

শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হলে সুনীল আহ্বাদ করে লিখেছিলেন, তিনি নাকি শক্তিকে চিলার উপর উড়তে দেখেছেন। সবসময় তো কাউকে উড়তে দেখা যায় না- সবাই তা দেখতেও পায় না। জ্যোতিপ্রকাশের শক্তি সম্পর্কিত লেখা দুটি পড়ে মনে হয় কবিরা বোধ হয় খানিকটা অ-কবির হাতেই নিরাপদ।

শম্ভু মিত্র পাঠ করেছিলেন 'চাঁদ বণিকের পালা'। জ্যোতিপ্রকাশ সে পাঠ শুনে লিখেছেন- 'তাঁর কণ্ঠ তখন সোনার জলে ধোওয়া। সে পাঠ শোনা সারা জীবনের একটা অভিজ্ঞতা।'

চল্লিশের সংস্কৃতি মরেনি। অনেকরকম টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে বইছে সেই নদীটি। নানা লেখার মধ্য দিয়ে জ্যোতিপ্রকাশ দেখিয়ে দিয়েছেন কোথায় তার স্রোত, কোথায় তার বৈপাল। ঘানিতে সরষে ফেললে তেল বের হয় বলে ঘানিতে গোলাপ ফেলে পিষলে মধু বের হবে— এই বোধহীন যান্ত্রিকতায় ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু হয় না। সারি সারি দৃষ্টান্তেই তা দৃশ্যমান। আর এই সওয়ালবন্দির কাজ তিনিই করতে পারেন চল্লিশের সংস্কৃতিতে যাঁর সঠিক দাগ নং খতিয়ান নং আছে। বঙ্গে বাম সংস্কৃতির শিরদাঁড়াটা ঠিক কোথায় তিনি হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ বই শুধু সংস্কৃতি কর্মী নয়, নীতিনির্ণয়কারী সত্যবানদেরও পড়ে দেখা দরকার।

শিল্প নিয়ে, সাহিত্য নিয়ে— জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়/ দে'জ, কলকাতা-৭৩/১৫০.০০

ডিরোজিওর কবিতার নতুন দিগন্ত

বুলবুল আহমেদ

ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক এবং সমাজ-সংস্কারক। অত্যন্ত স্বল্পায়ু ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই এক যুগ-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু'শো বছর পরেও তাঁর কীর্তি অনিবার্যভাবে আলোচনায় আসে। শিক্ষক হিসাবে তাঁর সঙ্গে কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তুলনা করা যেতে পারে, কিছু পার্থক্য থাকলেও। ডিরোজিওর জন্ম কলকাতায় এক ইউরোপীয় পরিবারে। তখনকার দিনে ইউরোপীয়রা এক নিপীড়িত সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচিত হত। ডেভিড ড্রামন্ডের প্রিয় মেধাবী ছাত্র ডিরোজিও নিজ সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর সংস্কার, কাজ ও যুক্তিশীলতা ছাত্রমহলে এক অপ্রতিরোধ্য জোয়ার এনেছিল যা সমাজকে এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। 'ইয়ংবেঙ্গল' আন্দোলনের তিনি ছিলেন মন্ত্রণাদাতা। ছাত্রদের অন্ধসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা দিলেও কখনও ধর্মান্তরের কথা বলেননি। রক্ষণশীলেরা বিরোধিতা করলেও তাঁকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি কোনও সময়ই।

ডিরোজিওর এই পরিচয় আমাদের সমাজে সাধারণ শিক্ষিতদের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। যুক্তিবাদী শিক্ষক ও তিমির বিনাশী সমাজকর্মীর আড়ালে প্রায় ঢাকা থেকে গেছে তাঁর কবিমন ও শিল্পীসত্তার কথা। অথচ ডিরোজিওর জীবনকালেই তাঁর দু'টি কবিতার বই প্রকাশিত হয় এবং তখনকার নানা ইংরেজি পত্রিকায় আলোচিত ও প্রশংসিত হতে দেখা যায়। তাঁর অগ্রন্থিত অনেক কবিতা থেকে গেলেও তা সঙ্কলিত হতে দীর্ঘ সময় চলে যায়। পরে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর কবিতা গ্রন্থনার চেষ্টা হলেও নিবিড় অনুসন্ধান ও তন্নিষ্ঠ পাঠ যে হয়নি সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সে কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছে ডিরোজিও স্মরণ সমিতি। এই সমিতি এর আগে 'Unpublished Poems of H.L.V. Derozio' এবং ডিরোজিওর রচনাসমগ্র 'Song of the stormy Petrel' প্রকাশ করেছে। তাদের তৃতীয় প্রয়াস 'ভারত-বীণা ও অন্যান্য সনেট-কবিতা।' এটি একটি দ্বিভাষিক সঙ্কলন। আমাদের ভাষার প্রতিষ্ঠিত কবিরা এই বইয়ের সনেটগুলি অনুবাদ করেছেন। অনূদিত সনেট-কবিতার সংখ্যা চৌত্রিশ। এই অনুবাদ কাজে আছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জিত সিংহ, শঙ্খ ঘোষ এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্কলন সম্পাদনা করেছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'ভারত-বীণা ও অন্যান্য সনেট-কবিতা'র ভূমিকা লিখেছেন ডিরোজিও স্মরণ সমিতির সভাপতি প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সাহিত্য অনুরাগী আবিরলাল মুখোপাধ্যায়। 'ডিরোজিও: কবি, ভাবনা বিপ্লবী' নামের সম্পাদকের মূল্যবান সন্দর্ভটিতে তিনি ডিরোজিওর আত্মনির্মাণ ও তাঁর বিবিধ বিকাশ আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

ডিরোজিওর শিক্ষাগুরু ডেভিড ড্রামন্ড নিজে কবি ছিলেন। তাঁর কাছে কবিতা বিষয়ে ডিরোজিও অন্যতর পাঠ পেয়ে থাকবেন। তবে তাঁর কবিতা রচনায় প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন 'দ্য ইন্ডিয়া গেজেট'-এর সম্পাদক ডক্টর জন গ্রান্ট। ১৮২৫ সালে ডিরোজিও এই পত্রিকায় প্রথম কবিতা পাঠাতে শুরু করেন। ডিরোজিও তখন Juvenis ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর মৃত্যুর আগে প্রকাশিত Poems (১৮২৭) শিরোনামের প্রথম কাব্য জন গ্রান্টকে উৎসর্গিত। ভূমিকায় ডিরোজিও লেখেন, 'Born and educated in India, and at the age of eighteen he ventures to present himself as a candidate for poetic fame.' তাঁর কাব্যচর্চা চলত অন্য সব কাজের অবসরে। পরের বছর বের হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'দ্য ফকির অব জঙ্ঘিরা, এ মেট্রিকাল টেল অ্যান্ড আদার পোয়েমস' (১৮২৮)। এটি উৎসর্গ করা হয় হোরেস হেম্যান উইলসনকে। কাব্যগ্রন্থ দু'টির বাইরে ডিরোজিওর কবিতা প্রকাশিত হয় দ্য ক্যালকাটা গেজেট, দ্য লিটারারি গেজেট, দ্য ওরিয়েন্টাল হেরাল্ড ইত্যাদি পত্রিকায়। ডি. এল. রিচার্ডসনের 'Selection from the British Poets' (১৮৪০)-এ ডিরোজিওর তিনটি কবিতা স্থান পেয়েছে। মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরে ১৮৭১ সালে Owen Aratoon প্রকাশ করেন ডিরোজিওর কবিতার সঙ্কলন "The Poetical Works of Henry Louis

Vivian Derozio with a memoir of the author." তার অনেক পরে ক্রিশ্চিয়ান বেরিয়াল বোর্ডের সম্পাদক বিপিনবিহারী শাহ সম্পাদনা করেন "The Poetical works of Louis Vivian Derozio (১৯০৭)। এরপর থেকে ডিরোজিওর কবিতা সম্পর্কে পাঠকদের মনে আগ্রহ দেখা দেয়। এই বইয়ে অনেক অগ্রন্থিত কবিতাও ছিল। Oxford University Press থেকে F.B. Bradly-Bart-র আলোচনাসহ "Poems of Henry Louis Vivian Derozio: A Forgotten Anglo-Indian Poet" (১৯২৩) প্রকাশিত হয় এবং রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের মুখবন্ধসহ তা পুনর্মুদ্রিত হয় ১৯৮০ সালে। তাঁর সমকালে ডিরোজিওকে কেউ বলেছেন 'ভারতের বায়রন' আবার কেউ বলেছেন বায়রন-মুরের অক্ষম অনুকারক।' তবে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনার পথিকৃৎ। দেশাত্মবোধক কবিতা ও সনেট রচনায় তিনিই প্রথম ভারতীয়। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে ডিরোজিওর সনেটগুলি ও তার বাংলায় অনুবাদ পাশাপাশি রাখা হয়েছে। ডিরোজিওর কবিতা এর আগে অনুবাদ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তবে এইভাবে বড়মাপে ও মর্যাদায় তাঁর কবিতার অনুবাদ আমাদের নজরে আসেনি।

আমরা এক ভারতীয় আত্মার কণ্ঠস্বর শুনি ডিরোজিওর কবিতায়। তিনি নিজেকে ভারতীয় ভাবতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁর রচনায় দেশের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ও দেশের অতীত ঐতিহ্যের কারণে গর্ববোধ অপ্রকাশিত থাকেনি। তাঁর কবিতার আলোচনায় সেই সময়ে 'The Calcutta Gazette'-এ লেখা হয়েছিল— 'The page of Indian history, of his native India, in all its 'glory and its gloom', lies spread before him. The present condition and future prospects of India, are also themes of deep and inspiring interest.' আর আমরা দেখি 'To India—My native Land' কবিতায় কবি লেখেন— 'My Country! in thy day of glory past/ A beauteous halo circled round thy brow/And worshipped as a deity thou wast/Where is that glory, where that reverence now?' কবিতার একদম শেষে কবি ডিরোজিও উচ্চারণ করেন— 'My fallen country! One kind wish for thee." এই কবিতা থেকে স্বাদেশিক ভাবনায় দীপিত হয়েছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলার সম্পাদক থাকার সময় এবং দেশের অস্তগত সুদিনের পুনরুদয় কামনায় অনূদিত হয় 'তব শুভধ্যায় লোকে, অভাগা জননী!'

ইন্ডিয়া গেজেট পত্রিকায় ১৮২৬ সালের ৩রা আগস্ট প্রকাশিত প্রবন্ধে ডিরোজিও নিজে লিখেছেন— 'I was born in India and have been bred here, I am proud to acknowledge my country and to do my best in her service...'। রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৪ সালে জানিয়েছেন— 'কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত 'The Harp of India' কবিতায় আমরা পড়ি— 'কেন জীর্ণ শাখে হোথা একা পড়ে আছো?/চির অনাহত, তুমি রবে কি অমনই?/ছিলে মধুস্বরা, বলো, কে শোনে এখন?/বৃথা শ্বাস ফেলে যায় কেন সমীরণ?' এ তো পরাধীন দেশের সন্তানের আকুতি। তবে দেশের জন্য অন্ধতা তাঁর ছিল না। মহান ভবিষ্যৎ যাঁরা গড়তে চান তাঁদের যেমন নিজেদের অতীত সম্পর্কে গর্ববোধ থাকবে, তেমনই থাকবে জীর্ণতা ও অন্যায় সংস্কার দূর করার মানসতা। সতীদাহ রদ হলে ডিরোজিওর কবিমন চুপ করে থাকতে পারে না, আনন্দবার্তা ঘোষণা করে: 'Bentinck, be thine the everlasting mead!/The heart's full homage, still is virtue's claim,/And,' tis the good man's ever honoured deed/Which gives an immortality to fame:'

সঙ্কলিত সনেটগুলির বেশ কয়েকটি ধারণ করে রয়েছে এক ব্যর্থপ্রেমের কথকতা। এই কবিতাগুলি আমাদের নাড়া দেয় বেশি। আমরা এক ভাবনাশিল্পীর মানবিক দুর্বলতা, ভালবাসা, ব্যর্থতা, দীর্ঘশ্বাস প্রত্যক্ষ করি। অন্য এক ডিরোজিও আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান। তাঁর ভালবাসা পূর্ণতা পায়নি। কবি শঙ্খ ঘোষ অনুবাদ করেছেন, 'রাত্রি' শিরোনামের সনেটগুলি। তাতে আমরা ডিরোজিওর স্বর শুনি: 'আহা, এই শান্তরাতে মধুর স্মরণ মনে আনে/তরুণ প্রেমের কথা, যদিও সে অতীতে বিলীন।/প্রিয় যত অনুষঙ্গ যা কিছু দিয়েছে সুখ প্রাণে/একদিন ভেবেছি যা থেকে যাবে বুঝি চিরদিন!' এই কবিতার অন্যত্র কবি ডিরোজিও লিখেছেন— 'But could my spirit fly from earth afar/' Twould dwell with one I love in yonder lovely star." এই অংশের শঙ্খ ঘোষ কৃত অনুবাদ উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা কঠিন: 'তবু যদি এ-হৃদয় মর্ত্য থেকে উড়ে যেত দূরে/বাসা তবে বাঁধতাম প্রেয়সীকে নিয়ে তারাপুরে।'— এই ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে প্রেমিক কবি ডিরোজিওর উতলতা। 'Romeo and Juliet'-র প্রেমের কথাও ভাষা পেয়েছে তাঁর কবিতায়। তাদের ব্যর্থতা কবিকে ব্যাকুল করে। আর রঞ্জিত সিংহের অনুবাদে আমরা পড়ি— 'তাদের ভাগ্যের কথা ভাবি আর কাঁদি, আর অতঃপর/রাত্রির নিস্তব্ধ ক্ষণ মনের দুয়োরে/এই সে সময় যখন প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনসময় বাসনাতিয়াষী তীব্রতর/যখন যৌবন-আবেগ-মথিত প্রাণ ডুবে যায় আনন্দ-সায়রে।'

'Death! my best friend, if thou dost open the door/the gloomy entrance to a sunnier world/It boots not when my being's scene is furled,/So thou canst aught like vanished bliss restore'— দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে হয়েছে— 'মৃত্যু! বন্ধু শ্রেষ্ঠ মোর, যদি দ্বার খোলো—/অন্ধ দ্বার পথ— আর রৌদ্রাঢ্য বিশ্বের,/কী লাভ সত্তার পট ঢাকা থাকে যদি,/ ফেরাতে না পারো লুপ্ত এককণা সুখও'। অনিবার্যভাবে মনে পড়ে এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে প্রথম যৌবনে লেখা রবীন্দ্রনাথের কথাকটি: 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান'।

কয়েকটি কবিতায় নিসর্গবর্ণনা বিশেষভাবে নজর কাড়ে। 'The Poet's Grave', 'To the Dog Star', 'Italy', 'Morning after a storm', To the moon', 'To the rising moon'. ইত্যাদি ইংরাজি রোমান্টিক কবিদের প্রকৃতিপ্রিয়তার কথা মনে পড়ায়। আর ডিরোজিওর প্রকৃতিচিত্রণে প্রধান অবলম্বন তাঁর অন্তর্লীন বিষাদপ্রবণতা। কিটসের কবিতায় যেমন গ্রিসের কথা ফিরে ফিরে আসে তেমনই ডিরোজিওর কবিতায় আমরা পেয়েছি গ্রিস ও ইটালির নানা প্রাচীন অনুষঙ্গ। ডিরোজিও তাঁর আদর্শের মানুষদের নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। Sappho, Tasso, David Hare, Bacon-র উদ্দেশে। আর আছে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে লিখিত বিখ্যাত কবিতা। এই ছাত্রদেরই তো তিনি যুক্তিবাদে দীক্ষা দিয়েছেন। তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন প্রকৃত শিক্ষকের মতো। আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন কবিতায়— "...And how you worship Truth's omnipotence!/ what joyance rains upon me, when I see/Fame, in the mirror of futurity,/weaving the chaplets you are yet to gain,/And then I feel I have not lived in vain." এই সঙ্কলনে এই অংশের অনূদিত রূপ হল— "তোমরা নিরত থাকো সর্বশক্তি সত্যের পূজায়।/কত যে আনন্দধারা আমার উপরে পড়ে ঝরে/যখন তাকিয়ে দেখি যশোদেবী ভবিষ্যমুকুরে/ গেঁথে চলেছেন মালা কখনও যা পাবে তোমরা, তাই/ সে-সময়ে মনে হয় এ জীবনে বাঁচিনি বৃথাই।' যে ক'টা দিন ডিরোজিও পৃথিবীতে ছিলেন তিনি যে বৃথা বাঁচেননি সে কথা আমাদের অজানা নয়।

প্রণবেশ মাইতির প্রচ্ছদ ঈর্ষণীয়। মুদ্রণ-প্রমাদ-বিরলতা আমাদের প্রেরণা জাগায়। এ বইয়ের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য উপাদান অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের অনুবন্ধ 'সংস্কারকের শিল্পচর্চা' এবং বিভিন্ন কবিতা সংক্রান্ত প্রসঙ্গ পরিচয়।

ভারত-বীণা ও অন্যান্য সনেট-কবিতা— হেনরি ল্যুয়িস ভিভিয়ান ডিরোজিও—সম্পাঃ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়/ ডিরোজিও স্মরণ সমিতি, কলকাতা/ ১০০.০০

দেশজ পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই যে অনেকদিন আগে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'-এর সমালোচনা করতে গিয়ে লিখলেন, 'আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি— আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।' অদ্যাবধি 'সেই ট্র্যাডিশন' বাংলা সাহিত্যসমালোচনাকে পথ দেখিয়ে চলেছে। ভারতীয় সাহিত্য তত্ত্বের নানা প্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনীয় আলোচনায় বাঙালি তাত্ত্বিকদের আগ্রহ অবশ্য অবিচল। কিন্তু তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা নীরবতাতেই অভ্যস্ত। এই রকম একটা প্রচলের গতির মধ্যে অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তীর "লোকাভরণ: আধুনিক কবিতার শৈলী" বইটিকে একটি বাতিস্তম্ভের মতোই মনে হল।

গ্রন্থনাম থেকে আপাত ধারণা হতে পারে যে এও তো Stylistics-এর নিরিখে আধুনিক বাংলা কবিতার সমালোচনা। কিন্তু লেখকের সকৃত টীকা সেই বহুজনস্পৃষ্ট জীর্ণ ধারণা থেকে উত্তরণ ঘটায়। অধ্যাপক চক্রবর্তী গ্রন্থের প্রথম পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদ 'লোকাভরণ: শৈলী ও প্রয়োগ'-এ প্রায় সংজ্ঞার্থের মতোই 'লোকাভরণ'-এর পরিচিতিতে জানিয়েছেন, 'লোকোপাদানের আত্তীকরণই লোকাভরণের মূল। লোকজীবনের উপাদান যখন কাব্যকায়ার সঙ্গে সমীভূত হয় তখন তা হয়ে ওঠে লোকাভরণ।' অর্থাৎ আবরণ বলতে এখানে 'ভূষণ' নির্দেশ করা হচ্ছে না। প্রাচীনকালে সংস্কৃতভাষী একজন বিশিষ্ট সাহিত্যতাত্ত্বিক (আলঙ্কারিক) আচার্য ভামহ কবিতায় অলঙ্কারের প্রয়োগমহিমা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে কান্তি থাকা সত্ত্বেও ভূষণবর্জিত রমণীমুখ সুন্দর বলে মনে হয় না। ভূষণ বলতে ভামহ বাইরের অলঙ্কারকে আর কান্তি বলতে সহজাত সৌন্দর্যকে বুঝিয়ে ছিলেন। অর্থাৎ সহজাত সৌন্দর্যের বৃদ্ধিতে অলঙ্কারের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে লোকাভরণ বলতে কবিতার শরীরের বাহ্য সৌন্দর্য বৃদ্ধির ভূষণমাত্র বোঝাচ্ছে না। বরং অন্তঃশরীরী কান্তিকেই বোঝাচ্ছে।

লোকসমাজের নানা উপাদান যখন কাব্যদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো ব্যবহৃত হয় এবং সেই সঠিক অঙ্গসংস্থানের জন্য যে কাব্যসৌন্দর্যের আভা বিচ্ছুরিত হয়— তাকেই 'লোকাভরণ' বলতে চেয়েছেন লেখক। অর্থাৎ লোকাভরণ কবিতার নির্মাণকলাকে দীপ্তিময়ী করে তোলে।

'লোকাভরণ'— এমন একটি তৎসম সন্ধিযুক্ত পদ যে বাঙালির কাছে অভূতপূর্ব তা বলা যায় না। কিন্তু শব্দটির এমন পারিভাষিক প্রয়োগ অবশ্যই অভিনব। সন্ধি বিচ্ছিন্ন লোক এবং আভরণ— দু'টি পদই আমাদের বহুব্যবহৃত কিন্তু এ জাতীয় বিশিষ্টার্থক প্রয়োগে পদটি তার ব্যবহারিক সীমাকে অতিক্রম করে যায়। 'লোক'-এর আভিধানিক অর্থ ত্রিলোক, বিশ্ব বা পৃথিবী। অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানসমষ্টিই 'লোক' শব্দটির দ্বারা উপস্থাপিত হতে পারে। আর আভরণের প্রচলিত অর্থ ভূষণ বা অলঙ্কার। কিন্তু 'লোক' বলতে লোকসংস্কৃতির তাৎপর্যে এমন সামাজিক জনসমষ্টিকে বোঝায় যা নিজস্ব-ঐতিহ্যে কমবেশি সমৃদ্ধ ও যৌথ আবেগ বা চেতনায় সংযত। অন্য দিকে 'শব্দকোষ' রচয়িতা আভরণের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানাচ্ছেন, 'সম্যকধারণ বা পোষণ' (১৯৭৮ পুনর্মুদ্রণ সংখ্যা পৃঃ ২৯৮)। অথ্যাপক চক্রবর্তী দু'টি কাজকে এমন ভিন্ন তাৎপর্যে সংযুক্ত করেছেন। সম্যক ধারণ বা পোষণ অর্থে আভরণ যখনই প্রযুক্ত হয় তখনই আর তা নিতান্ত ভূষণ হয়ে থাকে না। লোকজীবনের বিবিধ উপকরণকে কীভাবে বাংলা কবিতা তার শরীরীমায়ায় আত্মসাৎ করেছে— সেই প্রকরণটির আধার হল লোকাভরণ। শব্দার্থ বিচারের কূটতর্কে 'লোকাভরণ'-কে নতুনজাত শব্দ মনে হলেও গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জনায় 'লোকাভরণ' আর ততখানি অপরিচিত থাকে না।

সাহিত্য বিচারের আদিযুগে নাট্যতত্ত্ববিদ ভরতাচার্য নাটক লেখার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন 'লোকবৃত্তানুকরণম্' হল নাট্য রচনার অভিপ্রায়। অভিজাত সাহিত্যতত্ত্বের প্রবক্তা অবশ্যই এখানে 'লোক' বলতে ইতরজনকে বিশেষার্থে চিহ্নিত করেননি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও নিশ্চয় বলতে হয় নাটকের লোকবৃত্তের অনুকরণ পরিধি থেকে প্রাকৃতজনকে বাদও দেননি। মনে হয় সেখানে শ্রেণি নির্বিশেষে লোক বা 'জন'-এর কথা বলা হয়েছে। আবার 'লোকাপবাদ' শব্দটির সেকালের ব্যবহারের কথা স্মরণে রাখলে মনে হয়, এখানে 'লোক' বলতে বোধহয় সাধারণ জনকেই বোঝানো হয়েছে। গ্রন্থকার যে বিশিষ্টার্থে লোকাভরণ ব্যবহার করেছেন তা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্বের পুনর্মূল্যায়নে আগ্রহ তৈরি করতে পারে। কেননা আধুনিকতা উত্তর সাহিত্যব্যাখ্যায় নিম্নবর্গীয় দৃষ্টি-তল থেকে প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্বের পুনরালোচনাকে উস্কানি দেয় লেখককৃত লোকাভরণের প্রয়োগতাৎপর্য।

গ্রন্থকার তাঁর সমস্ত আলোচনাকে দু'টি পর্বে সাজিয়েছেন। প্রথম পর্বের শিরোনামে 'লোকাভরণ: স্বরূপ ও বৈচিত্র্য'। এই পর্বে তিনটি পরিচ্ছেদে অধ্যাপক চক্রবর্তী 'লোকাভরণ' তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন। 'লোকাভরণ: শৈলী ও প্রয়োগ', 'লোকাভরণ: প্রকার ও বৈচিত্র্য' এবং 'লোকাভরণ: প্রকরণ ও নির্মাণ' নামাঙ্কিত পরিচ্ছেদে তিনটিতে লেখক দেখিয়েছেন কীভাবে লোকাভরণ একটি সার্থক কাব্যশৈলী হয়ে ওঠে।

প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে লোক-উপাদানের ব্যবহারে সৃষ্ট লোকাভরণ কবিতার অঙ্গ ভূষণমাত্র নয়, এই উপাদান কাব্যশরীরে মিশে গিয়ে লোকাভরণ শৈলী প্রস্তুত করে। কবিতার শরীরে নিহিত উপাদানে পরিণত না হলে তো শৈলী বা কাব্যরীতি হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। কাব্যশৈলী বা স্টাইলের এই তাৎপর্য প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমালোচকেরা বহুকাল আগেই সমর্থন করেছিলেন। "কাব্যলংকারসূত্রবৃত্তি"-র প্রথম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠসূত্রে কাব্যাঙ্গসন্ধানী আচার্য বামন জানিয়েছিলেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য।' বিশিষ্ট পদ রচনাই হল রীতি— যা কাব্যশরীরের অভ্যন্তরে আত্মার গুণকে বহন করে। লোকজীবনের উপাদানগুলি আত্তীকরণের মধ্যে বাংলা কবিতা একই পদ্ধতিতে লোকাভরণ শৈলী নির্মাণ করে। তবে এখানে লেখক মনে করিয়ে দিয়েছেন সব কবিই লোকাভরণ শৈলীর প্রয়োগে বাধ্য থাকেন না। এ একান্তভাবেই কবির অভিরুচি নির্ভর। এই আলোচনায় লেখক দেখিয়েছেন একই ছড়া, প্রবাদ বা অন্যান্য লোক-উপাদান কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনায় পৃথক অনুষঙ্গে বিচিত্র লোকাভরণ রচনা করে।

লোকউপাদান কীভাবে লোকাভরণের বৈচিত্র সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে প্রথম পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। প্রাচীনকালে যেমন 'আলঙ্কারিকেরা রীতির নানা প্রকারভেদ দেখিয়েছিলেন আর যার মূলে ছিল পদের বিশিষ্ট প্রয়োগ, এখানেও লেখক লোকাভরণের দু'টি প্রকারভেদকে নানা শাখায় বিন্যস্ত করে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন। লোকাভরণের সেই প্রধান দু'টি শ্রেণি হল— অনন্বয়ী লোকাভরণ এবং অন্বয়ী লোকাভরণ।

কবিতায় ব্যবহৃত লোক-উপাদান বাক্য ও পদের বিন্যাসে নতুনতর রূপ পায়। সেই নির্মাণপদ্ধতিটি তুলে ধরা হয়েছে প্রথম পর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। এ ক্ষেত্রে কেবল যে প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, ধাঁধা— যেগুলি কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, শুধু সেই লোক উপাদানগুলির প্রয়োগের মধ্যে লেখক সীমায়িত থেকেছেন, তা নয়, দেখিয়েছেন লোকউৎসব বা লোকসংগীতও কীভাবে আধুনিক বাংলা কবিতার লোকাভরণ শৈলী হয়ে উঠেছে।

গ্রন্থের প্রথম পর্বটি যদিও লোকাভরণের তাত্ত্বিক উপস্থাপনা, তবে দ্বিতীয় পর্বটি লোকাভরণের প্রায়োগিক পরীক্ষাগার, রবীন্দ্রকবিতা এবং রবীন্দ্রোত্তর নজরুল, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতাসম্ভার হল সেই বীক্ষণাগার। তেরোটি পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় পর্বটি আধারিত। যদিও কবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটু আক্ষেপের অবকাশ রেখে দিয়েছেন গ্রন্থকার। এই পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদ 'লোকাভরণ: রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রোত্তর কবিতার শৈলী'। এ পরিচ্ছেদে রবীন্দ্র-উত্তরসূরি হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সামান্য আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'লোকাভরণ: জীবনানন্দ, নজরুল ও তিরিশের কবিতা।' এখানেও প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে অন্যদের মতো আলোচনার অবকাশ রাখে না কি? বিশেষত বুদ্ধদেবের কবিতায় কঙ্কাবতী, দ্রৌপদীর শাড়ি কিংবা জোনাকির মতো লোককথা, লোকপুরাণের উপাদান কীভাবে লোকাভরণ শৈলী সঞ্জাত হয়ে ওঠে তা জানার কৌতূহল থেকে যায়।

লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিবিধ উপাদান আলোচিত কবিদের লেখায় কত বিচিত্র প্রকরণে চর্চিত হয়েছে তার বিশ্লেষণে অধ্যাপক চক্রবর্তী অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে লোকপ্রবাদ, ছড়া বা লোকসংস্কৃতির উপাদান লোকাভরণ হিসাবে কবিতায় মূল অর্থ থেকে কত ভিন্ন তাৎপর্যে প্রযুক্ত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লোক উপাদানের শিল্পগত রূপান্তরেই লোকাভরণ সৃষ্টি হয়। পর্যাপ্ত উদাহরণের ব্যবহারে লেখক বারবার আন্ডারলাইন করেছেন একটি বিশেষ বক্তব্যে— যে একটি কবিতার লোকাভরণ শৈলীর অনুসন্ধান মানে কবিতাটিতে ব্যবহৃত লোক-উপাদানগুলিকে কেবল ছেঁকে তুলে নেওয়া নয়। লোক উপাদান কবিতায় কখনও অনুক্তভাবে, কখনও অন্বয়ী রীতিতে প্রযুক্ত হয়ে কীভাবে কবিতার বাচ্যার্থের শোভাবর্ধক হয়ে উঠেছে তারই পরিচিতি হল লোকাভরণ শৈলী। শৈলীর উদ্দেশ্য হল কাব্যের শোভাবর্ধন করা। তাই শৈলীমাত্রেই কাব্যের গুণ। সুতরাং কবিতায় সেই গুণবাচক কেন্দ্রটির সন্ধান করাই লোকাভরণ রীতির উদ্দেশ্য।

'রূপসী বাংলা'-র কবিতাগুলির লোকাভরণ বিশ্লেষণে গ্রন্থকার আর একটি পরিভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করান— 'লোকাভরিতা কবিতা।' যখন একটি কবিতার শরীরে নানা ধরনের লোকাভরণের একাধিক প্রয়োগ থাকে, তখন পৃথক পৃথক উপাদানের কাব্যময়তার শিল্পিত আভা কবিতাটিকে 'লোকাভরিত' করে তোলে। প্রসঙ্গত বহু উদাহরণ দিয়েছেন। তবে যখন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সাঁকো'কে তুলে ধরেন তখন মনে পড়ে যায় সেই আদি উৎসের কথা— যা লোকাভরিত রচনার ভাণ্ডার বলা যায়। যেখানে রয়েছে, 'ভবনই গহন গন্তীর বেঁগে বাহি/দু'অন্তে চিখিল মাঝে ন থাহি।'

প্রসঙ্গত বাংলাভাষায় সাহিত্য বিচারের আর একটি অপূর্ণতার দিকে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি— প্রাচীন আর মধ্যযুগের বাংলা কবিতার প্রকৃত অর্থে কখনও রীতিবাদী বিশ্লেষণ হয়নি। সেই সব ফেলে আসা সাহিত্যধারায় লোকভাষা, লৌকিক উপাদান কতখানি প্রয়োগ করা হয়েছে— তা অনেক সময়ে গবেষকদের অনুসন্ধেয় হয়েছে কিন্তু কীভাবে সেই সব উপাদান মধ্যযুগের কাব্য কবিতার শরীরে অন্বিত হয়েছে— লোকাভরণ শৈলীর সেই ব্যাখ্যার জায়গাটি শূন্য রয়ে গেছে। অথচ বাংলা সাহিত্যসমালোচনার ধারাবাহিকতায় এ অভাব পূর্ণ হওয়া সত্বর প্রয়োজন।

উত্তর ঔপনিবেশিক সাহিত্যচেতনায় আমরা বহু ঘেরাটোপের বাইরে পা রাখতে শিখেছি। চোখের ঠুলি খুলে গিয়ে এখন নতুন স্বাদে চারপাশকে দেখতে শুরু করেছি। যে দরজা খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল— এবার কি তা খোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে লোকাভরণ শৈলীর প্রয়োগের মতো একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে? এভাবেই নতুন সহস্রাব্দের আলোয় সাহিত্য ব্যাখ্যার হাজার বছরের জীর্ণ কুঠরিকে নতুন চেহারায় উদ্ভাসিত দেখতে পারি। অধ্যাপক চক্রবর্তীর গ্রন্থটি কেবল আধুনিক কবিতার শৈলী বিচারে একটি দেশজ মৌলিক পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ নয়, আমাদের সাহিত্যসমালোচনার ধারাবাহিকতায় লোক ঐতিহ্যের একটি পুনরুশ্বাস প্রকল্প। গ্রন্থটি কেবল ছাত্র-গবেষকের কাছেই প্রয়োজনীয় নয়, সাধারণ কবিতানুরাগীকেও কবিতাপাঠের নতুন ভাবনাকে উস্কে দেবে। যেমন এই মুহূর্তে মনে পড়ছে ২০০২-এর 'দেশ' পত্রিকার অক্টোবরের 'শারদ কবিতা' সংকলনের দু'টি কবিতা— সুবোধ সরকারের 'একটি স্কুলের কাহিনী' (এপারে সন্ধ্যা ওপারে গজল/মাঝখানে এক স্কুল/এপারে বরফ ওপারে বৃষ্টি/মধ্যে ব্রিটিশ ভুল।) আর শতরূপা সান্যালের 'বেঘর' (মেঘের পরে মেঘ জমেছে/আঁধার করে আসে/উথাল-পাথাল গাঙুর ভেলায়/অর্ধ-আকাশ ভাসে)। নিশ্চয় শক্তি-সুনীল পরবর্তী জয় গোস্বামী পর্ব থেকে অধ্যাপক চক্রবর্তীর নতুন লোকাভরণ ব্যাখ্যা অদূর ভবিষ্যতে পাঠকের গোচরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। আলোচিত বইটি অন্তত তেমন প্রত্যাশাই জাগিয়ে দিয়েছে।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ, পরিবেশনা যথাযথ।

লোকাভরণ: আধুনিক কবিতার শৈলী— বিপ্লব চক্রবর্তী/পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯/১৫০.০০

মনুসংহিতা বর্ণবৈষম্যের বিষপাত্র

প্রণব সেন

রামায়ণ-মহাভারত, মনুস্মৃতি ও ভগবদ্‌গীতা একই আর্যসামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত হয়েছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুভ্যুত্থানকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে। আর্যরা এদেশে এসেছিল তিন শ্রেণি বা বর্ণ নিয়ে। এদের মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ্য বা পুরোহিত শ্রেণি, রাজন্য বা ক্ষত্রিয় শ্রেণি আর বৈশ্য বা ব্যবসায়ী শ্রেণি। তিন বর্ণই ছিল বহিরাগত, সুতরাং চতুর্থ শ্রেণি বা বর্ণের জন্ম হয়েছিল এদেশের মাটিতে। বহিরাগত আর্যদের অধিপত্য বিস্তারের পথে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল ভূমিপুত্র অনার্যরা। অনার্যদের বৃহৎ অংশকে পরাজিত করে আর্যরা প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হলে পরাজিত অনার্যদের সেবাদাসে পরিণত করেছিল। তাদের একমাত্র কাজ ছিল তিন বর্ণের আর্যদের সেবা করা। এই সেবাদাসেরাই শূদ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর্য-প্রভুরা সমাজে নিজেদের আধিপত্য কায়েম রাখতে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন, তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। আদি পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, দুই বাহু থেকে রাজন্য, দুই উরু থেকে বৈশ্য আর দুই পা থেকে শূদ্রের জন্ম— এমন উদ্ভট কাল্পনিক মতবাদ কি আদৌ গ্রহণযোগ্য? ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান্য বিস্তারে যারা প্রতিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের বশীভূত করার জন্যই এই মতবাদকে ধর্মের মোড়কে পরানো হয়েছিল সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে। ব্রাহ্মণদের অমান্য করলেই শূদ্র হয়ে যেতে হবে। এমন বিধান চালু করার উদ্দেশ্য ছিল একটাই— শাসনশোষণ চালিয়ে যাওয়ার অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা অর্জন করা। আধিপত্য বিস্তারের উদগ্র বাসনা আজকের মতোই সেকালের সমাজজীবনকে রক্তাক্ত করে তুলেছিল।

বৈদিক ঋষিদের চার্বাকীরা ধূর্ত ও প্রবঞ্চক বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁদের মূল্যায়নে ঋষিদের আসল রূপ প্রতিফলিত হয়েছিল, এ সম্পর্কে দ্বিধার কোনও প্রশ্ন আজ নেই। শূদ্ররা ছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, অর্থাৎ তারাই ছিল প্রধানত শ্রমিক ও কৃষক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা ছিল মূলত পরগাছা, তারাই নিজেদের প্রভুশ্রেণি বলে ঘোষণা করত। কঙ্কর সিংহ মনুসংহিতাকে উপমহাদেশের প্রাচীনতম এবং সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ধর্মশাস্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই ধর্মশাস্ত্র রচনার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, বেদের বিভিন্ন আচরণবিধির মূল বিধিসমূহকে সংক্ষিপ্ত এবং সহজ করে বিন্যস্ত করা। এতে ভারতীয় সমাজসংগঠনভুক্ত মানবসমষ্টি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কীভাবে চলবেন তার নির্দেশ যেমন আছে, তেমনই রয়েছে রাজধর্ম বা রাষ্ট্রপরিচালনার প্রয়োজনীয় বিধিবিধান।

লেখক অবশ্য আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন মনুসংহিতায় শূদ্রদের অবস্থান নিয়ে। তিনি এই ধর্মশাস্ত্রে দু'ধরনের শূদ্রের সন্ধান পেয়েছেন। প্রথম ধরনের শূদ্ররা হলেন স্বধর্মচ্যুত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য— এই তিন বর্ণের মানুষরা হলেন দ্বিজ। এঁরা যদি মনু-নির্ধারিত আচরণবিধি মেনে না চলতেন, তা হলে তাঁরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হতেন। শূদ্রত্ব প্রাপ্তরা অবশ্য নির্মম বিধিবিধানের আয়ত্তাধীন হয়ে অত্যাচারে পীড়িত হতেন না। কিন্তু চতুর্থ বর্ণের শূদ্রেরা কোনও ধর্মশাস্ত্রেই মানুষের মর্যাদা পাননি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন, এই বিশ্বাসের বাস্তবরূপ কোথাও স্বীকৃত নয়। লেখক শূদ্রধর্ম ও শূদ্রকর্ম নিয়ে আলোচনার শুরুতেই ৮৭ থেকে ৯১ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। সেখান থেকে জানা গেছে, মহাকাত্তিমান প্রভু শূদ্রদের জন্য একটি মাত্র কর্ম নির্দেশ করেছেন, তা হল তিন বর্ণের অসূয়াহীন সেবা। তারপরে মনু শূদ্রদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে যে নির্দেশ-বিধি দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায়, শূদ্রদের মানুষের মতো কোনও মর্যাদা তিনি দিতে চাননি, তাদের ইতর-প্রাণী পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করাই তাঁর দায়িত্ব ছিল। তাই মনু বলেছেন, রাজার সেবা করলেই শূদ্রের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে। কাজেই ইহলোকে শূদ্রকে দাসত্ব করে যেতেই হবে।

মনুসংহিতা সম্পর্কে আম্বেদকরের বক্তব্য লেখক উল্লেখ করে বইটিকে আরও মূল্যবান করে তুলেছেন। আম্বেদকর বলেছেন, এই গ্রন্থ (সংহিতা) ব্রাহ্মণ্যবাদের বিজয়োৎসবের স্মারক। মনু সমাজ থেকে মানবিকতাকে চিরকালের জন্য নির্বাসনে পাঠাতে চেয়েছিলেন। তার বিষবাষ্পে এখনও সমাজজীবন কলুষিত হয়ে আছে। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ এতই তীব্র যে রক্তক্ষয়ী সঙ্ঘর্ষে হাজার হাজার মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই বইটি পড়লেই বোঝা যায় এমন সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য মনুসংহিতার নির্মম প্রভাব কতখানি তীব্র।

মনুসংহিতা এবং শূদ্র— কঙ্কর সিংহ/
অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা-৯/৬০.০০

চলচ্চিত্র সমালোচনা

দশম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব : কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবি

মেঘ মুখোপাধ্যায়

গুড মর্নিং, নাইট

ইতালির সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক মর্মান্তিক সত্য ঘটনা অবলম্বনে মার্কো বেল্লোচ্চিও-র অসাধারণ ছবি 'গুড মর্নিং, নাইট' (Buongior no Notte)। ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে ইতালির এক চরমপন্থী উগ্রবাদী গুপ্ত সংগঠন 'রেড ব্রিগেড' দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান বৃদ্ধ অ্যালডো মোরোকে অপহরণ করেছিল। এই অপহরণ আর তার করুণ পরিণতি নিয়ে ২৫ বছর পরে ছবি করেছেন বেল্লোচ্চিও। নানা আদর্শে, নানা দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে আজকের পৃথিবী অগণিত উগ্রবাদী গুপ্ত সংগঠনে ছেয়ে গিয়েছে। আজ বিশ্বের এমন কোনও দেশের নাম করা যায় কিনা সন্দেহ, যেখানে কোনও চরমপন্থী গুপ্ত সংগঠন নেই। সে দেশের সরকার বা রাষ্ট্রশক্তির কাছ থেকে তাদের দাবি আদায়ের জন্য তারা হিংসার আশ্রয় নিতে বদ্ধপরিকর। তারা প্রবল, সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তিকে সন্ত্রস্ত আর নাজেহাল করে তুলতে চায়। এই উদ্দেশ্যে তারা নানা উপায় অবলম্বন করে— অবশ্যই সে সব পথ রক্তের, আগুনের। ২৫ বছরের পুরনো ইতিহাসের একটি ঘটনা আজ নতুন শতকের তথা সহস্রাব্দের শুরুতে চলচ্চিত্রের পর্দায় ফুটিয়ে তোলার মধ্যে পরিচালকের একটি গভীর উদ্দেশ্য ক্রমশ দর্শকের কাছে উন্মোচিত হতে থাকে। বিশ্বময় উগ্রপন্থার একটা দিক আমরা এই ছবিতে দেখতে পাই। চারজন তাজা তরুণ আর তাদের শিকার এক বৃদ্ধ রাজনৈতিক নেতা।

পরিচালক চলচ্চিত্রে কীভাবে ঘটনাটিকে সাজিয়েছেন? কোন চরিত্রদের এনেছেন? ঘটনার গতি কোন দিকে কীভাবে এগিয়েছে?

এক সুন্দরী তরুণী তার পুরুষবন্ধুকে নিয়ে রোমের উপকণ্ঠে একটি বাড়ি ভাড়া নেয়। একতলায়। সেই বাড়ির পরিচয় দিয়ে শুরু হয় ছবি। বাড়ির দালাল বাড়িটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। সহজ সরল জীবনের স্বাভাবিক এক দৃশ্য। এক নীড় বাঁধার সূচনা। পরে আমরা সেই বাড়িতে এই দুই তরুণ-তরুণীর সঙ্গে ওদের আরও দু'জন বন্ধুকে এসে জুটতে দেখি। আর শুরু হয় তাদের এক রহস্যময় কার্যকলাপ। বাড়িটির একটি বড় ঘরের মধ্যে ওরা আলাদা একটা গুপ্তকক্ষ বানিয়ে তোলে আর একদিন বৃদ্ধ নেতা অ্যালডো মোরোকে অপহরণ করে নিয়ে এসে ওই কক্ষে বন্দি করে রাখে। ইতালিতে ঝড় ওঠে। অপহরণের পরের পর্বে দেশের পরিস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় টেলিভিশনের পর্দায়। ঘটনাধারায় ক্রমশ প্রকাশ হতে থাকে যে এই তরুণেরা কমিউনিজমের নামে চরমপন্থার আশ্রয় নিয়ে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তুলেছে। মোরোকে তাদের আদর্শের বা তাদের আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার পথে প্রতিবন্ধক বিবেচনা করে এরকম দুঃসাহসিক উপায়ে গুম করে রেখেছে। নিজেদের অবিচল আদর্শ আর নীতির জোরে বলীয়ান এই চার যুবা মোরোর বিচার শুরু করে। তাঁর সঙ্গে তর্ক জোড়ে। মাঝে মাঝে দেখা করে তাদের বিচারের অগ্রগতি তাঁকে জানিয়ে দিতে থাকে। অবশেষে মোরোকে তারা প্রাণদণ্ড দেয়।

পথের মধ্যে মোরোর গাড়ি আটকে তাঁকে কিডন্যাপ করে তুলে নিয়ে এসে গুপ্ত কক্ষে বন্দি করে রাখা আর তারপরে তাঁর বিচার চলার দিনগুলিই আসলে এ চলচ্চিত্রের বিষয়। দমবন্ধ করা উৎকণ্ঠা জাগানো এক পরিবেশ সৃজন করেন বেল্লোচ্চিও। মোরোর দৃঢ়তা আর নিজস্ব নীতি আর্দশের প্রতি অবিচলতা গুপ্ত সংগঠনের তরুণীটির মনে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। এ ধরনের গুপ্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের ওপর তাঁর অন্ধ আনুগত্যে তবে কি চিড় ধরে? আদর্শ রূপায়ণের পদ্ধতিতে কি সংশয় জাগে? সে যেন কখন অন্যরকমভাবে ভাবতে শুরু করেছে। তার অনুভব আর চিন্তায় অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। একটি মনে রাখার মতো দৃশ্যে মেয়েটির মনের পরিবর্তন পরিচালক চিত্রায়িত করেছেন। রাতে খাবার টেবিলে মোরোকে

নিয়ে চারজন খেতে বসেছে। মেয়েটি পরিবেশন করছে। সবার অজান্তে সে খাবারে ঘুমের ওষুধের গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে ডিশগুলি প্রত্যেকের সামনে এগিয়ে দেয় কিন্তু সবার অলক্ষে মোরোকে চোখের ইশারায় খাবার খেতে মানা করে। তিনজন ক্ষুধার্ত যুবক প্রথমে খাবার মুখে তুলে অচেতন হয়ে ঘুমে ঢলে পড়লে মেয়েটি মোরোকে নিয়ে এগিয়ে যায়। একটি দরজা খুলে মোরোকে বেরিয়ে যেতে বলে। মুক্ত মোরো নির্জন রাস্তায় দ্রুত হাঁটতে শুরু করেন। মুক্তির নিঃশ্বাস নিয়ে প্রশস্ত উন্মুক্ত রাজপথে মোরোর হেঁটে চলার দৃশ্যটি অপূর্ব। পরক্ষণের দৃশ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি এটি মেয়েটির কল্পনায় আকাঙ্ক্ষাপূরণ। আসলে এমন কিছু ঘটে না।

দু'মাস এভাবে বন্দি করে রেখে বিচার চালানোর পর মোরোকে ওরা হত্যা করে। ছবিটি শেষ হয় জঙ্গি তরুণীটির কল্পনার দৃশ্য দিয়ে। পর্দা উদ্ভাসিত করে দ্রুত পদে মুক্ত মোরো হেঁটে চলেছেন।

গুড বাই, লেনিন

আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসের বিশ্বকাঁপানো এক ঘটনার প্রেক্ষাপটে জার্মানির উলফ্‌গাঙ বেকের-এর ছবি 'গুড বাই লেনিন' (২০০৩)। ১৯৮৯ পৃথিবীর ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বার্লিন প্রাচীরের পতন আর দুই জার্মানির মিলনের জন্য। ৮৯-এর হেমন্তে বার্লিন প্রাচীর ভেঙে ফেলার কিছুদিন আগে পূর্ব বার্লিনের তরুণ অ্যালেক্সের মা'র হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হল আর তিনি গভীর কোমায় ঢলে পড়লেন। তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শে নিবেদিতপ্রাণা এক শিক্ষিকা এবং পূর্ব জার্মানির সোভিয়েত অনুগত সরকারের একনিষ্ঠ সমর্থক ও কর্মী। সমাজতন্ত্র তাঁর ধ্যানজ্ঞান। হাসপাতালে অচেতন দশায় পড়ে থাকার সময় বার্লিনে বিপ্লব ঘটে গেল। বার্লিন দেওয়াল ভেঙে ফেলে দুই বার্লিন একাকার হয়ে গেল। দুই জার্মানির মিলন ঘটল। পূর্ব বার্লিন থেকে সমাজতন্ত্র বিদায় নিল অতি দ্রুত অবিশ্বাস্য গতিতে। যেন ম্যাজিকের মতো সমাজতন্ত্র মুছে গিয়ে দেশটাকে গ্রাস করে নিল ধনতন্ত্র। ধনতন্ত্রের লক্ষণগুলি ফুটে উঠে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল বার্লিনের শরীরে সত্তায়। উন্নত পশ্চিম ইউরোপের গাড়িতে— পণ্যে বার্লিনের রাস্তা আর বাজার দোকান ছেয়ে গেল। রাস্তা দাপিয়ে ছুটে যেতে লাগল কোকাকোলার বিশাল বিশাল ট্রাক। সমাজতান্ত্রিক একটা দেশ, একটা নগর যেন মুহূর্তে নস্যাৎ হয়ে গেল ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে।

এ দিকে অ্যালেক্সের মা এই আলোড়ন তোলা পরিস্থিতিতে, বদলে যাওয়া বার্লিনের বুকে মাসের পর মাস অচৈতন্য হয়ে রইলেন হাসপাতালের কক্ষে। উন্নত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে জীবন্মৃত হয়ে পড়ে আছেন সমাজতন্ত্রের সাধিকা। বিপুল পরিবর্তনের আভাষমাত্র তাঁর চেতনায় পৌঁছল না। অ্যালেক্স আর তার বোন নিয়মিত মাকে দেখতে আসে, ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আর অপেক্ষা করে। তাদের অপেক্ষা একদিন শেষ হয়। আটমাস বাদে মা হঠাৎ চোখ মেলে চান। আনন্দে দিশাহারা অ্যালেক্স ভেবে পায় না কী করবে! মায়ের চেতনা ফেরে। তিনি পুত্রকন্যাকে চিনতে পারেন। ডাক্তার বলেন যে মাকে খুব সাবধানে যত্নে রাখতে হবে। দেখতে হবে যাতে না তিনি কোনও 'শক' পান। কোনও মানসিক আঘাত পেলেই তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে। আর তাঁকে বাঁচানো যাবে না। এ কথায় অ্যালেক্স বিহ্বল হয়ে পড়ে। চারপাশের বদলে যাওয়া পূর্ব বার্লিনের দিকে তাকিয়ে সে শিউরে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানির পতন ঘটেছে আর বিপুল তেজে পশ্চিম জার্মানির ধনতান্ত্রিক জীবনধারা প্রাক্তন পূর্ব জার্মানিকে গ্রাস করে নিয়েছে— এই ঘটনাটা জানাই তো হবে তার সমাজতন্ত্রে অনুগতপ্রাণা মায়ের কাছে মস্ত আঘাত। এই পরিবর্তন তার মায়ের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠবে। এইসব ভেবে অ্যালেক্স পাগলপ্রায় কিন্তু এই মর্মান্তিক আঘাত থেকে তার মাকে রক্ষা করার জন্য সে এক অবিশ্বাস্য বুদ্ধি বার করে ফেলে। মাকে সে বাঁচাবেই। আটমাস বাদে যখন তিনি কোমা থেকে জেগে উঠেছেন তখন তাঁকে আর শক পেয়ে চিরকালের জন্য হারাতে পারবে না অ্যালেক্স। তার জন্য সে তিল তিল করে গড়ে তোলে এক নতুন পৃথিবী— কথাটা বোধহয় ঠিক হল না— মায়ের জন্য পরম মমতায় সে এক হারিয়ে যাওয়া সমাজতান্ত্রিক জার্মানি পুনঃসৃজন করে তোলে তাদের ফ্ল্যাটের মধ্যে।

চারদিকে মানুষ এখন নতুন জার্মানির কথা বলছে। পূর্ব বার্লিনের মানুষদের পোশাকআশাক খাবারদাবার চালচলন সমস্ত গেছে বদলে— পশ্চিমের ছোঁয়া সর্বত্র। হাসপাতালও এই বদল থেকে রক্ষা পায়নি। কোনওরকমে যদি তার মায়ের কানে এ খবর চলে আসে কিংবা তেমন কিছু সন্দেহজনক চোখে পড়ে যায় তাই সে ডাক্তারের অমতের পরোয়া না করে নিজের দায়িত্বে মাকে নিয়ে চলে আসে তাদের অ্যাপার্টমেন্টে। মাকে ফিরিয়ে আনার আগেই বহু পরিশ্রমে সে মায়ের ঘরখানার হাল ফিরিয়ে দিয়েছে। তাদের ফ্ল্যাটের আসবাবপত্র, ব্যবহার্য জিনিস, দৈনন্দিন প্রয়োজনের বাসনকোশন খাবারদাবার সমস্ত কিছুই এ আট মাসে বদলে পশ্চিমী হয়ে উঠেছিল। সে আবার সব 'পূর্বে'র মতো করে তোলে যেমনটি তার মা অসুস্থ

অচৈতন্য হবার আগে দেখে গিয়েছিলেন। তার দিদি তার এই পাগলামো বুঝে উঠতে পারে না কিন্তু বাধা দিতেও পারে না, নিমরাজি হয়ে সায় দেয়। অ্যালেক্সের আসল ভরসা এই যে তার মাকে শয্যাশায়ী থাকতে হবে। বিছানা ছেড়ে ওঠার বল তাঁর নেই। তাই অ্যালেক্স একটা নকল জগৎ তৈরি করে রাখতে মরিয়া চেষ্টা চালায় তার শয্যাশায়ী মায়ের চোখে যেটা সত্যি বলে প্রতিভাত। অ্যালেক্সের এই চেষ্টার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন পরিচালক। মায়ের প্রতি অসীম ভালবাসায় অ্যালেক্স কী না করতে পারে! মাকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, মাকে সে হঠাৎ আঘাত পেয়ে মরে যেতে দেবে না। এক সদ্যযুবক এ জন্য দানবিক প্রয়াস করে চলে। মায়ের মুখ চেয়ে সে এক আস্তাকুড়ে ফেলা দেওয়া অতীতকে টেনে তোলে। সমাজতান্ত্রিক জার্মানিতে তৈরি হওয়া নানা খাদ্যদ্রব্যের, মশলার, আচারের প্যাকেট সে জোগাড় করে এনে রান্নাঘর সাজায় আর সেই খালি প্যাকেটগুলোতে রাখে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার খাদ্যবস্তু, মশলা, আচার ইত্যাদি। পশ্চিমী পোশাকআশাক বর্জন করে 'পূর্বে'র পোশাকআশাক পরতে শুরু করে, দিদিকে পরায় আর মায়ের ঘরে কাউকে আসতে হলে তাকে আগেকার পোশাক পরিয়ে আর শিখিয়ে পড়িয়ে আনে। তার সবসময় আতঙ্ক কোনও মতে না মায়ের কাছে দেশটা পশ্চিম হয়ে যাওয়ার কথা ফাঁস হয়ে যায়— আর তা হলেই তার মা শোক সইতে পারবে না। সমাজতন্ত্রের পরাভব মেনে নিতে না পেরে তার মা মরে না যায়! সময়ের স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটতে গিয়ে সে পদে পদে নাজেহাল হয়ে পড়ে। হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে মায়ের কাছে, মায়ের কক্ষে বর্তমান বলে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে যে কীরকম বেকায়দায় পড়তে হয়, নাস্তানাবুদ হয়ে যেতে হয় পরিচালক তার কিছু রোমহর্ষক ঘটনা দিয়ে এ ছবিটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

পরিচালকের মুনশিয়ানায় আর ঘটনাবিন্যাসের কৌশলে ছবিটি উত্তরোত্তর উপভোগ্য হয়ে উঠতে থাকে। দর্শকের কৌতূহল চড়তে থাকে। অ্যালেক্স কি শেষ পর্যন্ত পারবে এই নকল দুর্গ রক্ষা করতে? জীবন কি শেষ পর্যন্ত এই কোমলমতি তরুণের অবিশ্বাস্য প্রয়াস বরদাস্ত করবে? কখনও হাসতে হাসতে খুন হতে হয় আবার কখনও অজান্তে বুকে চাপ লাগে, চোখ ফেটে জল আসতে চায়। এক তরুণ পুত্র তো এই পাগলামো করে চলেছে তার মুমূর্ষু মাকে বাঁচিয়ে রাখার, কাছে পাবার তাগিদে যে-মাকে সে আট মাস যাবৎ হারিয়ে ফেলে আবার হঠাৎ ফিরে পেয়েছে— তার যে প্রবীণা মা সমাজতন্ত্রকে মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করেন, সমাজতন্ত্রের আদর্শ ছাড়া যে-মা পৃথিবীকে ভাবতে পারেন না, সোভিয়েত রাশিয়া আর লেনিন যে-মায়ের কাছে অতি আদরের দু'টো শব্দ, যে-মা মনে করেন সমাজতন্ত্র মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে, যিনি মনে করেন মুক্তিকামী মানুষকে, উৎপীড়িত অত্যাচারিত মানুষকে লেনিনের কথা ভুলে যাওয়া চলবে না। প্রবীণা এক মায়ের কাছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের, জীবনবোধের এই মর্যাদাকে মূল্য দিতে চেয়েছে তাঁর তরুণ পুত্র। সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণাকে সে হেয় করতে চায়নি। সোভিয়েত রাশিয়া ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার পর, বার্লিনের দেওয়াল খানখান হওয়ার পর এ কি তার চরম মূর্খতা, পশ্চাদ্গামিতা? কৌতুকের ছলে ছবিটি রচনা করলেও উলফ্‌গাঙ বেকের কিন্তু কয়েকটি কঠিন প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছেন। তরুণ অ্যালেক্সের কাণ্ডকারখানা দেখে মজা করার সুযোগ রয়েছে নিশ্চয় কিন্তু সমাজতন্ত্রের আদর্শকে মজা ডোবা বলে নস্যাৎ করা সহজ কি?

অ্যালেক্সের তৈরি নকল পূর্ব বার্লিন একদিন হঠাৎ কী করে মায়ের চোখের সামনে এসে গেল দেখাবার জন্য বেকের অবিস্মরণীয় দু'টি দৃশ্য রচনা করেছেন। দৃশ্য দু'টির অভিঘাত হয়েছে রোমাঞ্চকর। একদিন মায়ের ঘরে শায়িতা মায়ের বিছানার সামনের জানালার শারশিতে উলটো দিকের বহুতল অট্টালিকাতে ঝোলানো কোকাকোলার একটা বিশাল লাল ফেস্টুনের প্রতিবিম্ব এসে পড়ে। সকলের চোখ এড়িয়ে গেলেও হঠাৎ তা মায়ের লক্ষগোচর হয় আর তিনি আঁতকে ওঠেন। পূর্ব বার্লিনে কোকাকোলার এমন উদ্ধত বিজ্ঞাপন এল কোথা থেকে? জবাবদিহি করতে অ্যালেক্সের ঘাম ছুটে যায়। আর একদিন সকালবেলায় সবাই তখন ঘুমিয়ে আছে— অ্যালেক্সও মায়ের ঘরে অদূরে সোফায় ঘুমিয়ে রয়েছে। তাঁর মেয়ের ছেলেটি খেলতে খেলতে সেখানে চলে এসেছে আর বেকায়দায় পড়ে গিয়ে কাঁদছে। বাচ্চাটিকে তুলতে মা হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। তিনি বহু দিন বাদে রোগীর শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। শিশুটিকে পরম মমতায় মেঝে থেকে তুললেন। চারপাশটাকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, তারপর দেখার আগ্রহে তিনি পায়ে পায়ে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর ফ্ল্যাটের বাইরে। তারপর বহুতলের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। নামতে নামতে একেবারে পথে। মহানগরের রাস্তা দিয়ে চারপাশে বিস্ময়ে চাইতে চাইতে এগোচ্ছেন। নতুন বার্লিন আর তার নতুন মানুষ তাঁর সামনে। হঠাৎ হেলিকপ্টারের আওয়াজে ঘাড় বাঁকিয়ে আকাশে চোখ তুলে দেখেন যে সেই হেলিকপ্টারটা লেনিনের মস্ত এক ধাতুভাস্কর্য ঝুলিয়ে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে— আকাশ

মথিত করে কমরেড লেনিন বার্লিন থেকে বিদায় নিচ্ছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। মূর্ছা যাবার মুহূর্তে অ্যালেক্স দৌড়ে এসে তাঁকে কোলে তুলে নিল। ঘুম ভেঙে মাকে না দেখে বিমূঢ় অ্যালেক্স খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছিল। কেন বার্লিন থেকে লেনিন মূর্তি তুলে নিয়ে যাওয়া হল, বার্লিনের লোকেদের পোশাকআশাকই বা কেন বদলে গেছে— দেওয়ালে দেওয়ালে কেন পশ্চিমী পণ্য আর আমেরিকার কোকাকোলার বিজ্ঞাপনের দাপাদাপি— হতবুদ্ধি মায়ের এ সব কৌতূহল নিরসনের জন্য অ্যালেক্স গল্পের পর গল্প বানিয়ে চলে। এক মিথ্যে ঢাকতে আর এক মিথ্যে রচনা করতে হয় তাকে। সে যেন আর পেরে উঠছে না। চারপাশে গর্জমান বাস্তবের সমুদ্র তার মায়ের জীবনের জন্য গড়ে তোলা তার ছোট্ট দ্বীপটাকে চুরমার করে ভাসিয়ে ডুবিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। সে অসহায় হয়ে পড়তে থাকে।

ঘটনাক্রমে আসে তাদের 'পশ্চিম বার্লিন প্রবাসী' বাবার কথা। শেষ মুহূর্তে এ ছবির আর এক আকর্ষণীয় উন্মোচন। তিনি পূর্ব বার্লিন থেকে পালিয়ে পশ্চিম বার্লিনে আশ্রয় নিয়েছিলেন আর তাঁর স্ত্রীকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন সন্তানদের নিয়ে সেখানে চলে আসতে। কিন্তু তাঁর সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত স্ত্রী কিছুতেই সমাজতান্ত্রিক পূর্ব জার্মানি ছেড়ে যেতে রাজি হননি। অগত্যা তাঁর স্বামী পশ্চিম বার্লিনে নতুন সংসার পাততে বাধ্য হন। মা কিন্তু তাঁর সন্তানদের কাছে তাদের বাবার দেশত্যাগের প্রকৃত কারণ গোপন রেখে তাঁকে একটা দোষী চরিত্র রূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সানুনয় অনুরোধ, নিয়মিত চিঠি দেওয়ার কথা সন্তানদের কাছে মা গোপন রেখেছিলেন। আজ তিনি ছেলেমেয়েদের কাছে সত্য প্রকাশ করে আবদার করলেন স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে। নিজের কট্টর আদর্শের পরিণামে স্বামীকে হারিয়ে তিনি যে এক নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন, দুই সন্তানকে নিয়ে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ যে বাধা পেয়েছে এবং তা মোটেও সুখের হয়নি— আজ এই গোপন ক্ষোভ প্রকাশ হয়ে পড়ে। নিজেকে তিনি এক স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন থেকে বঞ্চিত করেছেন। সন্তানদেরও পিতার সান্নিধ্য সাহচর্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন নিজের জিদ বজায় রাখতে। সমাজতন্ত্রই কি তবে তাঁর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশে এতকাল প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল? সমাজতন্ত্রের আদর্শনিষ্ঠা কি তাঁকে শেষপর্যন্ত গোঁড়া আর একবগ্‌গা করে তুলেছিল? সমাজতন্ত্র কি এ রকম জীবনের কথা বলে? জীবনকে কৃত্রিম করে তোলে? লেনিন কি এই সমাজতন্ত্রের কথা বলেছিলেন? এমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন?

দ্য রিটার্ন (Vozvraschenic/২০০৩/রাশিয়া)

শিল্পনৈপুণ্যে সমৃদ্ধ কোনও চলচ্চিত্রের মধ্যে গল্পের নিজস্ব আকর্ষণ ছাড়িয়ে এমন কতকগুলো ব্যঞ্জনা থাকে— এমন কিছু অবিস্মরণীয় দৃশ্য, দৃশ্যকে দেখাবার অভিনব দৃষ্টিকোণ, ধ্বনি, সঙ্গীত, আর অবশ্যই নৈঃশব্দ্য— যা বর্ণনার অতীত। গভীর জীবনবোধ আর শিল্পজ্ঞানসম্পন্ন পরিচালকেরা চলচ্চিত্রের কলাকৌশল আর কারিগরি দক্ষতা অবলম্বন করে এমন দৃশ্যের জন্ম দিতে পারেন, দৃশ্যের পর দৃশ্যের পরম্পরায় এমন এক সম্পূর্ণতা গড়ে তুলতে পারেন যা দেখে প্রবলভাবে আলোড়িত হতে হয়, অভিভূত হতে হয়— আন্দ্রেই ভায়াগিনৎসেভ-এর 'দ্য রিটার্ন' এ রকম এক মনে রাখার মতো ছবি।

কিন্তু একজন দর্শকের পক্ষে তার এই বিস্ময়, মুগ্ধতা অন্যকে বর্ণনা করে বলা মোটেও সহজ হয় না। একরকম অসম্ভবই হয়ে ওঠে। এ জন্যই বোধ হয় চলচ্চিত্রের কোনও কোনও জায়গাকে বা অনেক সময় পুরো ছবিটিকেই বলতে হয় কবিতার মতো, সঙ্গীতের মতো। কবিতা আর সঙ্গীতকে আমরা এমন একটা জায়গা দিয়েছি যেখানে বুঝিয়ে বলা বা বিবরণ দেওয়ার সামর্থকে অতিক্রম করে যায়। দৃশ্যের সৌন্দর্য, ব্যঞ্জনা, বিস্ময় প্রকাশ করে বলার ভাষায় কুলোয় না। চলচ্চিত্রের পেশাদার সমালোচক আর তাত্ত্বিকেরা ভাষা দিয়ে এই অনির্বচনীয়কে বোঝানোর, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। এক বা একাধিক 'তাৎপর্য' অন্বেষণ করেন। একটি উৎকৃষ্ট ছবি সৃষ্টি হবার পর দর্শকদের তরফ থেকে তাকে বিশুদ্ধ উপভোগ করা ছাড়াও বোঝার একটা দায় থাকে বই কি— এটা অস্বীকার করলে ভাল ছবি তৈরির বিশাল কর্মযজ্ঞকেই, পরিচালকের ছবি নির্মাণের অভিপ্রায়কেই বাতিল করে দেওয়া হয়। ছবিটা দেখে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে ভুলে গেলাম, স্মৃতিতে কোনও দাগ কাটল না, চেতনাকে নাড়িয়ে দিল না, খোঁচা দিল না, বিব্রত করল না, বা নিছক শিল্প উপভোগের দিক থেকেও মুগ্ধ করল না— এ জন্য নিশ্চয় কোনও পরিচালক ছবি তৈরি করতে আসেন না। তাঁর নিশ্চয় কিছু বলার থাকে। সেই বলাটা আমাদের বুঝতে হয়— অন্তত চেষ্টা করতে হয়। তাঁর দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। চলচ্চিত্র এভাবেই শিল্প হয়ে উঠেছে আর জগৎ জুড়ে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে, করে চলেছে।

ছবিতে একটা গল্প থাকে। কারও কারও ছবিতে গল্পটা তুচ্ছ হয়ে বড় হয়ে ওঠে একটা প্রশ্ন বা আরগুমেন্ট। ব্যক্তিমানুষ, পরিবার, সমাজ বা সমকালের কোনও সঙ্কট।

পথের পাঁচালি, চারুলতা, অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, ওকা

উরি কথা, খণ্ডহর, গৃহযুদ্ধ কিংবা ৩৬ চৌরঙ্গি লেন-এর মোদ্দা গল্পটা কয়েক লাইনে বলে দেওয়া যায়। মোদ্দা গল্পটা নিশ্চয় আকর্ষণীয়। কিন্তু ওই নামের ছবি মানে ওই গল্পটা নয়। ফিল্মটা ছড়িয়ে আছে প্রত্যেক মুহূর্তে আর চলচ্চিত্র মাধ্যমের নিজস্ব শক্তিতে, শৈলীতে। ওই বিশেষ ফিল্মটি ওই গল্পটাকে কেমনভাবে ক্যামেরা দিয়ে দেখিয়েছে সেটাই আমাদের পাওনা। গল্পটা জেনে নেওয়ার চেয়ে এ অনেক বড় অভিজ্ঞতা। কোনও উঁচু মাপের চলচ্চিত্রের 'গল্পটা' বলে দিয়ে বা পরিচালকের 'বক্তব্য কী' জানিয়ে দিয়েও চলচ্চিত্রটার কিছুই বোঝানো যায় না। শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্রটি কত উঁচু দরের তার ধারণা দেওয়া যায় না যতক্ষণ না একজন ছবিটা দেখছেন। রাশিয়ার ছবি 'দ্য রিটার্ন', সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বারবার এ কথা মনে হচ্ছে। ছবিটি এমন 'ইমেজ'-সমৃদ্ধ, চিত্ররূপময়, ইমেজ-ই এমন প্রধান এবং দর্শকমনের ওপর প্রভাববিস্তারী যে ছবিটির বর্ণনা দিতে যাওয়া একরকম বিড়ম্বনা। তা হলে যেন পুরো চিত্রনাট্যটা লিখে ফেলার একটা লোভ পেয়ে বসে। শট বাই শট বলে গেলে যদি কিছুটা আঁচ দেওয়া যায় যে ফিল্মটা কীরকম।

মাত্র তিনটি চরিত্র আর একটা যাত্রা নিয়ে পৌনে দু'ঘণ্টার এই ছবি। আন্দ্রেই আর ইভান নামের দুই কিশোর ভাইয়ের জীবনের সাত দিনের ঘটনা। ছোট ইভান ভিতু। বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে এসে ও সুইমিং পুলের টাওয়ার থেকে সমুদ্রে লাফ দিতে পারে না। উঁচু জায়গায় ওর মাথা ঘোরে। বন্ধুরা ওকে রাগায়। উত্তেজিত করে তুলতে চায়। তবুও পারে না লাফিয়ে পড়তে। কাঁপে। কাঁদে। বন্ধুরা ওকে ফেলে চলে গেলে সন্ধ্যা ঘনানো নির্জন চরাচরে টাওয়ারের ওপর থেকে ভয়ার্ত শিশুটিকে মা এসে উদ্ধার করে। ইভান প্রাণ ফিরে পায়। এক পরম মানবিক দৃশ্য দিয়ে এ ছবির সূচনা দর্শককে আলোড়িত করে। ১২ বছর পরে হঠাৎ ওদের বাবা ফিরে এল। জ্ঞান হওয়া থেকে ওরা বাবাকে দেখেনি। একদিন দৌড়তে দৌড়তে বাড়িতে পৌঁছে ওরা হঠাৎ মায়ের কাছে শুনল যে ওদের বাবা এসেছে। সঙ্গে একটা গাড়ি। বাবা মানে একটা রুখুসুখু কঠিন চেহারার চোয়াড়ে প্রকৃতির মাঝবয়সী যুবক। সন্তানদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, কেমন আচরণ করে তাদের আপন করে নিতে হয় লোকটার অজানা। সবসময় যেন রেগে রয়েছে। মুখে হাসি নেই। গলায় আন্তরিকতা নেই। শিশু কিশোরদের সঙ্গে কথা বলার ধরনটাই তার জানা নেই। যেন ভিন গ্রহ থেকে দু'ভাইয়ের জীবনে আচমকা খসে পড়েছে একটা দুষ্ট এলিয়েন। ছোট ইভান এই লোকটাকে বাবা বলে একেবারে মেনে নিতে পারে না। বাবা বলে ডাকতে চায় না। আর বাবা ব্যক্তিটি তার পিতৃত্ব জাহির করতে, ইভানের মুখ থেকে 'বাবা' সম্বোধন শুনতে চাইলে ইভান বিরক্ত হয়, নিজেকে আরও গুটিয়ে নেয়। আর কখনও কখনও স্পষ্টতই তার মনোভাব প্রকাশ করে দেয়। সে জানে যে 'বাবা'রা এ রকম হয় না। আন্দ্রেই যে সে-কথা জানে না তা নয়, আগন্তুকের আচরণে সেও আহত, অসন্তুষ্ট কিন্তু সে তার মনোভাব গোপন করে মায়ের কথায়। ঝামেলা না বাড়াতে চেয়ে কিংবা সন্তানের প্রবৃত্তিবশত অচেনা লোকটাকে বাবা বলে মেনে নেয় আর 'বাবা' বলে সম্বোধন করতে থাকে। দাদার আদিখ্যেতা দেখে ভাইয়ের জ্বলুনি লেগে যায়। দাদাকে সে 'বাবা' 'বাবা' করে রাগী, বদখত লোকটার প্রতি আদিখ্যেতা দেখাতে মানা করে।

বাবা দু'ছেলেকে নিয়ে তার গাড়িতে করে বেড়াতে বেরোয়। ছেলেরা ফুর্তিতে চনমনে। আশ্চর্য এক যাত্রা— অদ্ভুত এক ভ্রমণ। আচারআচরণে বাবা আরও রহস্যময় আর অকরুণ হয়ে ওঠে। ইভানের সঙ্গে তার যেন এক স্নায়ুযুদ্ধ বেধে গেছে। ইভান তাকে বাবা বলে মানবে না, পদে পদে অবাধ্য হবে আর লোকটা চাইবে তাকে মানিয়ে ছাড়তে। ইভানের অবাধ্যতা আর নিজের মতে চলার প্রবণতার জন্য বাবা তাকে নির্মমভাবে শাসায়, শাস্তি দেয়। প্রকাণ্ড এবং জনহীন প্রান্তরের মধ্যে ইভানকে আচমকা গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে বাবা গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে যায়, ইভানের দোষ হল যে সে আরও কিছুক্ষণ মাছ ধরতে চেয়েছিল, মাছ ধরতে তার ভাল লাগে আর বাবা মনে করেছিল যে খুব হয়েছে, আর মাছ ধরার দকার নেই। ইভান গাড়িতে উঠতে চায়নি। আরও খানিকক্ষণ জলের ধারে ছিপ হাতে বসে থাকতে চেয়েছিল। বিশাল প্রান্তর চিরে দিগন্ত থেকে দিগন্তে হাইওয়ে ছুটে গেছে। একটা কালভার্টের ওপর নিঃসীম আকাশের তলায় খুদে এক বালক। বাবা ওকে জব্দ করতে ফেলে রেখে গেছে। কী করবে ও খুঁজে পায় না। দূরের দিকে উদ্দেশ্যহীন তাকিয়ে থাকে। কালভার্টের কার্নিশে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। হঠাৎ অঝোরে বৃষ্টি নামে। মাথা বাঁচাবার কোনও আশ্রয় নেই। ইভান বসে বসে ভিজে যায়। হঠাৎ গাড়িটা ফিরে আসে। কাকভেজা ইভানকে বাবা গাড়িতে তুলে নেয়। স্টার্ট দিতে গিয়ে গাড়িটার পিছনের একটা চাকা কাদায় আটকে যায়। বৃষ্টির মধ্যে তিনজনে চাকাটাকে কসরত করে তোলে। এক হিসাবে দৃশ্য পদবাচ্য নয় এমন সব সাদামাটা অথচ অসাধারণ অনেক দৃশ্য একের পর এক আসতে থাকে আর আমরা তিনজনের জীবনে ঢুকে যেতে থাকি। শেষ পর্যন্ত বাবা ওদের এক সমুদ্রতীরে এনে গাড়ি থামায়। গাড়িটা রেখে ওরা একটা পড়ে থাকা জীর্ণ নৌকো সারায়, মোটর বসায়, তারপর যাত্রা করে এক নির্জন দ্বীপে এসে ওঠে। এই দ্বীপে রয়েছে একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন লাইটহাউস আর তার পাশে

একটা ছোট বাড়ি। বোধ হয় লাইট হাউসের কর্মচারীর কোয়ার্টার ছিল ছোট এই বাড়িটা। বাবা ছেলেদের দ্বীপটা ঘুরিয়ে দেখায়, লাইট হাউসের টাওয়ারে চড়ে। আন্দ্রেই টাওয়ারে চড়ে দুরবীন দিয়ে চতুর্দিকে দেখে খুশি হয়। ইভান পারে না। ওপরে উঠলে ওর মাথা ঘুরোয়, নিচে তাকাতে পারে না— তাই সে তলায় দাঁড়িয়ে থাকে।

আমরা একসময় বাবার এই দ্বীপে আসার কারণ আবিষ্কার করি। ছেলেদের খেলতে দিয়ে সে শাবল-কোদাল নিয়ে বেরিয়ে চলে আসে ওই ছোট ঘরটায়। সেখানের মাটি খুঁড়ে একটা লোহার শক্তপোক্ত বাক্স টেনে তোলে। তার ডালা খুলে বের করে একটি মজবুত ছোট বাক্স। বোঝা যায় এর মধ্যে মূল্যবান বস্তু রয়েছে। এই গুপ্তধন ব্যাগে ঢুকিয়ে সে এনে রাখে নৌকোর পাটাতনের তলায় গোপনে। মোটরটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সেটা সারার ফাঁকে ছেলেদের দাঁড়াবয়ে শান্ত সমুদ্রে খানিক দূর ঘুরে আসার অনুমতি দেয় নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসার মেয়াদে। এমনকী যাতে ওরা সময়ের কথা ভুলে না যায় সে জন্য নিজের ঘড়িটা খুলে আন্দ্রেইকে পরিয়ে দেয়। ওদের ফিরতে দেরি হয়ে যায়। লোকটা অত্যন্ত রেগে ওঠে। বকাঝকা করতে করতে আচমকা একটা কুঠার নিয়ে আন্দ্রেইকে বালির ওপর চেপে ধরে কুঠার তুলতে যায়। ইভানও তার লুকিয়ে রাখা ছুরিটা বের করে শাসায় যে দাদার ওপর কুঠার তুললেই সে-ও লোকটাকে খুন করে ফেলবে। লোকটার বেয়াদপি, নিষ্ঠুরতা সে আর এক মুহূর্ত সহ্য করবে না। লোকটা হতবিহ্বল হয়ে যায়। কুঠারটা ফেলে দিয়ে ইভানকে থামাতে চায়। আঘাত করার বদলে ভিতু ইভান তখন ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে পিছন ফিরে দৌড় লাগায়। বাবাও ছুট লাগায় ছেলেকে ধরতে। দৌড় দৌড়। দৌড়বার আগে ইভান লোকটার ওপর তার মনের যত রাগ-অভিমান উগরে দিয়েছে। দৌড়তে দৌড়তে সে এসে হাজির হয় লাইট হাউসের কাছে। তরতরিয়ে ভেতরের লোহার সিঁড়ি বেয়ে উন্মাদের মতো উঠতে থাকে। তার কচি নরম হাতের পাতা দুটো রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে থামে না। উঠতে থাকে। ওকে আটকানোর জন্য বাবাও উঠতে থাকে **ঊর্ধ্বশ্বাসে** কিন্তু ইভানের সঙ্গে পেরে ওঠে না। কাকুতি-মিনতি করে বাবা ইভানকে থামাতে চায়। ইভান শোনে না। সে একেবারে ওপরের ছাদে পৌঁছে গিয়ে লোহার শক্ত ঢাকনাটা ফেলে ছিটকিনি এঁটে সিঁড়ির মুখটা বন্ধ করে দেয়। বাবা আর উঠতে পারে না। পাগল ইভান তখন মিনারের ছাদের রেলিঙের ধারে এসে সটান দাঁড়ায়। যে কোনও মুহূর্তে সে লাফ দিয়ে পড়বে। রাগে ক্ষোভে ফুঁসতে ফুঁসতে সে নিজের মনে বলতে থাকে, আমাকে কেউ ভিতু বলবে! পিগ বলবে! ওপর থেকে লাফাতে পারি না বলে আর কেউ আমাকে দুয়ো দিতে পারবে না।

নিরুপায় লোকটা তখন তার সন্তানকে বাঁচাবার তাড়নায় ছটফট করছে। সে কিছুতেই ইভানকে নীচের মাটিতে লাফিয়ে পড়তে দেবে না। মিনারের চূড়ায় ওঠার সিঁড়ির মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে সে অন্যভাবে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে যায়। ভেতরের সিঁড়ি থেকে বেরিয়ে এসে কাঠের দেওয়ালের খাঁজ ধরে বহু কষ্টে ওপরে চড়ার চেষ্টা করে। আচমকা পঁচা জীর্ণ কাঠের পাটাতন খসে যায় আর লোকটা সটান অত উঁচু থেকে নীচের শক্ত মাটিতে পড়ে মরে যায়। মুহূর্ত মধ্যে যেন কী ঘটে গেল! লোকটা, আন্দ্রেই আর ইভানের বাবা, নির্জন দ্বীপের মাটিতে চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে। কঠিন সত্যটা বুঝতে দু'ভাইয়ের দেরি হয় না। আমরা দেখি ইভান টাওয়ার থেকে নেমে মৃতদেহটার দিকে বিমূঢ় হয়ে এগিয়ে আসছে। আন্দ্রেই বাবার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর ওরা গাছের ডাল কেটে আনে। তার ওপর বাবার লাশটা চাপিয়ে সারা রাত ধরে টেনে টেনে সৈকতে নৌকোর কাছে বয়ে আনে। ক্লান্তিতে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরের আলোয় উঠে লাশটাকে আর সমস্ত জিনিসপত্র নৌকোয় তুলে অন্য তীরের দিকে নৌকো ছেড়ে দেয়। সেখানে পৌঁছে ওরা নৌকো থেকে প্রথমে মালপত্র বয়ে এনে গাড়িটায় রাখে। হতাশ দু'ভাই গাড়ির পাশে ক্লান্তিতে বসে পড়ে। এরপর যখন ওরা বাবার লাশটি নৌকো থেকে তুলে আনতে যাবে তখন হঠাৎ আন্দ্রেই দেখতে পেয়ে আকুল হয়ে চিৎকার করে ওঠে যে পাড়ে বাঁধা না থাকায় নৌকোটি কখন সমুদ্রের ভেতরে ভেসে গিয়েছে আর তার তলাও ফেসে গিয়েছে। ফুটো নৌকোর পাটাতন দিয়ে জল ঢুকে বাবার মৃতদেহটি ঢেকে ফেলেছে আর এইভাবে ক্রমশ ওদের বাবা পরিচয়ের সেই রহস্যময় রূঢ় মানুষটি নৌকো সুদ্ধ সমুদ্রের বুকে ডুবে যাচ্ছে। দু'টি কিশোর 'বাবা' 'বাবা' বলে আকুল ডাকে সমুদ্রতীর কাঁপিয়ে জলের দিকে ছুটে যায় কিন্তু নিরুপায় হয়ে ফিরে আসে। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সমুদ্র আর বাবাকে পিছনে ফেলে রেখে ফিরে যায় সংসারের দিকে। স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া গাড়িটিকে অনুসরণ করতে করতে ধীরে ক্যামেরা উঠে যায় সৈকতের গাছগুলির মাথায়, তারপর সেখান থেকে ফিরে তাকায় সমুদ্রের দিকে। ক্রমশ সমুদ্র মুছে গিয়ে অন্ধকার পর্দায় একে একে ভেসে উঠতে থাকে বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে ওদের ক্যামেরায় তুলে রাখা নানা দৃশ্যের স্টিল ছবি। সঙ্গে মন খারাপ করা এক বিচিত্র গম্ভীর সুর।

ওঠো - জাগো, আত্মনির্ভর হও।

মহান ভারতীয় দার্শনিক স্বামীজির অগাধ বিশ্বাস ছিল দেশের যুবশক্তির ওপর। তাঁরা জাগবে, উঠে দাঁড়াবে, আত্মনির্ভর হবে। আজ ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবচেয়ে তরুণ দেশ, কারণ এর লোকসংখ্যার ৫৪ শতাংশই ২৫ বছরের নীচে। পিয়ারলেস স্বামীজির আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে যুবশক্তিকে সম্মানের সঙ্গে নিজের পায়ে দাঁড়াবার ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথ দেখাচ্ছে। 'পিয়ারলেস স্বরোজগার যোজনা'-র মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ১০ লাখেরও বেশী ভারতীয় স্বনির্ভরতার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের মাঝে আত্মশক্তি জাগরিত হয়েছে। ভারতমাতার এই কৃতী সন্তানকে আমরা জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শকে করব সাকার, এই আমাদের অঙ্গীকার।

পিয়ারলেস ভারতের তরুণদলকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানাচ্ছে।

The Peerless General Finance & Investment Co. Ltd.
Peerless Bhawan, 3 Esplanade East, Kolkata 700 069,
Phone : 033 22483247, 22483001, 22203740, 22436758,
Fax :033 22485197, E-mail: peerless@cal3.vsnl.net.in
Website:www.peerless.co.in

Peerless
Smart solutions

JWT:3000.2004